গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রজ্ঞাভারতী

প্রকাশক
সুশান্ত দে
প্রজ্ঞাভারতী
১, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

প্রথম মুদ্রণ ১২৯০ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদ
বিশ্বনাথ মিত্র

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪
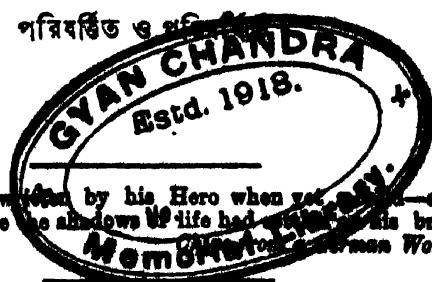
উপহার

বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশা
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য
ছাত্র-বৃন্দের কোমল হস্তে
জটাধারীর রোজনামচা
সস্নেহে অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার

লেখক পরিচিতি

জটাধারী শর্মা লেখকের ছদ্মনাম, আসল নাম চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবই চন্দ্রশেখর এবং জটাধারী। সেদিক থেকে ছদ্মনামটি ধরা সহজ। গঙ্গাধর শর্মা জটাধারীর প্রতিশব্দ।

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি ও বাংলা—উভয় ভাষাতেই অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অধিকাংশ লেখকের মতো তিনিও ছিলেন ইংরেজ সরাকারের বড় চাকুরে। এখনকার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের নাম তখন ছিল ইনস্টিট্যুট অফ হায়ার ট্রেনিং ফর ইয়ংমেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের সঙ্গে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। এরই মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হত 'ক্যালকাটা রিভ্যু' (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৪)। চন্দ্রশেখর ক্যালকাটা রিভ্যু পত্রে ক্লাণিক্যালস্ অফ চন্দ্রকোণা নামে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। সি এস বি নামে তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ ছাপা হত। এসিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে তাঁর কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তার মধ্যে দুটি বিশেষত উল্লেখ্য 'Notes on the Antiquities of the Nalti, the Assia and the Mahabinayaka hills of Cuttack' (১৮৭০) এবং 'An account of the antiquities of Jaipur in Orrisa' (১৮৮১)।

বঙ্গদর্শনে 'জটাধারীর রোজনামচা' ছাড়াও 'শান্তিধর্ম' ও সাহস শিক্ষা' নামে একটি বড় প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। প্রকাশের সময় তাঁর নাম ছিল না; কিন্তু সেই সংখ্যা বঙ্গদর্শনের মলাটে মুদ্রিত সূচীর মধ্যে চন্দ্রশেখরের নাম ছিল। একটি কৌতুককর ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে হয়। 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম'-এর লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় একটি বই লিখেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। অবশ্য এ-বইটি ছাড়া তাঁর আরও অনেক ভালো রচনা আছে। কাশিমবাজার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'উপাসনা' প্রকাশিত হলে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হন এবং বঙ্গদর্শনের গ্রন্থ-সমালোচনার ধারাটি বাঁচিয়ে রাখেন। কিন্তু যে-ঘটনাটি আজও রহস্যের—তা হল মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত 'কুঞ্জলতার মনের কথা' এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারীজন্ম' প্রবন্ধের সাদৃশ্য। দুজনেই বঙ্গদর্শনের লেখক, দুই বন্ধু। কিন্তু কে প্রথম লেখক এবং কে অনুগামী আজ আর হদিশ মেলার পথ নেই।

'কুঞ্জলতার মনের কথা' মজুমদার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত পোস্টকার্ড সাইজে ছাপা ৩৭ পৃষ্ঠার বই। ভূমিকায় প্রকাশক জানিয়েছেন : 'চন্দ্রশেখর বাবুর রচনা অনেকেই তাঁর অনভিজ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে, বেনামীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন হইতে প্রকাশকের বিনানুমতিতে কেহ তাঁহার প্রকাশ রচনা যদি

রচনার কোন্ অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না।' বোঝা যায়, কটাক্ষ চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। তাঁর 'নারীজন্ম' কুঞ্জলতার নাম বাদ দিয়ে একই 'মনের কথা'-র হেরফের। নারীজন্ম 'প্রবন্ধরত্ন' (১২৯১) বইয়ের অন্তর্গত ষষ্ঠ রচনা। ভূমিকায় বলা হয়েছে—'শ্রী জটাধারী শর্মা কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত; ২১০/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীভুবন মোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত এবং কৃষ্ণনগর নিবাসী গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।' মুকুল-মালা, আর্যদর্শন, বান্ধব, মাসিক সমালোচক পত্রিকার রচনাগুলি প্রবন্ধরত্নে স্থান পেয়েছে। দুই চন্দ্রশেখরই সরস লেখায় নিপুণ; চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'মসলা-বাঁধা কাগজ' এবং চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটাধারীর রোজনামচা' তার প্রমাণ। আমাদের মতে দুজনের অন্যোন্য প্রভাবেই বিষয়টি গুরুত্ব পায়। দুটি রচনার সাদৃশ্য এবং প্রথম লেখকের গৌরব নিয়ে বিতর্ক অনেক পরের ব্যাপার।

জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখরের শ্রেষ্ঠ রচনা। একসময়ে এই বইয়ের বর্ণনা, কোন কোন উদ্ধৃতি শিক্ষিত মানুষের রসালাপে ব্যবহৃত হত। বহু-কাল পরে বাংলা সাহিত্যের একালের পাঠকরা বইটি হাতে পেয়ে সমান আনন্দ পাবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

যেহেতু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'-র অন্তর্ভুক্ত নন এবং তাঁর জীবনের তথ্যও খুব বেশি জানা যায় না, তাই এখানে সংক্ষেপে তাঁর জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী উল্লেখ করা গেল।

সরকারী গেজেট থেকে জানা যায়, ১৮৭০ সালে তিনি কটকের যাজপুরে কর্মরত ছিলেন। ১৮৭১ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত যথাক্রমে তমলুক, পাটনা, গয়া, ভুবুয়া, বনগাঁ, পটুয়াখালি, কটক ও কালনায় বদলি হন। ১৮৮৫ সালে কালনাতেই মৃত্যু।

চন্দ্রশেখরের জন্মসাল জানা যায়নি। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর একমাত্র পুত্র অবিনাশের বয়স ছিল মাত্র চারবছর, তাই পিতৃস্মৃতির সূত্রে তাঁর পুত্র শ্যামাদাস বা রবীন্দ্রবাবুও বিশেষ কিছু জানতে পারেন নি। আড়ার বিখ্যাত রায়বংশের শিবনাথ রায় ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে নিয়ে আসেন জগদ্বন্ধু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পুত্র হরকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হরকিশোরের সঙ্গে শিবনাথের তিন বোন সূর্যকুমারী, কমলকুমারী ও ভুবনকুমারীর বিবাহ হয়। সূর্য-কুমারীর সাত পুত্র—চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, গিরিজাশেখর, রমানাথ, কেদারনাথ, বাণীনাথ ও বামানাথ। কমলকুমারীর চার ছেলে, ভুবনকুমারীর তিন। পরি-বারের শৈব সংস্কার নামকরণের প্রবণতায় ধরা পড়েছে। আড়ায় ঐ পরিবারের যে-উত্তরপুরুষ লেখককে উক্ত তথ্যাদি জানিয়েছেন, তাঁর নামও ভৈরবদাস। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ বর্তমান সম্পাদকের 'বঙ্গ-দর্শন ও বাংলাসাহিত্য' (পৃঃ ৬৪—৮৪) গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

গ্রন্থ-পরিচিতি

'জটাধারীর রোজনামচা' গঙ্গাধর শর্মার নামে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় (১২৮৪ বৈশাখ থেকে ফাল্গুন)। তার আগেই কর্মসূত্রে দুই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে যোগাযোগ হয়ে থাকবে। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটের সদস্য হিসেবেও দুজনের মধ্যে পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক।

'রোজনামচা' প্রকৃতপক্ষে কারও রোজকার ডায়েরি বা দিনলিপি নয়। রচনাশীর্ষে কোন সাল-তারিখ ব্যবহার করা হয়নি। গঙ্গাধর শর্মা লিখছেন জটাধারী নামে এক ব্যক্তির জীবনকথা—তার অভিজ্ঞতার বিবরণী। সেই বিবরণী অতীত দিনের সমাজচিত্র হিসেবে মূল্যবান। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইটির গৌরব দ্বিতীয় অংশের জন্যই আজও সমান তাৎপর্যবহ। রোজনামচার ছবিগুলি ইতিহাসের দলিল এবং উপভোগ্য রচনা। জটাধারীর রোজনামচায় মোট বত্রিশটি পরিচ্ছেদ। কোনটিতে সেকালের দুর্গোৎসব, জমিদারের কাছারি বাড়ি বা দত্ত মাস্টারের পাঠশালা বা গজাননের চরিত্র ফুটে উঠেছে। জটাধারী ওরফে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সবকিছুর মধ্যেই জড়িয়ে আছেন। তাছাড়া গজানন বা আখন্দি মিঞার মতো জটাধারীও একটি চরিত্র।

এজন্যই 'রোজনামচা' সামাজিক দলিল হয়েও রস-রচনার স্বাদ দেয়—কিছু উপন্যাসগুণও উপস্থিত। গঙ্গাধরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেশ ভ্রমণের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। 'ভারতভ্রমণ' কাব্যের কবি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যে রসদ যুগিয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়। উপরন্তু পর্যটন ও বিচিত্র অভিযানের অভিজ্ঞতা উনিশ শতকী ইংরেজি উপন্যাসেরও একটি প্রিয় বিষয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর বইকে যদি 'Life and Time' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলি, তাহলে জটাধারীর রোজনামচাও বিশিষ্ট নিদর্শন। 'Life' অংশ গৌণ, কিন্তু 'Time' অংশ সত্যমূলক।

সেকালের পাঠশালার কিছু বিবরণ দেওয়া যাক।

> আমি যখন বিদ্যারম্ভ করি তখন সেকাল আর একালের-প্রসঙ্গ ছিল না। রামখড়িতে ভূমিতে লিখিতে হইত, পেন্সিলের নামও ছিল না; তালপত্রে লিখিয়া রৌদ্রে কালি শুকাইতে হইত, কলাপাতে লিখিয়া ধূলা ছড়াইতে হইত; তখন 'ইরেজার' বিনিময়ে চা-খড়ি, 'ব্লটিং' বিনিময়ে চূনের থলি, 'গম আরেবিক' বিনিময়ে আঙ্‌কাতরা-বিনিন্দিত কাল গঁদের ভাণ্ড, স্বর্ণনির্মিত চিরকালপটু 'পেটেন্টপেনের' বদলে বাতার কলম, মরক্ক লেদর আবৃত 'ইস্‌ক্রুটপ মস্যাধার' বিনিময়ে চালচুয়ানি ভূষাজড়িত মৃত্তিকাপাত্র; তখন খেকার স্পিংক এবং কোং, পুরাতন সংস্কৃত যন্ত্র, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, বুশ্ব আই সি বসু এবং কোং...

বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতা, মুখারজি-পুত্র বা চাটুর্যা কোম্পানির কোন প্রসঙ্গ ছিল না।

ছবিটি রসসিক্ত এবং ঐতিহাসিক। শিশুদের হাত মকশো করার জন্য রামখড়ি ও জলন্যাকড়ার ব্যবহার প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও চালু ছিল। রামখড়ি একরকম নরম পাথর, পেন্সিলের মতো সরু নয়, ছোটদের হাতে ধরতে সুবিধে। এখন মেশিনে রামখড়ি কেটে খুবই ভঙ্গুর শ্লেট-পেন্সিল তৈরি হচ্ছে। বাতার অর্থাৎ খাগের বা পালকের কলম কিছুকাল আগেও ছিল—এখন শুধু বাণী অর্চনায়। চালপোড়া কালিতেই বাংলায় যাবতীয় পুঁথি সাহিত্য রক্ষা পেয়েছে। কেমিক্যাল কালির মতো জল পড়লেই চালপোড়া কালির রেখা মোছে না। থ্যাকার স্পিংক, সংস্কৃত যন্ত্র, আই সি বোস—সবই প্রকাশনা বা ছাপাখানা সংস্থার নাম। সেকালে থ্যাকার স্পিংকের দোকান থেকে বই কেনা খুবই মর্যাদার ব্যাপার ছিল। লেখকের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল গ্রামে, তাই ভালো বইদোকানের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। 'ব্লটিং বিনিময়ে চুনের থলি' বলতে লেখক একটি ছোট গুড়ো চুনের পুঁটলি বুঝিয়েছেন। ব্লটিং পেপারের ব্যবহার এখন আবার অভাবে কমেছে, তার বদলে কেউ-কেউ লেখার ওপর চক গড়িয়ে দিচ্ছেন। তবে 'আনাগন ঘ', গাঁড়র শিঙে ম, হাড়গোড় ভাঙ্গা দ, কান্দেবাড়ি ধ, তিন পুটুলি শ' বলার রেওয়াজ অনেকদিন উঠে গেছে। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের পূর্বের পাঠশালার চিত্র জটাধারী সুন্দর এঁকেছেন। 'ক-য়ে ষ যোগ করিলে যে ক্ষ হয়, তাহা গুরু-মহাশয়ও জানিতেন না।' বরং পণ্ডিতমশাইদের বিদ্রূপ বেশ উপভোগ্য। 'বিদ্যাসাগর বিদ্যা প্রচার করিয়াছেন, বাপ-পিতামহের অপেক্ষা তাঁর অনেক বিদ্যা।'

ফারসী ভাষার শিক্ষক আখন্দী মোল্লা, সংস্কৃত শিক্ষক গাউসেন দত্ত, ইংরেজি শিক্ষক খঞ্জ ভীমসেন, দেওয়ান গজানন চৌধুরীর চরিত্র যিনি আঁকতে পারেন, ঔপন্যাসিকের কলম তাঁর নাগালের মধ্যেই ছিল। বিশেষত গজানন নানা রূপেই পরে বাংলা উপন্যাসে এসেছে। ধূর্ত দেওয়ান, জমিদারকে বোকা বানিয়ে উপস্বত্ব ভোগ করে, দুহাতে ঘুষ নেয় কিংবা দিতে বাধ্য করে; মুখে মধু, মনের উদ্দেশ্য গোপন রাখে, পুলিশের দারোগার সঙ্গে তঙ্গত ভাব। এ চরিত্র আমরা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-গল্পেও পেয়েছি। জটাধারীর মুখেই শোনা যাক:

> মোকদ্দমা গড়িতে, ভাঙ্গিতে, পাকাইতে, কাঁচাইতে, পাখা দিতে, উড়াইতে দেওয়ানজী অদ্বিতীয় গুণাধার। সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় তাঁহার চক্ষে সব সমান, গোময় চন্দন সমান জ্ঞান। গজানন মিথ্যার মহাদেব। [illegible] জোতদার জোতজমি সহস্র টাকা পূর্ণ করাই তাঁহার কার্যের উদ্দেশ্য— [illegible] ছিল। যেন উপযুক্ত সদাচারী মর্দ

'মতাশির, সেইরূপ গজাননের মন্ত্রে দন্ডশালী দারোগা, ভীষণমুখে জমাদার সমস্ত সরকারী কর্মচারী সমন্বয়।

একটি মজার গল্পও জুড়েছেন লেখক। গল্পটি লোকমুখে প্রচলিত। গঙ্গায় বেশ কয়েক নৌকো ভর্তি বিলেতি মিথ্যা ভেসে এসেছিল। লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। গোমস্তা কুঠিয়াল মহাজন সওদাগর সকলেই। গঙ্গার তীরে পেঁছতে গজাননের বেশ দেরি হয়েছিল। ততক্ষণে সব বিলেতি মিথ্যাই বিলি হয়ে গেছে। হতাশ গজানন ঠিক করল, গঙ্গা-জলে ডুবে মরবে। গঙ্গা তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ভাগ পাওনি বলে দুঃখ কোর না। আমি বর দিলাম, তুমি ষোলআনাই মিথ্যে বলবে, কখনও সত্যি বলবে না।

দারোগা-দেওয়ানে মিলে সাধারণের দুর্গতি ঘটায়। জমিদারবাবুদের মধ্যে বরং অনেক সহৃদয় আছেন। যেমন আশুতোষবাবু। জটাধারী দেখিয়েছে, এমনকি গজাননের হাতে বিশ্বস্ত সেবক রঘুবীরেরও রেহাই নেই।

হুতোম-বঙ্কিমের মতো ইয়ংবেঙ্গল বাবুসমাজের চিত্র রোজনামচাতেও আছে। মাথায় দশ আনা-ছ আনা চুল. বাব্‌রিকাটা, গুয়াথুপি কেশগুচ্ছ, 'গোঁফযুগলও অনেক হেফাজতের ধন', যেন মোম দিয়ে মাজা, চওড়া পাড় কালো ধুতি, কোঁচার দিকটি ময়ূরপুচ্ছের মতো গিলা-কুঞ্চিত, কাছাটি রেশমী ডোরের মতো পাকানো।

তবে জটাধারী কেবল বখাটে বাবু দেখেন নি। তাঁর কাছে 'বাবু' কথার অন্য তাৎপর্য ছিল। 'বাবু' মানে সদাশয়, পরোপকারী, উদার, দরিদ্রের বন্ধু। যেমন নরেন্দ্র, নগেন্দ্র এবং আশুতোষবাবু। পরে কথাটির অর্থ-গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাই সকলেই বাবু—যেমন ডাকবাবু তারবাবু টোল-বাবু ঘণ্টাবাবু ইটবাবু।

গঙ্গাধর শর্মা ওরফে জটাধারীও বাবু হতে চান। সে অন্যরকম বাবু। 'সেই বাবুসকল কেবল বেতন তালিকার গেজেটের বাবু নহেন, এক এক বৃহৎ দেশ সেই পূর্বতন বাবুবংশের রাজ্য ছিল।...সেই বাবুগণ কেবল শ্বেত-বস্ত্রে ও শুভ্র লম্বা কোঁচায় ধনের পরিচয় দিতেন না, তাঁহাদের একদিকে প্রভুত্ব আর দিকে বহুজন প্রতিপালনই প্রধান ধর্ম জানিতেন।'

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ছবিটিও উপভোগ্য। তর্কালংকারদের নিষ্ঠা যেমন শ্রদ্ধার যোগ্য, তেমনি তাঁদের রক্ষণশীল মনোভাব, অল্প বিদ্যা এবং সংস্কারে অনীহা দেশের ক্ষতি করেছে। লাউসেন দত্ত ইংরেজি-বাংলা-গণিত কোনটাই ভালো জানেন না; বেত্রাঘাতে শুধুই উৎসাহী। আবার কলকাতা থেকে এসেছেন যে 'গুডব্রেড' ভীমচাঁদ, মাসিক বারো টাকা বেতন, রুমালে ল্যাভেন্ডার, ইংরেজি কায়দার পোষাক এবং জুতো—তিনি কিছু ইয়াস, নো, ভেরি ওয়েল ইত্যাদি শেখালেন। তার বেশি নয়। তাই বাম্‌না ঠাকুরকে বলেন 'গুড মর্নিং', এবং 'ক্রমে বাপ-পিতামহের নাম না জানা একটি গৌরবের

কারণ হইয়া উঠিল।' ফারসী শিক্ষার প্রতি জটার শ্রদ্ধার ভাবটি লক্ষণীয়। তাই আখন্দী মোল্লার সকৌতুক বর্ণনাতেও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। অক্ষম ইংরেজিচর্চার মোহে যে পুরনো পাঠশালা, শুভংকরী, চাণক্যশ্লোক, সংস্কৃত-ফারসীচর্চা উঠে গেল, তাতে লেখক দুঃখিত। 'বাদশাহী অঙ্কের সহিত বাদশাহী যবানও লোপ পাইল।' ইংরেজি শিক্ষা, তাঁর মতে, শিব গড়তে বাঁদর গড়বে।

চিরন্তনী বাঙালী মাতৃত্বের চরিত্র হিসেবেই চন্দ্রশেখর রাঙ্গাঠাকরুণ সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মিকাদেব প্রতি তাঁব কটাক্ষ হয়ত যুক্তিসঙ্গত নয়, কিন্তু রাঙ্গাঠাকরুণ সকলেরই মনে দাগ কাটবে।

রাঙ্গা ঠাকরুণ বহু গুণসম্পন্না হইয়াও দাম্পত্যসুখে চিরবঞ্চিত। তিনি যে কবে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই—জ্ঞানারম্ভ হইতে শুভ্র, পবিত্র, বেশহীনা বিধবাই দেখিতাম। যে-বৃহৎ পবগণার উপস্বত্বে আশুতোষবাবু এতদ্রূপ সমৃদ্ধিশালী, তাহার অনেক অংশ রাঙ্গা ঠাকরুণের স্ত্রীধন। কিন্তু ভাসুরের হস্তে সমস্ত বিষয়ই গচ্ছিত করিয়া তিনি কেবল ধর্মে-কর্মে ব্যাপৃতা থাকিতেন। দরিদ্রের দুঃখমোচনই তাঁহার প্রধান কার্য ছিল। তিনি যখন শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিধানে আলুথালু কালো কেশরাশি কপালেব উপরভাগে এলো বন্ধনে রাঙ্গা হস্তে দর্বী ভবিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালক-বালিকাকে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন, সকলে কানাকানি করিত, যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহস্থ কার্যের নির্বাহ-কারিণী—রাঙ্গা ঠাকুরাণী প্রধান ভাণ্ডারিণী ছিলেন, তিনি নিজ হস্তে যাহাকে যাহা দিতেন, তাহাই তৃপ্তিকর—তাহার দ্বিগুণ অপরের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না, এজন্য জটাধারী ব্যঙ্গ করিয়া কহিতেন, 'রাঙ্গাদিদির বড় হাতযশ। হাঁড়ি হাঁড়ি মণ্ডা হউক, থাল থাল মেওয়া হউক, বড় দিঘির বড় রুহি হউক. উদ্যানের সামান্য সামান্য ফল হউক,—আম হউক বা কুল হউক—রাঙ্গা ঠাকরুণ বাঁটিয়া না দিলে কাহারও মজুর নাই। আজ আমেরু, পরশ্ব সাবিত্রী ব্রতদানের আনন্দেই রাঙ্গা দিদির তবু নিয়ত ম্লান মুখভঙ্গিটি কখনও কখনও প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইত।'

অর্থাৎ' রাঙ্গা ঠাকরুণ বারমাসে তের পার্বনের গ্রাম-বাংলার প্রতিনিধি। তুলনায় ব্রাহ্মিকারা তাঁর চোখে 'পিতল কাটারি/কামে না আইনু/উপরহি ঝকমকি সার।' চন্দ্রশেখরের এই পক্ষপাত রোজনামচাব রসাস্বাদে কিছু বিঘ্ন ঘটিয়েছে। তবে কোথাও কোথাও কমলাকান্তী বাগ্‌ভঙ্গিরও সাক্ষাৎ মেলে। যেমন, 'আমরা অতি সন্ধিপ্রিয়, সুযোগ পাইলে আত্মীয় প্রতিবেশীর ভূমির উপর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রাচীরের ভিত্তি পত্তন করি; দুই একটি বৃক্ষশাখা [illegible] আমাদের গৃহের দিকে নত হইয়া আসিলে সেই ফলের [illegible] [illegible] করিতে প্রস্তুত হই, [illegible] বেলা [illegible] হইলে পা

চালাইবার চেষ্টা করি, এক একবার বলি—'ও চিরকেলে পথ': দুর্বল লোকের লাখেরাজের অনুগত প্রজা ভাঙাইয়া আমাদের মালের সামিল করিতে ত্রুটি করি না, লুকিয়ে লুকিয়ে ছুরি চালাইয়া থাকি, তবু আমরা পরস্পর আত্মীয়, চার চোখে দেখাদেখি হইলে হাসিখুশি, খেলার ধুমে সম্প্রীতির পরিচয় দিয়া থাকি। অপরিচিত লোক আমাদের বৈঠকে বসিলে মনে করেন এ গ্রামের সমাজ সৌহার্দ্যবন্ধ, বড় সুখী।'

রাজনারায়ণ বসুর 'একাল ও সেকাল' এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে সেকালের ইংরেজি জ্ঞানের কিছু নিদর্শন আছে। ব্যাকরণে অন্বয় না বুঝেই ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করা হত। তাই ভুল পদবিন্যাসের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থবিপর্যয় হাস্যকর হয়ে দাঁড়াত। 'রাম না হতে রামায়ণ' (১৫শ পরিচ্ছেদ, ৫১-৫৩) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই দেখা যাবে, চন্দ্রশেখরও এ-বিষয়ে চিন্তা করেছেন। ডাক-মুনসী পূর্ণ গাঙ্গুলী ও ইংরেজ ইনস্‌পেকটরের কথোপকথন নিম্নরূপ:

সাহেব। All right with you, Purna ? (সব ভাল ত পূর্ণ ?)

পূ। Sir, Master, your blessing (হুজুর, খামিন্দ! আপনার আশীর্বাদ)

সাহেব। My blessing!

পূ। You Master! You are my most obedient servant. এখন পূর্ণবাবু বিহ্বল হইয়াছেন, কি বলিতে কি বলিলেন, ও কহিয়া উঠিলেন forgot forgot sir!

সাহেব। Am I your most obedient servant?

পূ। No Sir.

সাহেব। No Sir.

পূ। তবে Yes Sir.

সাহেব। I am your most obedient servant, either you or I must be a fool.

পূ। Both, my lord.

'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া হচ্ছে' পূর্ণ গাঙ্গুলির অনুবাদে Sir, Ghost's father's verb done, 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' হয় The Cake of Udo on the neck of Budo. সাহেবকে সৌজন্য দেখিয়ে পূর্ণবাবুর বলার ইচ্ছে, কিছুই তো খেলেন না—আপনি বড্ড কম খান। ইংরেজিতে বললেন, 'you eat nothing ? your stomach very small, Sir'. সাহেব বুঝলেন, বললেন, তুমি কি এর চেয়ে বেশি খেতে পার। পূর্ণ মনে করলেন, ম্লেচ্ছ খানা খেতে বলা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর: Ram, Ram,

এ গ্রামের সমাজ সৌহার্দ্যবন্ধ, বড় সুখী।'

Sir, my Caste go. I worship stone everyday (রাম রাম! জাত যাবে, আমি প্রতিদিন শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকি)—but say 'rice'—two seers every time, mind Sir, I am old.

তবে ইংরেজি বলনে পূর্ণবাবু যতই অক্ষম হন, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সেকালের সাহেবরা প্রায় ভাবগ্রাহী জনার্দন ছিলেন। তাঁরা বুঝতেন, এই সব অনুগত নেটিভরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গ্যারান্টি। পূর্ণবাবুর আসল কথা, তাঁর পেনসন পেতে আর দেরি নেই। ছেলে উপযুক্ত হয়েছে। স্কুল ইনস্পেক্টর হতে চায়।

I want, thank Sir, nothing Sir, but pension next October. তার পরের কথা, My son well learned. English Missionary School Daff Sahib Scholar. Inspectori wants.

গজানন চরিত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। গজাননের ছেলে নীলমণি চৌধুরীও বেশ আকর্ষণীয়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'-র গদাধরের মতো সেও ত-কে ট, দ-কে ড, ধ-কে ঢ বলে। তার বদলে, এই যে যাচ্ছি, ঐ নৈবিদ্যের সন্দেশটা খাব, পুত্রমিত্রবদাচরেৎ—নীলমণির উচ্চারণে হয় এই ডে ডাট্টি, ঐ নৈবিডডের সন্দেশটা খাব, পুট্র মিট্র বড্ আচরেৎ।

গজানন জুয়াচুরি করে দেওয়ানী অপবুদ্ধি খাটিয়ে প্রচুর সম্পত্তি করেছে। নীলমণি তার প্রাণ। তারই জন্য সব। কিন্তু সে সত্যি গদাধরেরই অন্য সংস্করণ। অপদার্থ যুবক। একটু পিতা-পুত্র সংলাপ শোনা যাক। (বাবার টাকা খোয়া গেছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছে টাকার কথা।)

গজা। দেখ বাবা নীলমণি! আমার সেই শয়নঘরের পার্শ্বে ১৭টা তোড়া নাই।

নীল। নাই ত কি করব—আমার কাছে কিছু চাবি রেখে গেছলে।

গজা। তা নয় বাবা—বলি ঘরের লোক, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়।

নীল। ঘরের লোক হলেই বুঝি চোর হয়—আপনি ত বড় নলতে আরম্ভ করলেন।

গজানন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে নীলমণিকে বেত্রাঘাত করেছেন। ত্যজ্যপুত্রও করতে পারেন। নীলমণি বিষ খাবে। গঙ্গাধর শর্মা মধ্যস্থ। নীলমণিকে তিনি অনেক বোঝালেন। উত্তরে নীলমণি যা বলেছে তাতে বেশ সেয়ানা বুদ্ধিরই প্রমাণ মেলে।

> নীলমণি কহিলেন, বুড়োর বড় ক্ষমতা, এক বড় আফিসের ওয়াস্তা, বেটা কবে চেয়ে থাকবেন। দাদা ওঁর দাদের কি ক্ষমতা আছে? মনে নাই যখন পোষ্যপুত্র করেন সকল বিষয় লিখাপড়া করিয়া আমাকে অর্পণ করিয়াছেন—বুড়ো ত আমার হাততোলা খাবে—পোষ্য পেনসনর, আমি বুঝি নাই? দলিলটি হাতে ধরে রেখেছি।

এইসব, তিনু ও টীকায় চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির

পরিচয় মেলে। সাব-ডেপুটি, ডেপুটি হিসেবে আদালতে বহুরকম মামলার সওয়াল শুনে শুনে গ্রামসমাজের বৈষয়িক ব্যাপারগুলি ভালোই বুঝেছিলেন। যেমন গ্রামীণ উৎসব, নদী, মেলা, প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁর মনকে টেনেছিল, গঙ্গাধর এবং জটাধারীর জবানীতেই তার প্রকাশ; তেমনি গোমস্তা-দেওয়ান-দারোগার ঘোঁট, মূর্খ সাহেব ও অল্পবিদ্যা স্বদেশী সাহেবের কৌতুককর অহমিকার প্রতি তিনি বিরক্ত। বিচারের নামে প্রহসন, মিথ্যা সাক্ষ্য, কামিনীকে কাদম্বিনী বানানো, সাহেবজজের অসহায়তা ইত্যাদির নিখুঁত চিত্র রোজনামচায় উঠে এসেছে।

বিয়ে পাগলা শীতু, অমরেন্দ্র-কাদম্বিনী প্রণয়কথা বা ইটওয়াল সাহেবের চরিত্র আজকের পাঠকেরও ভালো লাগবে। অষ্টম পরিচ্ছেদে সাহেব দর্শনে গ্রামবাসীদের চিত্তচাঞ্চল্যের সুন্দর বিবরণ আছে। 'জটাধারীর রোজনামচা' খেয়ালী রচনা বা স্মৃতিমূলক ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন রূপে খুবই মূল্যবান। উপন্যাসের স্বাদ এ বইয়ের উপরি-পাওনা, প্রকৃত মূল্য বিশ্বাসযোগ্য সমাজচিত্র হিসেবে। যুগসন্ধিকালের গ্রাম-বাংলার এ চিত্র সামাজিক-ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেই রচনা করা সম্ভব। সেদিক থেকে 'রোজনামচা' বিগত শতকের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

লেখকের অন্যান্য রচনা

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজবালা' নামে একটি নাটক লেখেন। 'কথামুখে' লেখা আছে '২৩শে বৈশাখ, ১২৭৮'। একটি পাঁচ অঙ্কের ছদ্ম-ঐতিহাসিক নাটক। পাঠান আমলে ঘটনাবলী স্থাপিত। নাট্যকীয়তার সম্ভাবনা সত্ত্বেও 'রাজবালা' সফল সৃষ্টি হতে পারেনি। কারণ 'কর্ম' মেনে সাহিত্য-কর্ম তাঁর প্রকৃতির অনুকূল নয়। সেজন্যই 'রোজনামচা' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তবে দর্পনাথ, পবনবীর, লক্ষ্মীঠাকরুণ, কাশীশ্বর প্রভৃতি চরিত্র যে তাঁর অভিজ্ঞতারই সঞ্চয়—তা বোঝা যায়। রোজনামচার রাঙা ঠাকরুণ, রঘুবীর, অমরেন্দ্র ইত্যাদি চরিত্রে রাজবালার নর-নারীই বেশবদল করে এসেছে। এখানেও ডাকাতি, রায়বেশে নাচ, লাঠিয়ালের কেরামতি আছে। বাচস্পতি চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। 'রাজবালা' সম্ভবত কখনও অভিনীত হয়নি।

ভারতভ্রমণ (১৮৬৪) একটি কল্প-ভ্রমণের আখ্যানকাব্য। রচনাভঙ্গি দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্য' (১৮৭১-৭৬) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫)-এর সঙ্গে তুলনীয়। বইটি মাতামহ শিবনারায়ণ রায়কে 'সেবক' চন্দ্রশেখর উৎসর্গ করেছেন। তিনসর্গের এই আখ্যান কাব্যে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির জন্য কবি আক্ষেপ করেছেন। অতীতের অযোধ্যা, অরণ্য, তপোবন, বশিষ্ঠ-দধীচির বৃত্তান্ত, মহাভারতের সার-

সংকলনে স্বাদেশিক চেতনার উদ্দীপনা আবেগময় ভাষায় প্রকাশিত। স্বাধীনতার চিরন্তন প্রতীক কবির কাছে হিমালয়শিখর। একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

উঠছে পথিকবর, দেখ পূর্বাশার
কোমল ঊষা-সুন্দরী খুলি স্বর্ণদ্বার
সাজাইছে প্রকৃতিরে উজ্জ্বল বসনে,
সুষুপ্ত দিনেশ দেবে তুলিছে যতনে,
আশ্রমধেনুর রব পিকের কূজন
তপস্বীর স্তুতিগীত পূরিছে কানন,
ক্রমশঃ দেখছে চেয়ে অচলশিখর,
মণ্ডিত করেছে স্বর্ণে দিবাকর-কর।

চন্দ্রশেখরের হিমালয়-বর্ণনা বিহারীলালের থেকে পৃথক। নিসর্গ সৌন্দর্য বিহারীলালে মুখ্য, চন্দ্রশেখরে গৌণ—বরং ফাঁকে ফাঁকে অতীত গৌরব এবং বর্তমান গ্লানির কথা বলাই উদ্দেশ্য। বিক্রমাদিত্যের কাল সম্পর্কে চন্দ্রশেখরের আবেগময় উক্তি কবিত্ব-বর্জিত নয়।

ধন্য রে অমর নৃপ! ধন্য উজ্জয়িনী,
যে রাজ্যে শোভিল নিরুপম নরমণি!
অমর অমরসিংহ, প্রাজ্ঞ ধন্বন্তরি
কাব্য-অম্বু ভাষাসিন্ধু উদ্ধরণ করি,
শ্রীবেতালভট্ট, বররুচি, ক্ষপণক,
ঘটকর্পর, শঙ্কু, জ্ঞানের দীপক,
বরাহমিহির—যার জ্ঞান-প্রভাকর,
দানিল ভারত মাঝে মনোহর কর
স্বর্গীয় বিধানবৃন্দ মর্ত্যে প্রকাশিল,
ভাবী জয়ংকরাকাশে জ্যোতিঃ বিস্তারিল,
গর্বিত, লভিয়া যাহা, এবে সুবিম্বান,
রবিকর লভি যথা শশী দীপ্তিমান।
নবরত্ন বররত্ন কবি কালিদাস,
হে বরদে তব বরে চির-অবিনাশ।

প্রবন্ধরত্ন (১২৯১) নামে চন্দ্রশেখরের একটি প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। লেখকের নামের বদলে লেখা আছে ভূমিকায় 'শ্রী জটাধারী শর্মা কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত'। 'রত্নের অপব্যবহার নিতান্ত অসহ্য' বোধ করে 'কৃষ্ণনগরবাসী গ্রন্থকার' এগুলি প্রকাশ করেন। মনে হতে পারে, লেখক মেদিনীপুরের চন্দ্রশেখর নন। কিন্তু জটাধারী নামের সংযোগ এবং শ্লেষ-যুক্ত অম্লমধুর বাচনভঙ্গি থেকে মনে হয়, রোজনামচার লেখক এবং প্রবন্ধ-রত্নকার অভিন্ন। সরকারী কাজে রাণাঘাটে থাকার সময়ে কৃষ্ণনগরে বাস

করাও কিছু বিচিত্র নয়। তাছাড়া, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'কুঞ্জলতার মনের কথা' গ্রন্থের সঙ্গে হুবহু সাদৃশ্যের জন্য প্রকাশক যাঁর নামে অনুযোগ অপ্রকাশ্য রাখেন, তিনি নিশ্চয় সেকালের একজন বিশিষ্ট লেখক এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়েরও বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

প্রবন্ধরত্নের উৎসর্গপত্র থেকে জানা যায়, জটাধারীর স্ত্রীর নাম ছিল পবিত্রময়ী দেবী।

দশটি প্রবন্ধের এই সংকলনে সমকালের সাহিত্যবিতর্ক, নব্য হিন্দুধর্মের আন্দোলন, শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাব, ব্রজলীলা নাটকের সমালোচনা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

প্রকাশকের ব-কলমে যা বলা হয়েছে, তা রোজনামচার রচনারীতি সম্পর্কেও সত্য।

'হাসিতে হাসাইতে ঠাট্টা করিতে ও মধ্যে মধ্যে মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ গালিবর্ষণে খুব মজবুত। ইহার হাত কেহই ছাড়াইতে পারিবেন না। ......ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করা হয় নাই, তবে যদি 'কহ ঘরে কে—আমি কলা খাই না' মত নকল দাঁত বাহির করে শুক্না হাসি হেসে মিটমিটে ডাইনের মত আসিয়া আসরে আপনি জাহির হইয়া পড়েন, তবে আমি নাচার।'

দশটি প্রবন্ধের মধ্যে 'সৌন্দর্য' অন্য ভঙ্গিতে দেখা। লঘু সরসতার চেয়ে এখানে মননের উৎকর্ষই লক্ষণীয়। গদ্যের বাঁধুনিও সংহত।

'সৌন্দর্য কি? বস্তুর গুণ, না মনের বিকার? অনেকে বলেন, সৌন্দর্য বস্তুগুণ, কিন্তু আমরা বলি উহা মনের বিকার মাত্র।...পক্ষান্তরে সৌন্দর্য বস্তুর গুণ হইলে ব্যক্তিভেদে সৌন্দর্যের তারতম্য হইত না।...একজন এক বস্তু দেখিয়া প্রীত হয়, অপরে প্রীতিলাভ করিতে পারে না। তাই বলি সৌন্দর্য বস্তুর গুণ নয়, মনের বিকার মাত্র। চিত্তই সৌন্দর্যের উৎস।'

প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন বা শশধর তর্কচূড়ামণি প্রসঙ্গে কটুভাষায় মন্তব্য রোজনামচার রচনাভঙ্গিকেই স্মরণ করায়।

'প্রজ্ঞাভারতী' পরিচালকবর্গ প্রায়-বিস্মৃত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা 'জটাধারীর রোজনামচা' পুনঃপ্রকাশ করে বস্তুত বাংলাসাহিত্যের পাঠকদের সঙ্গে লেখকের নতুন করে পরিচয় ঘটালেন। এ-পরিচয় রসিক মাত্রেরই কাছে আনন্দের অভিজ্ঞতা হবে বলে মনে করি। যদিও বিশ শতকের বাঙালী সমাজ অনেক বদলেছে।

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা'—জটাধারীর চোখ দিয়ে দেখতে শিখলে আমরাও একালের বিচিত্র চরিত্র, কথায় কাজে অসঙ্গতি, চাটুকারিতার ধরন চিনতে পারব। সেই গজানন চৌধুরীরা আজও অন্য নামে কাজ গুছিয়ে চলেছে, ভুল বুঝে কিংবা না বুঝে জজ রায় দিচ্ছে, দারোগা হাতে থাকলে

অপরাধী নির্ভয় এবং নির্বোধ ধনকুবেরেরা যার প্রাণপণ সেবা করে, তার দ্বারাই সর্বস্বান্ত এখনও হচ্ছে। এখনও 'পিতল কাটারি...উপরহি ঝকমকি সার' ভালো দামে বিকোচ্ছে। জটাধারী খতিয়ে দেখায় চোখ দিতে পারেন।

এখানেই জটাধারীর রোজনামচার মূল্য।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

রোজনামচা লিখিবার অভ্যাস

বিদ্যাপতি ঠাকুর পদাবলী মধ্যে লিখিয়াছেন—

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি
সকল কণ্ঠে নহে কোকিল বাণী।
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥

পাঠক!

জটাধারীর চরিতাবলীতেই ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। হঠাৎ অবতার হওয়া সকলের ভাগ্যে বিধি লিখেন নাই। শিশুর পালের মধ্যে সকলে সেন্ট পল হন না, সকল ঋষি দেবর্ষি হন না, সকল শিরোমণি রঘুনাথ শিরোমণি নহেন, কলেজের সকল ছাত্র "দর্শনের" সম্পাদক হইতে সক্ষম নহেন। স্বর্গারোহণের পথে কেহ ছাত্রবৃত্তি, প্রবেশিকা, কেহ প্রথম আর্টে, কেহ বি-এ'র পথে, কেহ মৃতদেহ চিরে চিরে, কেহ রসায়নের অগ্নিপার্শ্বে পটকে যান। যদিও আশা সকলের সমান, বুদ্ধি বা প্রতিভা সকলের সমান নহে, কেবল বুদ্ধি নহে, অবস্থার হীনতাও কখন কখন বিদ্যাহীনতার প্রধান কারণ। কিন্তু গঙ্গাধর শর্মা কেবল অবস্থার অধীন ছিলেন না, সময় দেখিয়া স্বীয় চেষ্টার উপর সতত নির্ভর করিতেন।

আমি যখন বিদ্যারম্ভ করি তখন সেকাল আর একালের প্রসঙ্গ ছিল না। রামখড়িতে ভূমিতে লিখিতে হইত, পেন্সিলের নামও ছিল না; তালপত্রে লিখিয়া রৌদ্রে কালি শুকাইতে হইত, কলাপাতে লিখিয়া ধূলা ছড়াইতে হইত; তখন "ইরেজার" বিনিময়ে চা-খড়ি, "ব্লটিং" বিনিময়ে চূণের থলি, "গম আরেবিক" বিনিময়ে, আলকাতরাবিনিন্দিত কাল গঁদের ভাণ্ড, স্বর্ণ-নির্মিত চিরকালপটু "পেটেন্ট-পেনের" বদলে বাতার কলম, মরক্ক লেদর আবৃত "ইসক্রুটপ্ মস্যাধার" বিনিময়ে চাল চুয়ানি ও ভূষাজড়িত মৃত্তিকা-পাত্র; তখন থেকার স্পিঙ্ক এবং কোং, পুরাতন সংস্কৃত যন্ত্র, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, বুদ্ধ আই, সি, বসু এবং কোং, বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতা, মুখরজি-পুত্র বা চাটুর্য্যা কোম্পানির কোন প্রসঙ্গ ছিল না।

শৈশবাবস্থায় "আগড়ুম বাগড়ুম" খেলায় বড় আমোদ ছিল, তখন "হাড়ু-ড়ুড়ু" প্রণয়সম্ভাষণ বাক্য নূতন হইয়াছিল। নামটি কোথা হইতে আসিল বলিতে পারি না, বোধ হয় ইংরেজদিগের "How do you do?" হাউ ডু ইউ ডু কথা হইতে জন্মিয়াছিল। হাউ ডু অর্থাৎ কেমন আছ, এই সম্ভাষণ করিতে গিয়া তখন যুদ্ধ বাধিত। যাহা হউক, মুসলমান বাদসা-

দিগের অনুকরণে মোগল-পাঠান খেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরেজ অনুকরণে এই খেলা হইয়া থাকিবে। এটি ঘোর যুদ্ধময় খেলার নাম ছিল। সে খেলার সর্দার গঙ্গাধর শর্মাই ছিলেন। তদ্ভিন্ন দৌড়াদৌড়ির, সাঁতার শিক্ষার ও গুলি-দণ্ড ক্ষেপণের একটি প্রধান "গ্রেজুয়েট" ছিলাম। পাঠশালার পাঠ কতক্ষণে শেষ হয়, কেবল তাই সময়ে সময়ে ভাবিতাম; কিন্তু পাঠেও একবারে অনাস্থা ছিল না, দুষ্ট ছিলাম কিন্তু ধরা ছুঁয়া দিতাম না, এই জন্যই গুরুমহাশয় কখন কখন ক্রুদ্ধ হইয়া "ভিজে বিড়ালটা" বলিয়া উঠিতেন, তাহাতে আমি উত্তর করিতাম না, কারণ নিজের গুণ নিজে বিলক্ষণ জানিতাম। গুরুমহাশয়ও তাহা সম্প্রীতি বা ভয়বশতঃ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আনাগনা ঘ, গাঁড়ের শিঙ্গে ম, হাড়গোড় ভাঙ্গা দ, কান্দে বাড়ি ধ, তিনপুটুলি শ, মিষ্ট সুরসহ লিখিতাম। তখন মূর্ধণ্য ণ, ও মূর্ধণ্য ষয়ের নামও ছিল না, কয়ে ষ যোগ করিলে যে ক্ষ হয়, তাহা গুরুমহাশয়ও জানিতেন না। এই কথার বর্ণপরিচয়ে পরিচয় পাইয়া গুরুমহাশয় এক দিন ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "বিদ্যাসাগর বিদ্যাপচার করিয়াছেন, বাপ পিতামহের অপেক্ষা তাঁর অনেক বিদ্যা।"

আমাদের স্বগ্রাম শ্রীনগর প্রকৃত শ্রীমন্ত লোকের বাস, অতি প্রসিদ্ধ পল্লী; এখানে পাঠশালা, মক্তব, চতুষ্পাঠী সকলই উজ্জ্বল ছিল। গুরুমহাশয়, আখন্দি মল্লা সাহেব, ও নবদ্বীপের ফেরত "লদের পণ্ডিত" আখ্যাধারী অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয় ভাগাভাগি করিয়া ছাত্রবর্গ মধ্যে রাজত্ব করিতেন। তখন বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, উপক্রমণিকার নামও ছিল না, অল্পেই শিক্ষা শেষ হইত। শিক্ষালাভে অপেক্ষাকৃত পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু "লাউসেন দত্ত" মহাশয়ের বেত্রাঘাত আরও কষ্টকর ছিল। কয়েক বৎসর পাঠশালার পিটনি সহ্য করিয়া পাঠ সাঙ্গ করি। পরে পিতৃব্যগণের অনুজ্ঞায় আখন্দি মিয়ার রুলের আঘাত ও তৎপর অবসরমতে চতুষ্পাঠীতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ সূত্র মুখস্থ করিতে বাধ্য হই। লতান লাউ লতা স্বরূপ লম্বাকৃতি লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয়, রক্তচক্ষু বেত্রপাণি, "দেড়ে" আখন্দি মিয়ার দয়া, ও সুপক্ক বেলবিনিন্দিত চাক্‌চিক্যমান বৃহৎ মুণ্ডধারী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গুণানুবাদ ক্রমে কীর্তিত হইবে, ইহাদের মধ্যে কাহার গুণ বেশী, কাহার তাড়না সর্বাপেক্ষা ক্লেশজনক, তাহা দুই এক কথায় হঠাৎ মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। আপাতত রোজনামচা বা দৈনিক বৃত্তান্ত লিখনারম্ভ নির্দেশ করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

আমাদের গ্রামে দীঘির নিকট পুরান থানাঘর ছিল, যদিও থানা স্থানান্তরিত হইয়াছে তথাপি ঐ পথে গমন করিলে বোধ হয় যেন এখনও সেই বৃহৎ হাতার মধ্যে বৃহৎ শ্মশ্রুধারী গোলাম সরদার দারগা সাহেব পঞ্চ অঙ্গুলিতে গণ্ডতলস্থ কেশরাশি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ইতস্ততঃ পদচালনা করিতেছেন। দারগার নামে সকলে কাঁপিত, কিন্তু আমি ত সময় পাইলেই

তাঁহার চৌকির পাশে যাইয়া বসিতাম। বলিতে পারি না কেন তিনিও আমায় ভালবাসিতেন ও কহিতেন "লেড়কা বড়া হুঁসিয়ার।" যে সময়ে দারগা সাহেবের কাছারি গরম হইত, বিরু-বরকন্দাজ চোরেদের সম্মুখে সের খাঁ, সমসের খাঁ, রামচাঁদ, শ্যামচাঁদ নামা মুষ্টি-প্রমাণ পুষ্ট যষ্টি সারি সারি ধরিয়া রাখিত, চামড়ে হাতকড়ি কসে বাঁধিত, তখন থানা প্রাঙ্গণের শতপদ মধ্যেও যাইতাম না। রবিবারে, চৌকিদার হাজিরির সময় শিষ্ট বালকের মত যাইতাম। হাজিরি লিখিতে প্রতি চৌকিদার মুন্সিজির তামাক ক্রয় জন্য এক একটি পয়সা দিত ও মুন্সিজি রোজনামচা পুস্তকে দিন দিনের ঘটনা লিখিতেন, আমি তাহাই দেখিতাম। লেখা সাঙ্গ হইলে দুই একটি মিষ্ট কথা কহিতেন, হয়ত কোন দিন দুই চারিটি পয়সা দিয়া নিকটস্থ দোকান হইতে মিষ্টান্ন খৈচুর আনাইয়া দিতেন ও দারগা সাহেব কহিতেন, "বাবা থানায় যা দেখ তাহা বাহিরে কাহাকেও কহিতে নাই, যদি কেহ বলে, শ্যামচাঁদের প্রহার লাভ হয়।" আমি থানার ঘটনা ভয়ে কাহাকেও বলিতাম না, দারগা সাহেব আমার উপর আরও সন্তুষ্ট থাকিতেন। আমিও ভাবিতাম রোজনামচা লেখা ভাল কর্ম, তাহাতে কাঁচা পয়সা আমদানি হয় ও অনেক খৈচুর খাওয়া যাইতে পারে। এই সময় আবার আমাদের গ্রামে নবাবিদ্যালয় বিভাগের একজন তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া এক দিন অবস্থিতি করিলেন। তাহাকে কেহ "ইনস্টপিস্টি", কেহ "স্টুপিড", কেহ "পেক্টরবাবু", কহিতে আরম্ভ করিল। তিনিও আবার একটি দৈনিক বিবরণ সহিত আত্মস্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিলেন। তিনি লিখিলেন, "বাবুর বাটীর বৃহৎ আরশিতে অদ্য নিজ মুখ দেখিয়া জানিলাম যে ক্রমাগত পরিভ্রমণে মুখশ্রী শুষ্ক হইয়াছে, এবার স্বস্থানে পৌঁহুছিয়া প্রতিদিন অজামাংস ভক্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিব।" কেহ রোজনামচা লিখে খৈচুর, কেহ প্রতিদিন অজামাংস আহরণে সক্ষম হন। এত ভাল রোজনামচা, ইহা লেখা কর্তব্যবোধে আমিও সময়ে সময়ে ইঁহাদের অনুকরণ করিতাম। প্রাত্যহিক ঘটনা একটি পুস্তকে লিখিতে চেষ্টা করিতাম। সেই অবধি আমার রোজনামচা লিখিবার হাতেখড়ি হয়—আজও লিখি, এমন কি এখন একটি অভ্যাসের কর্ম হইয়া উঠিয়াছে। সেই বৃহৎ পুস্তক হইতে একটি আখ্যান উদ্ধৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, বোধ হয় কোন স্থল পাঠকগণের হৃদয়রঞ্জক হইলেও হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মপরিচয়

শরৎকাল, সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল—আশ্বিন পঞ্চমী, শারদীয় পূজার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে নিবিড় আম্রতলে খেলিতে খেলিতে

সুদূরে পশ্চিমাকাশে কি দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া দিলাম। দেখিলাম সূর্য্যদেব রক্তকলেবর, বৃহৎকায়, ধীরে ধীরে রাশি রাশি শুভ্র তুলাসদৃশ মেঘমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; যেন সোনার চক্‌চকে মোহর, সাটিনের থলিতে কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বারা প্রবিষ্ট হইতেছে। সুবর্ণ থালাটি ডুবিতে ডুবিতে মেঘদল রোহিত হইল, যেন ছায়াবাজীতে কত মূর্ত্তি আকাশপটে শ্রেণীবদ্ধ হইল—ঐ আকাশবুড়ি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে—ঐ সিপাই তরবাল হস্তে দণ্ডায়মান—ঐ বাঘ পশ্চাৎ পা কুঞ্চিত করিয়া থাবা উত্তোলন করিয়া লম্ফ দিবার মনন করিতেছে—ঐ কুম্ভীর পাটীযুগল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে: আবার আরও দূরে নৌকা পতাকা সুরঙ্গে রঞ্জিত, তার উপর বাল-শশিরেখা শ্বেত ফোঁটার মত আকাশ-ললাটে ভাসিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া নীরবে দেখিতেছি, আর কি ভাবিতেছি, এমন সময় সুদূরে গ্রামে বাবুর বাটীতে একটি বন্দুকের শব্দ হইল, তাহার পরেই নৌবতের বাদ্য সানায়ের স্বরসহিত বাজিয়া উঠিল। বন্দুকের শব্দ হওয়া মাত্র শস্যক্ষেত্র হইতে শত শত বকদল উঠিয়া ইণ্ডীয় রবরের ন্যায় ক্ষণেক লম্বা ক্ষণেক ক্ষুদ্র শ্বেত মালা গাঁথিল, গ্রামের বৃক্ষরাজি লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিল—আমরাও পশ্চাতে পশ্চাতে—"বক মামা বক মামা ফুল দিয়ে যাও, যতগুলি কড়ি আছে সব লয়ে যাও", কহিতে কহিতে কোলাহলে দলে দলে দৌড়িলাম। মনে হইল, আজ আমোদের কেবল আরম্ভ নহে। নৌবতখানা, ও বড় দেওড়ির চক পার হইয়া সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া পূজার বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে পূজার বাজানা জলদ বাজিতেছে, কত কত কারিকর প্রতিমাকে নানা সাজে সজ্জিত করিতেছে, কোথাও ঝাড়ে বেলোয়ারি মালা গাঁথা হইতেছে, কোথাও কেহ সারি সারি সেজে বাতি, লণ্ঠনশ্রেণীতে নারিকেল তৈল সম্প্রদান করিতেছে। কেহ কহিতেছে, "এই ছবিটি নিম্ন হইল, সঙ্গের শিষ্ট হারাধনের ক্ষিপ্তবৎ হাত নিক্ষেপেই ভাঙ্গিবে"; কেহ কহিতেছেন, "মাঝের ঝাড়ের ঝালর বাসদেবের মাথায় ঠেকিবে"; কেহ কহিতেছেন, "শাদা গোলক লণ্ঠনের মধ্যে মধ্যে রাঙ্গা বেল-লণ্ঠন দাও"; কেহ পরামর্শ দিতেছেন, আল্‌তা গুলিয়া গেলাসে রঙ্গ দিলে বড় বাহারই হয়; আবার কেহ সুনির্ম্মিত সোলার কান্দি কান্দি কলা, আঁসাঙ্কিত মৎস্য, নবরঙ্গ রঞ্জিত ফুল-ঝারা, তরবালহস্ত তালপেতে সিপাই-শ্রেণী, নাট্যশালার চন্দ্রাতপের চতুষ্পার্শ্বে আলম্বিত করিতেছে। পূজার বাড়ী যেন প্রফুল্ল-মুখী কনের মত বড় সেজেছে। যথা প্রতিমার চালচিত্র ও কারিকরগণের তুলিকা চলিতেছে তথা হইতে যেখানে লণ্ঠন গেলাসে উড়াকি প্রমাণ তৈল বণ্টন হইতেছে, সকল দেখিলাম। এ আমার কি অভ্যাস ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু প্রতিমা-নির্ম্মাতা মিস্ত্রি-জেঠা কহিতেন, যেকালে খড়ের বন্ধন আরম্ভ হইত, তদবধি বিসর্জ্জনের দিন পর্য্যন্ত আমি সুস্থির থাকিতাম না। কখন মিস্ত্রির অসাক্ষাতে গড়িতে যাইয়া ভাঙ্গিয়া রাখিতাম; কখন আমার তুলিতে চাল-চিত্রগুলি বিলুপ্ত হইয়া থাকিত, চিত্রকরের কাজ

বাড়াইয়া দিতাম; কখন বৃদ্ধ মিস্ত্রি, গুরুমহাশয়ের দুষ্টতানিবারণী ক্ষমতা স্মরণ করিতে বাধ্য হইতেন ও যখন আমাদের উপদ্রবে তাঁহার তুলিকাচালনার নিতান্ত ব্যাঘাত দেখিতেন, "দত্তজা মহাশয় রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতেন। আমাদের প্রত্যেক উদ্যোগ, প্রতিমা-গঠন ও রঙ্গ-ফলান হইতে যাত্রাদলের বাসায় যাইয়া পূর্বাহ্ণে সঙ্গের সংবাদ মনোযোগপূর্বক সংগ্রহ করা এক বিশেষ কার্য্য ছিল সতত ব্যস্ত-সমস্ত থাকিতাম ও প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি মর্মান্তিক আক্ষেপ উপস্থিত হইত। মনে হইত কাল না হয় পরশ্ব অবশ্যই আবার গুরুমহাশয় লাউসেন দত্তের লম্বা বেত দর্শন করিতে হইবেক। কিন্তু পাঠশালা, গুরুমহাশয়, হাতছড়ি এ সকল অকথা কুকথার এখন সময় নহে।

সমারোহে অনেকেই অনেক কথা কহিতেছেন, তন্মধ্যে বাবুদ্বয়ের আদেশই প্রবল, সকলে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইতেই শশব্যস্ত—ইহাদের মধ্যে একজন অমরেন্দ্রনাথ বড়বাবু, আর একজন নরেন্দ্রনাথ ছোটবাবু মহাশয়। উভয়ের আকার প্রকার, কথাবার্তা বেশভূষার সাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় যেন যমজ সোদর। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন বাবরি এবালিস্ হয় নাই, আলবার্ট ফেসনের নামও নাই, উভয় বাবুর মস্তকে দশ আনি ছয় আনি বাটওয়ারার টেরি কাটা হইয়া উজ্জ্বল কাল কেশরাশি উভয় কর্ণের উপর সাপ খেলান হইয়া দুলিতেছে। "গুয়া-থুপি" কেশগুচ্ছ বোধ হয় অনেক যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। গোঁফ যুগলও অনেক হেফাজতের ধন, গৌরবর্ণ মুখের উপর ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম এক একটি বক্র মিহি রেখাতে শেষ হইয়াছে, ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় বেল-আটা বা মম সংযুক্ত হইয়া ঘড়ির তারের মত, স্বতন্ত্র রহিয়াছে। উভয়েরই যোড়া ভ্রূ, ভ্রূযুগলমধ্যে পূজার শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, গলায় মিহি তুলসীমালা, তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষ, একটি রক্তবর্ণ পলা ও দুইটি সোণার দানা গ্রন্থিত। চাদরখানি কুঞ্চিত, যেরূপ আল্নাতে থাকে সেইরূপই বামস্কন্ধে দুলিতেছে। পূজার বাজার,—চৌড়া কাল কিনারাশোভিত মিহি ঢাকাই ধুতি উভয়ের অঙ্গলাবণ্য সংবর্ধন করিতেছে, কোঁচার দিক্‌টি ময়ূরপুচ্ছের মত গিলাকুঞ্চিত, কাছাটি রেশমি ডোরের মত পাকান কিন্তু অপেক্ষাকৃত লম্বা। উভয় বাবুই খালি ভুমে রুমাল পাতিয়া বসিয়া আছেন, নিকটে এক একটি আঁকাবাকা কাল কাষ্ঠ-নির্মিত যষ্টি রহিয়াছে, যষ্টির শিরোভাগে রৌপ্য-নির্মিত বাঘমুখের অনুকরণ সেই মুখে আবার হরিৎ প্রস্তরখচিত আঁখিদ্বয় জ্বলিতেছে। উভয় বাবুরই এক একটি পুতির নল সংযুক্ত ও রজতনির্মিত কলিকা শিরাবরণভূষিত গুড়-গুড়ি মক্‌মলের জিরন্দাজে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও মুহুর্মুহুঃ খাম্বিরা তামাক পরিবর্তিত হইয়া ভুড় ভুড় শব্দ করিতেছে। জ্যেষ্ঠবাবু মহাশয় যেখানে বসিয়া আছেন সেইখানেই ধূমপুঞ্জ উড়াইতেছেন, তাঁহার কাছে কাহারও কোন বিষয়ে কলিকা পাইবার যো নাই। কনিষ্ঠবাবু মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে

স্তম্ভপার্শ্বে যাইয়া ফরসির নল ধারণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্ভ্রম সংবৃদ্ধি করিতেছেন, অন্তরালে থাকিয়াও রকম বরকম কমটান সটান শব্দে জ্যেষ্ঠ সোদরের কর্ণসুখ সম্পাদন করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ অতি উদার, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "ইহার অপেক্ষা সম্মুখে হইলে ভাল হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের চক্ষুলজ্জা উৎপত্তি হয়, নচেৎ সময়ে সময়ে অন্তরালে নির্ভয়ে এরূপ টান টানেন যে আমাদের জন্য কিছুই থাকে না।" পারিষদের সহিত বাবুগণ এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, ও উৎসবের উদ্যোগের সহায়তা করিতেছেন। ভৃত্য অনুচর যে আসিতেছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইতেছে ও "বৈঠকখানায় জেও, পার্বণী প্রস্তুত আছে", শুনিয়া সানন্দ হৃদয়ে বিদায় হইতেছে। উভয় বাবুই উদার, সকলের সমদুঃখগ্রাহী, লোক-পালক, প্রিয়বাদী, ধনী, শ্রীমন্তের সন্তান তাহাতেই এত আদর। আমি বাবু-গণের ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিকটস্থ হইলাম। আমার বেশভূষা তাদৃশ পরিষ্কার ছিল না, ষষ্ঠীর দিন পার্বণী বস্ত্র বাহির করিয়া আমিও বাবু সাজিবার আশায় সুখী ছিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ওরে সেই জটা এত বড় হয়েছে! আয়রে ভাই", কহিয়া হস্ত ধরিয়া নিকটে লইলেন। "শ্যাম-বর্ণের উপর জটার কেমন শ্রী দেখ, তুই বড়লোক হবি, কিন্তু তোর পিতা তোরে ভালবাসেন না, তা হলে ভাল কাপড় দিতেন", এই কথা কহিতে কহিতে যেন চমকিয়া উঠিয়া ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ওরে হুঁকা লয়ে যা কর্তামহাশয় আসিতেছেন।" এই কর্তামহাশয় কে? কর্তা শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র সকল মুখ হইতে লঘুতা অন্তরিত হইল, বৃথা কথা থামিল, সব স্বর স্তব্ধ হইল, সকলে তটস্থ ও দণ্ডায়মান। বাবু আশুতোষ রায় কর্তাবাবু মহাশয়ের পূজার বাটীতে আবির্ভাব, যেমন গৌরকান্তি তেমনি গম্ভীর ভাব, তাঁহার স্বর শুনিবামাত্র আমরা এক কোণে প্রস্থান করিয়া সুস্থির-ভাবে দণ্ডায়মান হইলাম ও ভাবিতে লাগিলাম, আমি ইহার মত বাবু হইতে পারিব না?

পাঠক! হেস না, আজকাল বাবু হওয়া অতি সহজ কর্ম; বোধ হয় তদপেক্ষা আর সহজ কর্ম নাই; চুলে তেল দাও, তিন আনা মূল্যের কাঁকুয়ে টেরি কাট ও দশ আনা গজের কাল আল্পাকার চাপকান ঝুলাও। বাজারে সাইড স্প্রিংসংযুক্ত চকচকে পাদুকার অভাব কি? চীনেবাজারে দ্বাদশ আনা মূল্যের ফুলদার টুপি ক্রয় কর, অভাব কি? আবার বাবু হইবারই বা ভাবনা কি? এখনও শ্যামলা কিনিতে পার না, সোণার চেনের বাহার দিতে পার না? নাই পারিবে? বড়বাবু নাই বা হলে, কেরাণিবাবু হও, কনেস্টবল বাবু হও, না হও—পাচকঠাকুর বাবু হও,—না হয় রেলওয়ে কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ কর—"টিকিটবাবু", "ডাকবাবু", "তারবাবু", "টোলবাবু", "পাইন্ট-মেনবাবু", "ঘণ্টাবাবু", হও; নিতান্ত তা না হও কন্ট্রাক্ট বা ঠিকার কার্য্য

গ্রহণ কর, তাহাতে "শিলিপটবাবু", "ইটবাবু", না হয় "ঘুটিংবাবু"ও ত হইলেই হইবে?

কিন্তু গঙ্গাধর শর্মা যে বাবু হইতে আকাঙ্ক্ষী, সে বাবু এরূপ নহে—তখন বাবুর অন্য অর্থ ছিল। পাঠক! একবার চতুরঙ্গ বা শতরঞ্চ খেলা সজ্জার কাষ্ঠনির্মিত রাজা ও তৎপ্রতিরূপ দুর্ভিক্ষের ফেমিনী রাজা, রঙ্গের গোলামীবিনিন্দিত বড় দরবারের শস্ত্রভীত কানায়ে 'নাইট' বাহাদুরীহীন 'রায়বাহাদুর', ভূমি-শূন্য 'রাজা', রাজ্যশূন্য 'মহারাজা', এক পলের জন্য ভুল, বোধ হয় চিরকালের জন্য ভুলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। জটাধারী যে বাবু হইতে চাহিয়াছিলেন, সে ভদ্রের দৃষ্টান্তস্থল এখন বিরল; সেই বাবুসকল কেবল বেতন তালিকার গেজেটের বাবু নহেন, এক এক বৃহৎ দেশ সেই পূর্বতন বাবুবংশের রাজ্য ছিল। সেই বাবুদের অন্তঃপুরের মহিলাগণ কেবল হীরার খেলনা, বা অলঙ্কারের, বা বারাণসী শাটীর গর্বে গর্বিত হইতেন না, তাঁহারা ধর্ম কর্মে, ব্রত দানে, দেবালয়, জলাশয়, জাঙ্গাল প্রতিষ্ঠা উদ্দেশে পাগলিনীপ্রায়। আবার সেই বাবুগণ কেবল শ্বেত বস্ত্রে ও শুভ্র লম্বা কোঁচায় ধনের পরিচয় দিতেন না, তাঁহাদের এক দিকে প্রভুত্ব আর দিকে বহুজনে প্রতিপালনই প্রধান ধর্ম জানিতেন। যাহাদের দান ধ্যান, ক্রিয়াকলাপের কথা এখন উপকথা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাদের সুনাম দানের যশ ও সুখ্যাতির স্রোত সহস্র সহস্র দরিদ্র ও অতিথের মুখে মুখে বৃন্দাবন হইতে পুরীর মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত প্রবাহিত হইত; সেইরূপ একটি বাবু দেখিয়াই গঙ্গাধরের কিশোর মন বিচলিত হইয়াছিল—সেইরূপ রাজ্যধর ও রাজ্যপালনসক্ষম বাবুর কুল এখন লুপ্তপ্রায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিসর্জনের বাজনা

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিসর্জনের বাজনায় নূতন কি আছে? পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের সময় হইতে ঐ বাজনা একই ভাবে বাজিয়া আসিতেছে। বাদ্যকরের হাতের জোরও কম দেখি না, শানায়ের সুরেরও খর্বতা নাই, সে গলা ধরিবার নহে ঢোল কাঁসি বরং আজকাল শুনিতে বেশী খনখনে বোধ হয়, কারণ আমরা সুমিষ্ট জয়ঢাক ও বুগল শুনিতেছি। বাজনার সময় একবার শোকের আবির্ভাব হয়, মিত্রবিলাপ, বিচ্ছেদধ্বনি হৃদয় ধমনীকে বিলোড়িত করে, দুই একটি নিমজ্জিত প্রিয়তমের বিগত মলিন মুখশ্রীর ছায়ামাত্র স্মৃতিদর্পণে দেখা যায়। বিসর্জনের বাজনা সাঙ্গ হইলে আমরাও দুই এক বিন্দু অশ্রুবিসর্জন করি, কিন্তু দিনান্তে বাজনাও ভুলি, শোকও ভুলি, ভুলিয়া আবার সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকি—ইহার নূতন কথা

কি? নূতন কথা পুরাণ কথার বিস্মরণ, ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই বাজনার আনুষঙ্গী যাহা ছিল তাহা একবার মনে করে দিই, বোধ হয় তাহাতে বর্ত্তমান সময়ের উন্নতির প্রকৃত পরিমিতি নয়নগোচর হইবে।

ঐ শুন বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে—গ্রামের ঈশান কোণে প্রান্তে উচ্চ জাঙ্গালের পদতলে একটি ক্ষুদ্র খালে শরদের জল খর খর চলিতেছে, খালটি আঁকা বাঁকা একটি মোড়ে নব দুর্গাদহ, গম্ভীর ও প্রশস্ত, এক দিকে উচ্চ বাঁধ, অপর পাড়ে বিস্তৃত তৃণময় হরিৎ প্রান্তর। নিকটবর্ত্তী পঞ্চক্রোশব্যাপী সপ্তগ্রামের প্রায় সমস্ত লোক, আবালবৃদ্ধবনিতা ঐ প্রান্তরে মিলিত হইয়াছে; সকলের শিরোভূষণ স্বরূপ, প্রশস্ত প্রশান্ত অঙ্গশালী, গম্ভীরমূর্ত্তি আশুতোষ বাবু সসন্তান আত্মীয় পারিষদ অনুগত সহ নবদূর্বাদলশোভিত উচ্চ ভূমি-শিরে দন্ডায়মান; উপর্য্যুপরি পূজার তিন দিন প্রায় অনশনে যাপন করিয়া-ছেন, প্রত্যূষে সকলের অগ্রে গাত্রোত্থান করিয়াছেন, রাত্রে সকলের শেষে সকল কার্য্য নির্ব্বাহান্তে ও পরদিবস প্রাতে যাহাকে যে কর্ম্ম করিতে হইবে তদুপ-দেশ প্রদান করিয়া শয্যায় গমন করিয়াছেন। কেবল কর্ম্মক্ষেত্রের আমোদে, অন্নদানে, মিষ্টান্নদানে, বস্ত্রদানে, পার্ব্বণী প্রদানে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক হইতে দিগম্বরী কাল মুচিনীর পর্য্যন্ত দুঃখহরণে তিন দিনরাত্র প্রায় অনিদ্রা অনাহারে যাপন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কোমল শরীর ক্লান্তিশূন্য, মুখশ্রী প্রসন্ন, সকল বিষয়েই সম উৎসাহী, মর্ম্মান্তিক ভক্তি ও ধর্ম্মবলে বলবান। বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে, সকলের দৃষ্টি হইতে এই মাত্র সজ্জিত প্রতিমা-খানি জলমধ্যে নিমগ্ন হইল, জলে ঊর্ম্মি-রেখা আর দেখা যাইতেছে না, গগনের রাঙ্গা রঙ্গ সেই জলে প্রতিবিম্বিত, যেন আরশি উপরে সিন্দুরবিন্দু ছড়ান হইয়াছে। ক্রমে গগন আঁধারে ঘোর হইতেছে, তথাপি জনতা কমিতেছে না, দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ ভদ্র অভদ্র সকলেই একটি তামাসা দেখিতে ঠেলাঠেলি করিতেছে, ছড়ি বেত পশ্চিমে পদাতিক বাবাজিদের হস্ত হইতে দরিদ্রের পৃষ্ঠে পট্ পট্ পড়িতেছে; পড়ুক সহ্য হয়, তবু তামাসা দেখিব এই ভাবিয়া ঠেলিতেছে, ভিড় আরও বাড়িতেছে। বিসর্জ্জনের বাজনা আরও জোরে বাজি-তেছে—গঙ্গাধর একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের স্কন্ধে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে খেলা দেখি-তেছেন। আজকাল অনেকে জিজ্ঞাসিতে পারেন এ আবার কিসের ভিড়? এ কিছু ইটালিয়ন অপেরা নহে, গিলবার্টের বাজি নহে, মমের পুতুলের মত যুবতী মেমদলের বল বা নৃত্য নহে, বড় সাহেবের লেবি নহে, ছোট সাহেবের দরবার নহে, ইংরেজি ছায়াবাজি নহে, তবে ছাই কিসের ভিড়? নিগারদলের হট্টগোল! পাইকদলের সর্দ্দার রঘুবীর রায়বাঁশ ঘুরাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার ছাড়িতেছে। ভিড় ঠেলিয়া দেখ তাহার কেমন অঙ্গসৌষ্ঠব, সে মিছরির বাতাসা খায় না, সোডা এসিডের নামও জানে না, পাচক সিরপ্ দেখিলে গোচোনা বলিয়া হাস্য করে, ব্যায়াম তাহার সালসা, ঐ খালের জলই তাহার হজমের আরক, কাহাকেও বিস্ফোটকের জ্বালায় অস্থির দেখিলে হাস্য

করে ও কহে "আমার হইলে কুস্তির সময় একটিপে বসাইয়া দিতাম।" সে ডিস্পেন্সরি ডাক্তারখানার ধার ধারে না, বৈদ্যের নাম শুনিলে গালি দেয়—তথাপি তাহার শ্রী দেখ। বক্ষদেশ বিস্তৃত—লোহার কপাট—হস্তপদ কুঁদে নির্মিত গোল গোল মুদ্গরপ্রায়; কেশরাশি প্রচুর, আলুথালু, তাহার কপালে দুলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে আঁখি ঢাকিতেছে; সেই আঁখি রক্তবর্ণ, সেই কাল চুলের মধ্য দিয়া সিন্দুর মেঘের ন্যায় জ্বলিতেছে। রঘুবীর নাচিতেছে, লাফাইতেছে, চামর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা-পরিবেষ্টিত একখানি বৃহৎ সুপক্ক তেল চক্চকে রায়বাঁশ ঘুরাইতেছে; তাহার উপযুক্ত তিন শত অনুচর ঢাল, তরবাল, বল্লাম, সড়াঁক, তীর, গদকা, রায়বাঁশ, লম্বা লম্বা বন্দুক হস্তে তাহার দিকে দেখিতেছে ও মধ্যে মধ্যে সাবাস দিতেছে। বিসর্জনের বাজনা আরও জোরে বাজিতেছে—অপর গ্রামের আবার একজন খেলয়াড়ের সর্দার দুই শত অনুচরসহ খেলিতে আসিয়াছে। ইহাদের পাঁচ সাত জন পালয়ান পঞ্চু সরদারের সঙ্গে লাঠি চালাইতেছে; রঘুবীরকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। দ্বাদশ জোয়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক বর্ষণ করিতেছে—কিন্তু রঘুবীরের এক রায়বাঁশ ঘুরিতেছে, বন্ বন্ শব্দ হইতেছে, দর্শকের মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে; বিপক্ষদলের লাঠি তাহার লোমমাত্র স্পর্শ করিতেও অক্ষম। অমরেন্দ্রনাথবাবু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া স্কন্ধ হইতে চাদর লইয়া রঘুবীরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রঘুর আর খেলা আবশ্যক হইল না, শিরপা মাথায় বান্ধিয়া প্রণাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। বিসর্জনের বাজনা আরও জোরে বাজিয়া উঠিল—আবার তীরন্দাজ মুচিরাম সর্দার রঙ্গভূমে প্রবিষ্ট হইল, নানাপ্রকার জঙ্গলে ফল, কচি বেল, তাল, সেঁকুল, পারিকুল দূরে জাঙ্গালের জঙ্গলের উপরস্থিত হইল, মুচিরাম তিন চারিটি অনুচর সঙ্গে, সুসন্ধানে তীর বন্‌বন্ শব্দে দোড়াইলেন। ফলগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল, চারি দিক হইতে "জিও মুচে" শব্দ গগন ভেদ করিল। চতুষ্পাঠীর তর্কালঙ্কার মহাশয় নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দন্তহীন ওষ্ঠে হাসিতে হাসিতে নিজ চরণের ধূলি সংগ্রহ করিয়া মুচিরামের কপাল ভরিয়া দিলেন, মুচিরাম চরিতার্থ জ্ঞানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আবার জোরে বিসর্জনের বাজনা বাজিল—আবার খেলা বড় মাতিল। ময়দানে আর জায়গা হয় না, তামাসা দেখিবার আশায় কেহ বটবৃক্ষশাখে, কেহ তালবৃক্ষের অর্ধেক উঠিয়া স্কন্ধ ধরিয়া জড়াজড়ি করিয়া খেলা দেখিতেছে। গদকা লাঠি খেলান্তে মল্লযুদ্ধে মহীতল কাঁপিয়া উঠিল। তরবাল খেলা হইবার উদ্যোগে বড় দাড়ী গোলাম সর্দার দারগা সাহেব কি হুকুম দিলেন, সে খেলা আর হইল না।

অমরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই বিশেষ ব্যায়ামপটু ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে মল্লোযোদ্ধাদের বিশেষ আদর বৃদ্ধি হইয়াছিল। নিয়ত প্রাতে বালকগণকে কেদারায় বসাইয়া এক হস্তে এক পায়া ধরিয়া শূন্যে উঠাইতেন; যে লোক এক হস্তে ঢেঁকি ঘুরাইয়া এক বিঘা অন্তরে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ

করিত তাহাকে একসের কাঁচা ছোলা খাইতে দিতেন; যে দুই হস্তে আড়াই মণ করিয়া পাঁচ মণ বস্তা উঠাইত সে এক সের ময়দা পাইত; যে মাথা ঠুকিয়া বৃক্ষ হেলাইতে পারিত সে এক টাকা বক্‌সিস পাইত। যে পশ্চিমে পালয়ানকে কুস্তিতে পরাভব করিত সে উভয় হস্তে রূপার বালা পাইত। তাঁহাদের উৎসাহে বীরত্বের উৎসাহ হইত।

এখন সন্ধ্যাকাল—প্রায় নিশাতে পর্য্যাপ্ত—হস্তী ঘোটক পতাকা শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া পদাতিক সহ দাঁড়াইল। দুই একটি খেলার মাত্র সময় আছে। প্রথমতঃ নবমীপূজার বলীর মধ্যে একটি বুড় ছাগলের বৃহৎ কাটা-মুণ্ড দর্শক পাইকদলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বলে যে পাইক তাহা দখল করিতে পারিবে মুণ্ডটি তারই হইবে, আবার একটি টাকা পুরস্কার পাইবে। পলে পলে মুণ্ডটি এক হাত হইতে অন্য হস্তে পতিত হইতে লাগিল, সমস্ত প্রাঙ্গণ ঘুরিয়া আসিল, অনেকেরই মুষ্টিশক্তির পরীক্ষা হইল, অল্পক্ষণ মধ্যে মুণ্ডটি লোমহীন হইল, ক্রমে তাহা রঘুবীরেরই করগত হইলে, চারিদিক "রঘুর জয়!" "রঘুরই জয়!" শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল। সকলের অনুরোধে অমরেন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ অশ্বারোহী হইলেন। নদীজলে দুইটি বোতল নিক্ষিপ্ত হইল, কাল মুখদ্বয়ের গোল রেখামাত্র কাল সন্ধ্যা-জলে দৃষ্ট হইতে লাগিল। দূর হইতে উভয় অশ্ব দৌড়িল, নদীস্রোতসহ সমান্তরালে দৌড়িতে দৌড়িতে দুটি বন্দুক ছুটিল, ধূমপুঞ্জসহ নদীবক্ষে ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দ হইয়া বোতলাগ্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া খণ্ডে খণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল। একটি পশ্চিমা সিপাহী কহিয়া উঠিল "বাহবা! বাহবা! খোদা খয়ের করে! খোদা খয়ের! যব সরদাব এসা হ্যায়, তব তাঁবেদার লোক কাহে নেহি খেলা শিখে?" আশুতোষবাবুর প্রফুল্ল ওষ্ঠে তড়িতের ক্ষীণ রেখার ন্যায় হাস্য ঈষৎ খেলিল।

মুহূর্তে বাদাম্বর পরিবর্তিত হইল। সমারোহে সুসজ্জিত অশ্ব, গজ, পদাতিক, পতাকাশ্রেণীসহ শত শত রসদীপালোকে লোকস্রোত উৎসব শেষে বৈরাগ্যমনে গৃহাভিমুখে প্রবাহিত হইল, বৃক্ষশাখা হইতে স্থানে স্থানে ভীত পিককুল হুর হুর করিয়া উড়িয়া গেল; ক্রমে স্থূলে জনস্রোত শাখা প্রশাখাতে বিভক্ত হইয়া নানা পথে, অলিগলিতে দশ দিকে ছড়িয়া পড়িল ও ক্রমে বিলীন হইল। শত শত লোক আবার মিষ্টান্ন ও সিদ্ধিপানাশয়ে বাবুজীর গৃহাভি-মুখে চলিল, অনেকে কহিতে লাগিল—"আবার এক বৎসর বাঁচি ত দেখিব।"

পরদিবস গঙ্গাধর শর্মা স্বহস্তে লাঠি তরবার প্রস্তুত করিয়া, নিজমুখে বাজনা বাজাইয়া সমবয়স্ক সঙ্গী-সঙ্গে বিসর্জনের খেলা আরম্ভ করিলেন; সেই খেলার অভ্যাস অনেক দিন রাখিয়াছিলাম, কিন্তু খোলাবর খানাতল্লাসির ভয়ে সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র হইয়াছে, আমরা সভ্য হইয়াছি। সতীরা পতিপূজা ত্যাগ করিয়াছেন, পুরুষ সকলে স্ত্রীর অধীন হইয়াছেন—আমরা তথাপি সভ্য হইতেছি, স্ত্রী পুরুষ "উচ্চ

শিক্ষার" দোহাই দিয়া পুস্তক পাড়তে সক্ষম হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে স্কুল বসিতেছে, তরিবত মণ্ডলের ছেলে পর্যন্ত তরিবত পাইতেছে, কালা জেলে মৎস্য ধরে না, নাইট স্কুলে এটেণ্ড দিতে শিখিয়াছে। আল্লা রাখী মুসলমানী, হেমলতা ব্রাহ্মণী, এক বেঞ্চে বসিয়া সুশিক্ষিত হইতেছে, ভবিষ্যতের একই বাঞ্ছা বৃদ্ধি করিতেছে। সাহসশিক্ষা গোঁয়ারের কার্য্য হইয়াছে, শস্ত্রশিক্ষা চোয়াড়ের ব্যবসা, পুস্তকরচনা শান্ত লোকের সার উদ্দেশ্য, সকলে আইন পড়, বাক্‌পটু হও—এই সকল শিক্ষা হইতেছে, আর শিক্ষার আব উন্নতির বাকি কি? এদিকে বীরত্ব সম্বন্ধে বিসর্জনের বাজনা উঠিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কোলাকোলি

বিসর্জনান্তে শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ' আশুতোষবাবুর বৃহৎ অট্টালিকা এখন উৎসবরবশূন্য। বাদ্যের সুরও আর এক রকম, চিরপ্রথানুসারে সন্ধ্যার পরে চণ্ডীবেদির কাষ্ঠনির্মিত চৌকির এককোণে একটিমাত্র ক্ষীণ দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে বৃহৎ কক্ষের সীমান্তরের অন্ধকার মাত্র পরিদৃশ্যমান—ছবি কি ঝাড়ের বেলয়ারি দুল যেন শোকসূচক নীল বস্তাবৃত ঘেরাটোপে আবদ্ধ হইয়াছে। কেবল প্রকৃতির রূপান্তর নাই—সমাজসুখে প্রকৃতির মুখ বিমল করে না—দশমীর চাঁদ সমান উজ্জ্বল, তাহাতে আবার পূজার বাটীর শুভ্র বৃহৎ প্রাচীর-চূড় দীপ্তিমান্। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ পরে বিসর্জনের বাজনা থামিয়াছে, আশুতোষ রায় স্বজনসমভিব্যাহারে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডীর বেদি লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন, পরে অধিষ্ঠাতা-গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন, তর্কালঙ্কারকে নমস্কার করিয়া কোলাকোলি আরম্ভ করিলেন। অশীতি বর্ষীয় গ্রামের ভট্টাচার্য মহাশয় অস্থির মস্তক নড় নড় করিতে করিতে আসিতেছেন, পলিতকেশ সিদ্ধান্ত মহাশয় একটিমাত্র জীর্ণ দন্তে হাসি প্রকাশ করিয়া বাহু প্রসার করিতেছেন, এই বৃদ্ধ হইতে নৃত্যশালী গিরিধারী, গোপাল, ভূপাল বালকগণকে আশুতোষবাবু সমসমাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন—গঙ্গাধরও একবার বড়লোকের অঙ্গস্পর্শনে আপনাকে বড়লোক জ্ঞান করিলেন। আবার আশুতোষবাবু কাহারও দাড়ি চুম্বন করিতেছেন, কাহারও মস্তকে করপল্লব প্রদানে আশীর্বাদ করিতেছেন, যেন আত্মীয় স্বজন, ভৃত্যশ্রেণী, গ্রামস্থ, দেশস্থ অধীন প্রজাপুঞ্জকে, তাবৎ দেশ তাবৎ পৃথিবীকেই প্রণয়পাশে পরিবদ্ধ করিতেছেন—সৌহার্দস্রোত চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। শক্তিপূজান্তে এই প্রথাটি কেমন প্রীতিকর! সভ্যতার প্রভাবে এটিও কি পরিত্যক্ত হইবে? এই প্রথায় আমোদ আছে কিন্তু এই আমোদের বেলাভূমে যেন শোক-ঊর্মি স্মৃতিবায়ুতে উত্থিত হইয়া এক একবার

প্রতিঘাত হইতেছে। আশুবাবু এক একবার কহিয়া উঠিতেছেন "আজ ঈশান কই? থাকিলে কত হাসি হাসাইত, গুরুদাস থাকিলে দশ গণ্ডা মিঠাই উঠাইত, কৈলাসের সংগে সঙ্গেই আমোদ উঠিয়া গিয়াছে।" সিদ্ধান্ত কহিতে-ছেন, "তপস্যার ফল—সব অল্পভোগীরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।" আবার কেহ কহিতেছে, "আমাদের এই কোলাকোলিই শেষ—আর বৎসর এ দিন দেখতে বি আর মহামায়া রাখবেন।" অমনি সংগে সংগে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে, আবার এই সময়ে উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কোন হতভাগ্যের জননীর ক্রন্দন-ধ্বনি হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে—"সবাই নেচে খেলে বেড়াচ্চে কেবল আমার সেই নাই—" কেহ অধীরা হইয়া জগজ্জননীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তোমাকে কে দয়াময়ী বলে?" এইরূপ আমোদে শোকে সংশ্লিষ্ট হইয়া কোলাকোলি ব্যাপার প্রায় শেষ হইল। আমি অন্তঃপুরদিকে মহিলাগণের নিকট আসিয়া দেখিলাম গ্রামের ভদ্রবংশের সমস্ত কুলনারীগণ একত্রিত—চাঁদের আলোকে একটি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছেন। সকলের চারু প্রতিমা অলঙ্কার ভূষণ সহ আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। চাঁদের হাটের কেন্দ্রস্বরূপ রাঙ্গাঠাকুরুণ বিরাজিত; অল্প বয়সে বৈধব্য শোকে তাঁহার রাঙ্গা মুখের রাঙ্গা আভা যেন কিঞ্চিৎ পাতলা হইয়াছে, তবু শ্বেত বস্ত্রাবৃত মুখলাবণ্য চন্দ্রকিরণে যেন শ্বেত গোলাপের ন্যায় দেখা যাইতেছে, যেন শ্বেতকিরণ শ্বেতকুমুদে আকাশের চাঁদ মর্ত্ত্যের চাঁদে মিলিত হইয়াছে। আমি মাতার কোলে উঠিলাম। রাঙ্গাঠাকুরুণ হেসে বলিলেন, "উঠিল, এত বড় ছেলে আবার কোলে চড়ে?" দাইমা কহিল, "হউক, চিরকাল চড়ুক।" জননী সস্নেহে চুম্বন করিলেন ও কহিলেন, "ওমা আমার দুদের গোপাল—খোকা বৈকি?" আবার একটি নারী কহিল, "রাম খোকা।" নারীনিকরমধ্যে একটি মাতৃক্রোড়স্থ শিশু এই সময় কহিয়া উঠিল, "মা আমি স্ট্যের খোকা।" খোকার মা কহিলেন, "কি মিষ্ট কথা আমার নীলমণির।" আমি নীলমণির দিকে দেখিলাম। নীলমণি একটি দ্বাদশ বৎসরের গৌরবর্ণ বালক, কিন্তু খর্ব, অশিষ্ট মুখশ্রী, মোটা মোটা ভোতা অঙ্গাবয়ব, পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী ও মূল্যবান স্বর্ণতারনির্মিত রত্নখচিত ফুলদার কিনখাপের চাপকান, পীতবর্ণ সাটিনের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পপুঞ্জ সুশোভিত পায়জামা, তাহার নীচে গোলাপী রেসমী মোজাদ্বয়ের কিঞ্চিৎ অংশ দৃশ্যমান, পদদ্বয়ের অগ্রভাগে জরির পাদুকা শোভমান। এ দিকে আবার চাপকানের উপর বক্ষঃ-দেশে স্থূল সুবর্ণনির্মিত হীরাকাটা চন্দ্রসূর্য্যের আভাপ্রকাশক তারাহার। তার উপর রামধনুপ্রভাসম কোমল কেরেপের জলতরঙ্গিণী ফিনফিনে উড়ানী, মস্তকে জাজ্বল্যমান জরীর জারখ বরখ কারুকার্যপূর্ণ রত্নখচিত টুপি, উভয় কর্ণে কুণ্ডল দোলায়মান, নাসাগ্রে দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র ডিম্বাবয়ব মুক্তা ঝলমল করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় নীলমণি কোন হঠাৎ অবতারের আহ্লাদে ছেলে! আমি কহিলাম, "এস ভাই খেলা করি।" নীলমণির মাতা কহিলেন, "বাছা বড় তরাসে, সেই প্রতিমা বের হবার পূর্বে বন্দুকের শব্দ

শুনে পর্যন্ত আমার কোল ছাড়ে নাই, বাজনার শব্দ শুনে কাণে আঙ্গুল দিয়ে চক্ষু মুদে ছিল, বাছা—এই এতক্ষণে বাজনা থেমেছে তবে বাছা চেয়েছে।" নীলমণির প্রতি আমি দেখিতেছিলাম, এমন সময় আশুতোষবাবুর কয়েকটি কথা আমার কাণে বাজিল, "অমরেন্দ্রনাথ কোথায় ?" অনুসন্ধান করিয়া একটি ভৃত্য আসিয়া কহিল যে, কালিন্দী সরোবর ঘাটে সোপানে একক বসিয়াছিলেন। পরক্ষণেই অমরেন্দ্রনাথ আগত হইলেন। তিনি সকলকে মর্যাদানুসারে প্রণাম করিলেন, নমস্কার করিলেন, কোলাকোলি করিলেন; কিন্তু অন্যমনস্ক, কোন বিষয়ে মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হইল। যে সময়ে তিনি বিসর্জনের ঘাটে গুলিতে বোতল ভাঙ্গেন, সেই সময় একটি রত্ন দেখিয়াছিলেন, দেখিয়াই আবার হারাইয়াছেন, আবার কেমন করে পাইবেন, তাহাই ভাবিতেছেন।

বোতল চূর্ণ হইলে, ঘোটক হইতে অবতরণ সময়ে খালের অপরকূলে জাঙ্গালের দিকে অমরেন্দ্রনাথ নয়ন-নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নব তৃণময় হেলান বান্ধ লোকাকীর্ণ, কেবল সর্বোচ্চ স্থানে একটি নব্যবনতমাল-তলে দেখিলেন যে, সুসজ্জিত পার্বণী অলংকার বেশভূষিতা কয়েকটি কামিনী দণ্ডায়মান; তন্মধ্যে একটি কুমুদমুখ প্রস্ফুটিত; প্রায় কন্যাটি দ্বাদশবর্ষ মাত্র উত্তীর্ণ, নীলাম্বর পরিবেষ্টিত তাহার সুন্দর মুখ সুনীল, স্বচ্ছ সরোবরে কোমল শতদলস্বরূপ লাবণ্যময়। অমরেন্দ্রনাথ অশ্ব হইতে অবতরণ সময়েই জাঙ্গাল হইতে লোকসংকুল ছড়ান হইল, সেই ভিড়ে তাঁহার রত্নটি মিশাইয়া গেল। সেটি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছিল ? কোন্ গৃহ উজ্জ্বল করিতে চলিল ? আর কি তারে দেখিব ? এমন সুললিত প্রেমময়ী স্বর্গীয় কনককমল কি সমলবারিস্বরূপ দুঃখীজনগৃহে দুঃখশয্যাশায়িনী হইবে ? না রাজগৃহে রাজমহিষী হইয়া বিরাজ করিবে ?

অমরেন্দ্রনাথ আজ মনশ্চাঞ্চল্য প্রথমে অনুভব করিলেন, বাল্যসুখ আজ বিচলিত হইল। সকলের সহিত বিসর্জনান্তে কোলাকোলি ও অপর আমোদ উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু প্লাবিত গঙ্গাবক্ষে স্রোত চলিতে চলিতে তাঁহার বাঞ্ছাবারি কোন নিগূঢ় আকর্ষণী-গুণে জলচক্রে পাতিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে সুগভীর হৃদয়খনিতে একটি মণি স্পর্শন জন্য পাক মারিতেছে, ডুব দিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আশুতোষবাবুর কাছারি

আমাদের শ্রীনগরাধিপতি মহাত্মা আশুতোষবাবুর নাম চিরপ্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল যখন তিনি প্রায় সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হন, আপামর সকলে আপন আপন আয়ুর কিয়দংশ কাটিয়া তাঁহাকে জীবিত রাখি-

বার জন্য গ্রামের দেবমন্দিরে একত্র হইয়া কেন আরাধনা করিয়াছিল? দরিদ্রের কুটির হইতে আমার জন্য—হে সমতাবাদী সুজন! তোমার জন্য এরূপ প্রার্থনা কেন না গগনে উঠে! আশুতোষবাবু উচ্চতর রাজপুরুষদের নিকট তাদৃশ পরিচিত নহেন। সংবাদপত্রে, কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্রে বা বৎসরান্তে সাধারণ উপকারের কার্য্যতালিকায় নাম বাহির করিবার জন্য তাদৃশ অভিলাষী ছিলেন না। হয়ত অনেক সাহেব তাঁহার নামও শুনেন নাই; কিন্তু যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি কখন তাঁহাকে ভুলিবেন না, তাঁহার বাঙ্গালিজাতির উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রবীণ সজ্জন ডাক্তর ইটওয়াল সাহেব, আশুতোষবাবুকে আত্যন্তিক সম্মান করিতেন ও অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতেন, কিন্তু সাহেব কখন তাঁহাকে নগরে যাইয়া কোন রাজ-পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলে আশুবাবু হাসিয়া কহিতেন, "আমি ওমেদার নহি।" যদি ধনপুত্রে স্বচ্ছন্দতায়, বিস্তৃত রাজ্যখণ্ডের স্বামিত্বে, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা খনন, জাঙ্গালনির্ম্মাণ, দেবালয় স্থাপন, দেব-সেবা, অতিথিসেবা, ধর্ম্মশালা স্থানে স্থানে স্থাপনায়, যশঃকীর্ত্তির গৌরবে কাহাকেও সুখী করিতে পারে, তবে, বোধ হয়, আশুতোষবাবু মর্ত্ত্যে একজন নিতান্তই সুখী পুরুষ ছিলেন। যেমন একদিকে তাঁহার প্রতি ভাগ্যদেবী অনুকূল, প্রকৃতি সুন্দরীও তাঁহাকে সেইরূপ সুন্দর প্রকৃতি দিয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক বা শারীরিক সৌকুমার্য্য অধিক সুন্দর, এইরূপ বিতর্ক সতত উপস্থিত হইত। একদিকে তাঁহার রাজীবলোচনের সুপ্রভা, হাস্যময় সুকুমার ওষ্ঠ, চম্পক পুষ্পের ন্যায় বিলোড়িত অঙ্গুলিনির্দ্দেশ, আর একদিকে সুমধুর শোকনিবারণকারী সুবচন যখন তোমার হৃদয়কে শীতল করিত, তখন নিজ অনুতাপ ভুলিয়া বিলক্ষণ বোধ হইত, যে এই মহাজন যথার্থই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

সূর্য্যোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত প্রতিদণ্ডেই প্রায় তাঁহার উদারতার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইত। সূর্য্যোদয় না হইতে হইতেই দেখ চারিদিক হইতে তাঁহার কপোতপাল পালে পালে উড়িয়া সূর্য্যের কিরণ অবরোধ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেছে; খর্ব্ব খর্ব্ব পাতিহংস, বৃহত্তরকায় লম্বগ্রীব রাজহংসগণ কাকলী রবে তাঁহার চরণ নিকটে আহার প্রার্থনা করিতেছে, দৈনিক সর্ষপ বা তণ্ডুল বিতরণ হইতেছে; ইহারা উদর পূরণ করিয়া চলিয়া গেল, বাবুমহাশয় বৈঠকখানায় স্বীয় আসনে বসিলেন, চারি পার্শ্বে কতকগুলি পিঞ্জরে শ্যামা, ময়না, শারিকা, হলুদগুঁড়ি, তুঁতি, নুরি, হিরামোহন, একটি চল্লিশ বৎসরের হরিৎ শিখাধারী কাকাতোয়া, বেষ্টন করিয়া বসিল। একটি বড় পিয়ালাপূর্ণ দুগ্ধ, কতকগুলি হিঙ্গুলে পুত্তলের মত সুশ্রী স্বর্ণালঙ্কৃত বালকবালিকা আসিয়া জুটিল। বাবুমহাশয় বেদানা ভাঙ্গিতেছেন, সাদরে শিশুদের মুখে প্রদান করিতেছেন। আবার একদিকে ক্ষুদ্র চামচে ভরিয়া পক্ষীর মুখেও দুগ্ধ দিতেছেন, পড়িতে কহিতেছেন; আবার মধ্যে মধ্যে রাজ-

কার্য্যের উপদেশ দিয়া মন্ত্রী ভৃত্যবর্গকে পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে অতিথের একটি বৃহৎ ঝণ্ডি আসিয়া উপস্থিত, তাহাদের সহিত কতকগুলি টাট্টু, একটি উট, কতকগুলি তুরি ভেরী, শঙ্খ ও ছালা ছালা শালগ্রাম ও বিগ্রহ ছিল। অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র ভেরী বাজিয়া উঠিল; শিশু সকল ভয় পাইয়া অন্তঃপুর দিকে পলায়ন করিল, কেহ ভেরীর সঙ্গে সঙ্গে আপন রোদনধ্বনি মিশাইল, ভয় ভাঙ্গাইবার জন্য আশুতোষবাবু একটি শিশুকে স্বক্রোড় লইলেন। এদিকে ঝণ্ডির সর্দার বিভূতিভূষণ জটাধারী রুদ্রাক্ষমালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে দোল গুড়ের হাঁড়ির মত স্ফীত উদরে উচ্চরবে একটি আশীর্বাদ বচনে ধন-পুত্রস্বচ্ছন্দতা দান করিলেন, পরে কোন মহাপুরুষের ন্যায় হেলিতে দুলিতে, কোন সৈন্যদলের অধিনায়কের চালে চলিতে চলিতে, স্পর্ধাসহকারে বাবু-মহাশয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার জনৈক চেলা একটি রাঙ্গা বনাতের আসন পাড়িয়া দিল, আর একজন অনুচর দূর হইতে কহিয়া উঠিল—

"সাধুকো চড়াও টাট্টু খিলাও লাড্ডু।"

ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় অনুচর খাদস্বরে জলদতানে—

"লাদ দেও, লাদায় দেও, লাদন হারা সঙ্গত দেও,
বৃন্দাবনমে পোঁছা দেও", কহিয়া উঠিল।

বাবুমহাশয় এসকল ভণ্ডামি বিলক্ষণ বুঝিতেন, হিন্দুধর্মের কি সার অসার সকলই জানিতেন, কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে দশজন প্রতি-পালনের জন্যই ভগবান একজন বড়লোকের সৃজন করিয়া থাকেন, তাঁহার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ ভক্তি ছিল না, নেড়ানেড়ী বাউলদাসের উপর তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না, বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রশংসা করিলে দুই একটি বৈষ্ণবী বারাঙ্গনার নাম উল্লেখ করিয়া ধর্মের গৌরব প্রমাণ করিতেন। সে যাহা হউক তিনি সাধুর সহিত বিতর্ক করিলেন, সাধুকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া মনে মনে হাসি-লেন, তাঁহার নিকট ক্রোধনিবারণী ঔষধও ছিল। দুই ছিলিম গঞ্জিকা, কয়েকটি আফিঙ্গের বড়ি ও আহারোপযোগী ঘৃত ময়দা দান করিবার আদেশ দিয়া সাধুসর্দারকে ঝণ্ডি সহ বিদায় করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, একটি ভদ্র প্রজা কাচা গলায় দিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র আশুতোষবাবু কহিয়া উঠিলেন, "কে বাপু পরীক্ষিৎ? কবিরাজকে যে পাঠাইয়াছিলাম কোন উপকার হইল না? তোমার পিতাকে বাঁচাইতে পারিল না? সৎকার কেমন করে হল? কাল রাত্রে যে বড় বর্ষা হইয়াছিল, গোলা হইতে গোমস্তা গড়ে কাট দিয়াছিল কি না?" পরীক্ষিৎ উত্তর কি দিবে, কান্দিয়াই অস্থির হইল। বাবুমহাশয় আবার কহিলেন, "ঐ সকলের পথ, দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ মাত্র; যদি সুসন্তান হও এখন শ্রাদ্ধাদির উপায় কর।"

প। শ্রাদ্ধের কর্তা, মহাশয়।

কর্তামহাশয় তখনি ভণ্ডারিকে ডাকাইলেন, পরীক্ষিতের অবস্থানুযায়ী শ্রাদ্ধের সমস্ত উপকরণের তালিকা প্রস্তুত হইল, কোন হাম্বার হইতে ধান, কোন গোলা হইতে চাল, কোন উদ্যান হইতে উদ্ভিজ্জ তরু তরকারি, কোন মালের পুষ্করিণী হইতে মৎস্য লইবার অনুজ্ঞা দিলেন। আবার ভাগীদের আপত্তি আশঙ্কায় নিম্নস্বরে কহিলেন, "যদি আবশ্যক হয় রায়বাঁদের বায়ু-কোণে সেই পুরান পাকুড় গাছটি কাটিয়া লইও, জ্বালানের সুসার হইবেক।" এই কথা শেষ না হইতেই সভাপতি তর্কালঙ্কার মহাশয় উপস্থিত হইলেন; অধ্যাপকের সহিত বাবুমহাশয় সতত পরিহাসে অনুরক্ত। দেখিবামাত্র কহিলেন, "ইংরেজেরা অনেক ক্রিয়া রহিত করিতেছে, গঙ্গাসাগরে সন্তান সম্প্রদান করা বন্ধ করিল, সতীর আগুন খাওয়া উঠাইল, শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্বন্ধে একটি নিয়ম হইলে দরিদ্রেরা ব্রাহ্মণগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায়।" "মাসত্রয় মাত্র সেই রেমরায়ের" (মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম অধ্যাপক এই প্রকার উচ্চারণ করিতেন)—"মাসত্রয় রেমরায়ের পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন এখনও সেই কুমন্ত্রণা ভুলিলেন না?" অমনি জানুদেশে হস্তাঘাত করিতে করিতে "সব উচ্ছন্ন গেল!" বলিতে বলিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, (ক্রোধভরে এক পা চালনা না করিতেই তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাবলীটি খসিয়া পড়িল)। এ একটি কুলক্ষণ মনে করিয়া স্তব্ধ হইলেন। অমনি একটি কর্মচারী কহিয়া উঠিল, "মহাশয় প্রস্থানের কর্ম নয়—এ দিকে পলাইবেন ঐ দিকে ধরিবে; ঐ দেখুন ইনকম্‌টেক্সের পিয়াদা মহাশয়ের নামে বিজ্ঞাপন জারি করিতে আসিয়াছে",—কম্পিতকলেবর অধ্যাপক মহাশয় ইনকম্‌টেক্সের নাম শুনিয়াই বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন, "ব্যাপার কি?"

কর্মচারী বলিল, 'মহাশয়ের সম্বৎসরের আটচাল্লিশ টাকা মাত্র কর ধার্য হইয়াছে—এই বিজ্ঞাপনটি লইয়া রাখিয়াছি—এই মোহর—এই দস্তখৎ।"

তর্কা। "মোহর দস্তখত তোমরা দেখ, নুটিস আর আমি দেখিব না, এখন উপায়? কর্তা এই সম্মুখে। মহাশয় একখানি গ্রাম নিষ্কর করিয়া দিলেন, সকলে জানিল, কথা রাষ্ট্র হইল, তাহাতে এই জ্বালা বাড়িল—কি বিপদ! কোথা রাজা ব্রাহ্মণে দান দিবে, না দানের অংশ আতপ তণ্ডুল, কলা, মূল, কাচকলায় পর্যন্ত হস্ত নিক্ষেপ! পিয়াদা কোথায়?" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিলেন, "ভাল স্মরণ হয়েছে সে দিন চান্দ্রায়ণের পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা আমার প্রাপ্তি আছে, মহাশয়!" স্মরণ করিয়া দিবামাত্র আশুতোষ-বাবু আদেশ করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় পঞ্চ মুদ্রা পাইলেন, হস্তে লইলেন ও মস্তক হেলাইয়া কহিলেন, "পঞ্চ মুদ্রা পঞ্চ আনা ষট শতাধিক সহস্রং কপর্দক মূল্যম্", সঙ্গে সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি সিকি ও চারিটি পয়সা পাইলেন। সিকিটি আবার কর্মচারীর হস্তে দিয়া কহিলেন, "বাপু! পিয়াদাকে এইটি দিয়ে বিজ্ঞাপনে রূপস লিখে দেও, অনুপস্থানকে রূপস বলনা তোমরা? আমি শ্রীহরি বলিয়া প্রস্থান করি।" ইঙ্গিতমাত্রে

এই সময় একটি সাজান পিয়াদা কহিয়া উঠিল, "ও তর্কালঙ্কার মহাশয়, রসিদ দিয়ে যান।" তর্কালঙ্কার পশ্চাতে অবলোকন করিলেন না, দ্রুতগতি বৈঠকখানার পশ্চাতে যাইয়া করসংগ্রাহককে অভিসম্পাত দিয়া উদ্যানবনে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার দেখা কে পায়?

এখন বিষয়কার্য আরম্ভ হইল। আশুবাবু পকেট বুক্, মেমো কেশ, পেন্সিল, হাতচিঠি, সংবাদপত্রের কলম কাটা সরকুলার, হুকুমের শিলপ রাখিতেন না, কিন্তু কার্য্য সময়ে বাল্মীকি, ব্যাস, পঞ্চতন্ত্র, নীতি, আনওয়ার সোহেলির কেস্সা, সাদির বয়েত, বিদ্যাপতি চন্ডীদাসের কবিতাবলী, তুলসীদাসের কহত, কবীরের দোহা, সময়ে সময়ে অনর্গল ব্যাখ্যা করিতেন; আবার রাজহাঁসের খাঁচার ভগ্নদ্বার মেরামত হইয়াছে কি না তাহাও একমুখে প্রশ্ন করিতেছেন। অপর মুহূর্তে পার্লমেন্ট সভায় আয়কর সম্বন্ধে মন্ত্রিগণের বক্তৃতার যে অনুবাদ ভাস্করপত্রে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা মুখে মুখে কহিয়া সকলের কৌতুক হরণ করিতেছেন। এমন সময় নিকটস্থ কনকপুর গ্রাম হইতে, একটি হত্যাকান্ডের সংবাদ আসিল। তিন দিবস পর্যন্ত ঐ গ্রামে কুলনারীগণ নিজ নিজ গৃহে বন্ধি হইয়া রহিয়াছে, অন্নের হাঁড়ি অগ্নিস্পর্শ করে না, পথে লোক চলে না, ঘাটে জল নড়ে না—কেবল রাঙ্গা পাগড়ী মেহুদীরঙ্গরঞ্জিত বৃহৎ বৃহৎ দাড়ি, রক্তচক্ষুর নিম্নভাগে ঝোপের মত বড় গোঁফাল বরকন্দাজদল গ্রামের তলমাটি উপর করিতেছে। কনকপুর রঘুবীরের ঘর গ্রাম, রঘুবীর আপন স্ত্রী সোণা বাগ্দিনীকে কুচরিত্রা সন্দেহে বিলক্ষণ প্রহার করে, সোণা অভিমানে আত্মহত্যার উদ্যোগ করিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়াছিল; রঘু ভাগ্যক্রমে সময়ে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাঁচায়, এই দুটি কথা দারগা সাহেবের কর্ণগোচর হয়, এখন রঘু স্ত্রী সহিত অভিযুক্ত। প্রথমতঃ দারগা সাহেব একদাম খুনের অভিযোগ করেন, পরে রঘু ফেরার হইলে আত্মহত্যার উদ্যম জন্য তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতেছেন, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ জন্য সমস্ত গ্রাম উৎসন্ন যাইবার উদ্যোগ হইতেছে। সাক্ষী রাখিয়া কে আত্মহত্যার উদ্যোগ করে? কিন্তু সাক্ষী সংগ্রহ জন্য একদিকে রাজকর্মচারিগণ যেমন তৎপর, অন্যদিকে সমস্ত গ্রামস্থ লোক সদ্দারপুত্রকে রক্ষা করিতে যত্নবান্। কি হইবে—কে উদ্ধার করিবে? সাত পাঁচ ভাবিয়া গ্রাম্যমতে যিনি ভবের ভাবনা ভাবিয়া থাকেন—আশুতোষবাবুর নিকট গ্রামস্থ মুখ্য মণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোণাই মন্ডল সকলের অগ্রসর, স্থূলকায়, খর্বকলেবর, মাথায় টাক—সোণাই মন্ডলের কপালের মধ্যভাগে গোলাকৃতি একটি আধুলি প্রমাণ ধূলার দাগ, ব্রাহ্মণগণকে ঘন ঘন প্রণাম করিয়া তিনি পরমগৌরবে এই চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। সোণার হস্তে কয়েকটি আম্রপত্র, ব্রাহ্মণ দেখিলে সেই পত্রে পদরেণু

লইয়া নিজ ওষ্ঠে সম্প্রদান করেন, কারণ এইরূপ ধূলা খাইয়াই তাঁহার শূলে রোগ আরাম হইয়াছে। তাহার পশ্চাতে, রামুরায় ফৌজদারির গোমস্তা. লম্বাকৃতি, বঙ্কপৃষ্ঠ, অতিশয় টেরাচক্ষু ও উভয়পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বয় বঙ্কভাবে পাদুকার চর্ম কাটিয়া বাহির হইয়া মিলিত—জুতা পরিবার বিশেষ আবশ্যক দেখা যায় না। পায়ের গোড়ালি যেন হালি মেটে দেওয়াল ফাটিয়া উঠিয়াছে; ফাটাসমূহ মোমে ও ঘুটের ছাইয়ে আবদ্ধ; উপরে, জানুতল পর্যন্ত লোমরাজি ধূলায় ধূসর, উভয়ে পাদুকাদ্বয় ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন, ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ হইলেন। প্রকৃত ঘটনা ক্ষণমধ্যে আশুতোষবাবুর কর্ণগোচর হইল, তাঁহাকে কথা অতি সহজ বোধ হইল। "ভ্রষ্টা স্ত্রী আত্মাভিমানে আত্মহত্যা হইবার উদ্যোগ করিয়াছিল?" আশুবাবু কহিলেন, "এই কি বড় গুরুতর কথা, যদি গুরুতরই হয় সেজন্য দণ্ড দিতে এত ঔৎসুক্য কেন? 'আইন' 'আইন' করিয়াই সকলে ব্যস্ত হতেছে।—যে আইনে যে পুলিসে একদিন সিঁধচুরি বন্ধ হইল না, যাহারা আমাদের ধন মান ডাকাইত হস্ত হইতে ও বড় সাঁকোর লাঠিয়ালের লাঠি হইতে রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা আমাদের নিজের প্রাণ নিজ হাত হইতে রক্ষা করিতে এত ব্যস্ত কেন?" সোণাই মণ্ডল খাদস্বরে কহিয়া উঠিল—"বড় গম্ভীরের কথা—এই কথা শুনিবার আশায় এই আশ্রয়ে এই শ্রীচরণতলে আমাদের এতদূর আগমন, এখন রক্ষা করুন।"

আশুতোষবাবু কহিলেন, "তোমাদের কথাগুলি দেওয়ানজী গজাননের নিকট যাইয়া কহ—নিষ্পত্তি জন্য তোমাদের মোকদ্দমা তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিলাম। তিনি দারগার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; তোমরা স্নান আহার কর, পরে আরাম করিয়া দেয়ানজীর নিকট যাইবে, সকল কথার নিষ্পত্তি মুহূর্তে হইবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
দেওয়ান গজানন চৌধুরী

গজাননের প্রকৃতির প্রকৃত বর্ণনার্থ দুষ্ট সরস্বতীর বর প্রার্থনা করি। কপটতা, চাতুর্য তাঁহার শত্রুদমনের প্রবল অস্ত্র, বাক্‌পটুতা, চাটুকারিতা, প্রিয়-বাক্য, মাটির মত অচলতা তাঁহার বশীকরণ মন্ত্র। তাঁহার সত্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি গল্প সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। শুনা যায়, জাহ্নবীস্রোতে কয় নৌকা বিলাতী মিথ্যা কথা ভাসিয়া আসিয়াছিল, দেশের কয়েকটি লোকে তাহা ভাগাভাগি করিয়া লয়। ব্যবস্থাজীবী কেহ বাকি ছিলেন না, মোক্তার বলুন আরও উচ্চ লোক বলুন, গোমস্তা, কুঠিয়াল, মহাজন, সওদাগর অনেকে পড়িয়া কাড়াকাড়ি করেন; কেহ বেশি কেহ কম ভাগ লইয়া কার্যক্ষেত্রে গমন করেন।

গজানন তখন কার্যান্তরে অর্থাৎ একটি দলিল স্বহস্তে কাটকুট করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে পেঁাহুছিয়া দেখিলেন, দেশের লোকের ভাগা-ভাগিতেই সব কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। গজানন হতাশ হইয়া, ব্যাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে বসিলেন, দেবীর স্তুতি আরম্ভ করিলেন, ধরণা দিলেন—অবশেষে আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা করায় জাহ্নবীদেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। দেবী কহিলেন, "বাছা! মিথ্যাকথার ভাগ পাও নাই বলিয়া তুমি কাঁদিতেছ—তোমার ভাগে আবশ্যক? ষোল আনা রকম মিথ্যা তোমায় দিতেছি—অদ্যাবধি তুমি যাহা কহিবে মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। যা কহিবে তাহাই মিথ্যা হইবে।" সেই পর্যন্ত গজানন মিথ্যা রচনায় সম্পূর্ণ পটু হইলেন। কিন্তু এই অসরল লোক সরলস্বভাব আশুতোষবাবুর নিকট অনেক দূর প্রতিপন্ন ছিলেন। ঋজুচিত্ত আশুতোষ সময়ে সময়ে গজাননের চক্রভেদ করিতে অশক্ত হইতেন বা অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন; কারণ আশুতোষবাবুর রাজ্যোন্নতিসাধন গজাননের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যে উপায়ে হউক কার্য উদ্ধার করিতেন, কিন্তু আশু-বাবু ফলমাত্র বিজ্ঞাত, উপায়চক্র গজাননের গভীর মনকূপেই বদ্ধ থাকিত। এদিকে মোকদ্দমা গড়িতে, ভাঙ্গিতে, পাকাইতে, কাঁচাইতে, পাখা দিতে, উড়াইতে দেওয়ানজী অদ্বিতীয় গুণাধার। সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায়, তাঁহার চক্ষে সব সমান, গোময় চন্দন সমানজ্ঞান। গজানন মিথ্যার মহাদেব! নয় শ উননব্বয়ের তোড়াটি সহস্র টাকা পূর্ণ করাই তাঁহার কার্যের উদ্দেশ্য—ঐহিকের সারধর্ম বলিয়া জ্ঞান ছিল। যেমন ঔষধগুণে ফণাধারী সর্প নতশির, সেইরূপ গজাননের মন্ত্রে দম্ভশালী দারগা, ভীষণমুখ জমাদার, সমস্ত সরকারী কর্মচারী সমনম্র।

আরামান্তে গজানন কি শিকার করিব তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় সোণাই মণ্ডল ও রামু রায় আসিয়া উপস্থিত, ইঙ্গিতমাত্র তাহাদের মোকদ্দমা বুঝিলেন, ও মুহূর্ত মধ্যে তাহাদের সঙ্গে লইয়া দেওয়ানজী কনকপুরে উপস্থিত হইলেন। একটি স্বতন্ত্র গোলাবাটীর ঈশানকোণাংশে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বসিলেন। দুই দণ্ডের মধ্যে, স্বয়ং দারগা সাহেব দাড়ি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে তথায় উপস্থিত ও ক্ষণকাল মধ্যে পরামর্শ, অঙ্গুলি নির্দেশ, অঙ্গুলি বিক্ষেপণের দ্বারা পরস্পর গাত্রে লিখন ও কাণাকাণি করিয়া কমিটীর কার্যারম্ভ ও মজলিস গরম হইল। রঘুবীর আর ফেরার নাই, পচা পুকুরের পাণিসেওলা-লেপিত অঙ্গসহ রঘুবীর বৈঠকসম্মুখে করজোড় হইয়া বসিয়াছে, মধ্যে মধ্যে আসনের নিকটে তলব হইতেছে ও নিলামের ডাকের মত দারগার দাবি চড়িতেছে, বাড়িতেছে। দেওয়ানজী মহাশয়ের নিঃস্বার্থ মধ্যস্থলী। রঘুবীর জানিতেছে তিনি পরম শুভকারী, দারগা জানিতেছেন তিনি কেবল শকতরা দশ টাকা অংশের অংশী। এখন এক দুই, একশ রূপেয়া তিন—ডাক থামিল। রঘুবীরকে চঞ্চল দেখিয়া দেওয়ানজী

কহিলেন, "ডাক বন্ধ হইলে আর ফিরে? সরকারের হুকুম! বলে—হাকিম ফিরে তবু হুকুম ফিরে না।" রঘুবীরের চক্ষু স্থির, তাহার কুঁড়ের চার কোণ খুঁজিলে ত এক কড়া কাণা কড়ি পাইবার যো নাই—কিন্তু এদিকে টাকাতেই কলম চলে, টাকাতেই মুখ খুলে, টাকাতেই সত্য ঢাকে, মোকদ্দমা উড়ে, টাকা না হইলে রিপোর্ট কেমন করে খতম হয়? দেওয়ানজী রঘুবীরকে লইয়া আবার আর এক ঘরে উপস্থিত। "টাকার কি?" "ওরে টাকার কি?" "টাকা?" "টাকা রে?" "ওরে টাকা?" এরূপ কয়েকটি গোল গোল কথাতেই রঘুবীরের মাথাটি টাকা টাকায় সম্পূর্ণ হইল, টাকা টাকা করিয়া ঘুরিতেছে বোধ হইল—কহিল, "দেওয়ানজী মহাশয়, আপনি রাখুন দেওয়ানজী মহাশয়!" দেওয়ানজী কহিলেন, "তোর কয় বিঘা জায়গির?"

রঘু। বত্রিশ বিঘা।

গজানন বলিলেন, "তবে ভাবনা কি? আমিই টাকা দিচ্চি, আমার খাতায় লিখে পড়ে নিচ্চি, তুই একটা সই করে দে, আর না দিবিই বা কেন? আমি কি পর? পর রে পর? তোর মিত্র না শত্রু?" এক দিকে রঘুবীরের জায়গিরটে দেওয়ানজীর হস্তগত, অন্য দিকে সে চির অনুসারী কৃতদাস হইল।

এই সময় আর একটি ব্যাঘাত উপস্থিত। দারগা সাহেব রিপোর্ট করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কি একটি সংবাদ পাইয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল। রঘুবীরের বুড় শ্বশুর শঙ্কর সর্দার বাঁকিয়া বসিয়াছে, কন্যাটিকে লুকাইয়া রাখিয়া "খুন" "খুন" করিতেছে, তাহার মাথায় খুন চাড়িয়া গিয়াছে, পূজা করিয়া স্নিগ্ধ করিতে হইবেক, মন্ত্রবলে খুন ঝাড়িতে হইবে, তবে খুন নামিবে, না হইলে দারগা যাহা করুন সে খুন খুন করিয়া খোদ মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে উপস্থিত হইবেই হইবে। একজন পদাতিক আসিয়া এই সংবাদ কহিতে কহিতে আর একজন আসিল। দারগা কহিলেন, "খবর কি?"

পদাতিক। "খবর! শঙ্কর সর্দার জলপান বেঁধে নদী পার হইয়া গিয়াছে এতক্ষণ কোলার মাঠ পাছু করলে।"

দেওয়ানজী শঙ্করকে কখন দেখেন নাই। জিজ্ঞাসিলেন, "লোকটা কেমন?"

পদা। "কেমন? তালপাতের সিপাই, এক চক্ষু অন্ধ, উদরপীড়ায় বিব্রত, কিন্তু কথার বড় আঁট, শির-চটা লোক হজুর।"

দেও। "উদরপীড়ায় বিব্রত! মার্ দিয়া। যখন বেদনায় কাতর হবে শর্মার হাতে আসবে—এই এল আর কি, এল—লাউসেন দত্তকে ডাক্, আর উদরাময়ের পাকতেল এনে রাখ্—তবে রে একজন দৌড়। ঔষধের নাম করে ফিরিয়ে আন্। আর তাতে না আসে—দৌড়, পথে যেখানে পাবি ধরবি, বগলে দাবিয়ে ধরবি আর হাজির করবি—যা দৌড়—দেখবো ধরেচিস কি, হাজির করেচিস। হাজির করলি?"

পদাতিক দৌড়িল, দারগা সাহেব ও দেওয়ানজী পাশাপাশি করিয়া বসি

লেন, ক্ষণকাল মধ্যে আমাদের গুরুমহাশয় লাউসেন দত্তও পোঁহুছিলেন। তিনি কেবল শিক্ষক নহেন, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, তাঁহাকে কেহ শুভঙ্কর জানিত, কেহ ধন্বন্তরি বলিত; লম্বাকার দত্তজ মহাশয় লতিয়ে লতিয়ে আসিলেন, গজাননের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইলেন, একপার্শ্বে বসিলেন। যেমন অপরাপর গৃহরাজিমধ্যে জগন্নাথের মন্দির, নগরের অট্টালিকামধ্যে নূতন পোস্ট আফিস-গৃহের চূড়া, তেমনি অপর লোকের মধ্যে দত্তজ মহাশয়ের পক্ক কেশসংযুক্ত উন্নত মস্তক; আর সকলের মস্তক তাঁহার স্কন্ধদেশের নিম্নভাগে রহিল, দত্তজ মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে হইলে সকলকে আকাশের দিকে চাহিতে হইত। দত্তজ মহাশয় বসিবামাত্র উড়ানির এক কোণের একটি বড় পুটলি খুলিলেন, তাহাতে জড়িবড়ি খল নুড়ি ও কতকগুলি পুরান কাগজের মোড়ক খুলিয়া সামনে সাজাইলেন, আবার এখনকার এবালিসি ঔষধ পানের রস, তুলসিপাতা, আদা ও মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে কহিলেন। ইতিমধ্যে দূরে একটি চীৎকার শব্দ শুনা গেল। "দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের" "দোহাই মেজেস্টার সাহেবের, রক্ষা কর!" দেওয়ানজী শব্দ শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন—এই শব্দ তাঁহার জয়সূচক ধ্বনি। মনে জানিলেন শিকার হস্তগত, শিকার শঙ্কর সর্দার পদাতিকের বগলে শূন্যে শূন্যে আসিতেছে, চলিতে হইতেছে না, ঔষধ পাইয়া আরাম লাভ করিবে তাহাও জানিয়াছে, মোকদ্দমা রফা হইবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; বাণী পটিবে, টাকা গাঁটে বান্ধিবে, সকল মনে মনে জানিতেছে, গুণিতেছে, তবু চীৎকারে গগন ভেদ করিতেছে; এ চীৎকারের মানে আছে; দর বাড়াইতেছে। যখন যাহাকে দরকার তখন তার দর বাড়ে, দর বাড়াইতে কে ত্রুটি করে? যাহা হউক কিঞ্চিৎকাল মধ্যে দেওয়ানজীর নিকট শঙ্কর সর্দার আনীত হইল। দেওয়ানজী দত্তজ মহাশয়কে ইঙ্গিত করিলেন। লাউসেন মহাশয় শঙ্করের সর্বাঙ্গে ধুলো ছড়াইয়া দুই একটি ফুঁক্ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাকতেল মাখাইতে কহিলেন ও শঙ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিলেন ও পরে কহিয়া উঠিলেন, "আমি দেখচি তুই ভাল হবি; তবে কিনা 'উপচার বিনা ব্যাধি ঔষধ সেবনং বৃথা।' কেবল্ ঔষধে কিছু হবার নয়, এতে গদ চাই, পদ চাই, ঝাড়ন চাই, ফুকন চাই!"

দেওয়ানজী কহিলেন, "সব হবে, শঙ্কর বাহাদুর এত দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে হয় না? পেটের পীড়া আবার ছার পীড়া! কয় দিন থাকে! দুদিন মাখ থাক; পুরান চালের অন্ন খাও, মদ্গুর মৎস্যের ঝোল আহার কর। ব্যাম? গেল রে গেল এই গেল আর থাকে? লাউসেন সেই স্বপ্নাদ্য ঔষধটা ভুল না—ওকে খাওয়াব ভাল করব করবই করব।" দেওয়ানজী কার্য্য-সাধন জন্য সকলের স্তুতি করিতেন, তাহাতে তাঁহার অপমান জ্ঞান ছিল না। মুহূর্তে শঙ্কর তাঁহার দাস হইল, মোকদ্দমা আর উড়াইবার দেরি কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুরুতর মোকদ্দমা

দারগা সাহেব থানা-অভিমুখী। তাঁহার ঘোটক-পৃষ্ঠে রাঙ্গা রঙ্গের চারজামা চড়িয়াছে, গলায় ঘুঙ্গুরের মালা দুলিতেছে, তার উপর নীল সুতে জরি জড়ান দুটি চাক্‌চিক্যমান পেঁচ, কর্ণদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে গলদেশে শোভমান। অশ্বের অগ্রপদদ্বয়ের কিঞ্চিৎ উপরে আদুরে ছেলের সজ্জিত বক্ষদেশের মত রৌপ্যনির্মিত দ্বাদশটি তক্তি-মালা, সুশোভিত নোক্তা ও খলিন রজ্জু আবার আর এক প্রকার, সিন্দুরে রঙ্গের সুলতানী বনাতে জড়িত। উভয় কর্ণের পাশে নোক্তার কোণে দুটি রুপার চাঁদ ও নোক্তার উপরিভাগে মধ্যদেশ হইতে অশ্বের অক্ষিদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নতলে একটি উজ্জ্বল জরির তবক ও জরির ফুল ঝুলিতেছে। গোল, স্থূল, তাজি ঘোড়া যথার্থই গাজি মরদ সাজিয়াছে। বাগডোর সহিস ধরিয়া রহিয়াছে—কিন্তু অশ্বটি অস্থির, ঘুরিতেছে, নাচিতেছে, হ্রেষারবে হাঁসা ঘোড়া সকলকে জাগরিত রাখিয়াছে। আজ পাড়ার ছেলের নিদ্রা নাই, একটি যেমন তেমন তামাসা মজুদ থাকিলে কি ছেলেরা সুস্থির থাকে? আমি আপনার অনুচরগণকে ঘর হইতে, ঘাট হইতে, পাঠশালার কানাচ হইতে ইশারা করিয়া "দারগার ঘোঁড়া দেখবি" বলিয়া একত্রিত করিয়াছি। ঘোড়াটি হেঁ হেঁ করিলে এক একটি ছেলে হেঁ হেঁ করিতেছে। দারগার ভয় প্রবল, তবু কেহ কেহ মৃদুস্বরে "ঘোঁড়া মুখে নড়া" কেহ "ঘোঁড়া বাগ্‌নাপাড়া—নাকে দাঁড়ি" কহিযা কপ্‌চাইতেছে। আবার কেহ বচন সংশোধন করিয়া দিতেছে—

> "ও ঘোঁড়া তোর নাকে দড়া
> নিয়ে যাব বাগ্‌নাপাড়া।"

এমন সময় দারগা সাহেব গোলাবাটীর বৈঠক হইতে চাবুক হস্তে বহির্গত হইলেন, তাঁহার বৃহৎ শ্মশ্রু দর্শনে অনেক ছেলে বৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, দুই একটি শিশু কান্দিয়া হাত তুলিয়া ভয়ে অপরিচিত জনের কোলে চড়িলেন, কিন্তু গোলাম সর্দার সাহেব আমার পুরাতন বন্ধু, আমাকে দেখিয়া মনে করিলেন, জটার কাছে ফাঁকি নাই। ভাবিলেন, "যতগুলি টাকা গুণে লইয়াছি, জটা সব দেখিয়াছে—সব মনে মনে গণিয়াছে।" সহাস্য বদনে আমায় কহিলেন, "ক্যা লেড়কা বহুত রোজসে মুলাকাত নাহি।" আমি বিনা-বাক্যে একটি সেলাম করিলাম। দারগা সাহেব নিকটে আসিয়া চাপকানের নীচে সামনের জেবে হাত দিলেন, ঝনাৎ করিয়া উঠিল, তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন, আবার বড় সাবধানে একটি টাকা বাহির করিয়া গ্রামের ছেলেদিগকে মেঠাই খাইতে দিলেন, গ্রামস্থ সকলে সন্তুষ্ট হইল—এটি ঘুসের উপর ঘুস চড়িল।

দারগা সাহেব অশ্বারোহণে উদ্যত। এমন সময় রঘুবীরের একটি নূতন

নালিশ উপস্থিত হইল, সে হঠাৎ কহিয়া উঠিল, "দারগা সাহেব হুজুর! আমার বিচার হ'ল না ধর্মাবতার।'

দারগা। ঘোঁড়া চড়িতে পেছু ডাকলি!

হিতে বিপরীত, দারগা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "হারামজাদা—পাঁচ রুপেয়া জরিমানা।" রঘু কহিল, "জরিমানা করুন, মেরে ফেলুন, কেটে ফেলুন, আজ রঘু হুজুরের অনুগত, পদানত—হে প্রভু! পিঠে চিহ্ন দেখুন—জায়গা নাই —গন্ধর্ব উড়ে গেছে।"

রঘুবীর পৃষ্ঠদেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া, লাঠি ও বেতের দাগের উপর দাগ দেখাইল। "এত দাগ কিসে হল?" এই কথাগুলি দারগা কহিতে না কহিতে রঘুবীর নয়নজলে ভাসিয়া গেল। কাঁদ কাঁদ অর্ধোচ্চারিত কথায় কহিল, "মোরে গেছি কর্তা!" আবার কহিতে কহিতে ভূমে পতিত হইল।

গজানন এই সময়ে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত, "ওরে রে রঘুরে! ছ্যা —কান্দিস্ না—সকল কথা বল, এবার সিংহের পোয়েদের—শ্রাদ্ধ হবে—হবেই হবে—করবই করব।" অমনি বাম হস্তের মুষ্টিতে দক্ষিণ হস্তে দুই তিনটি চপেটাঘাত করিলেন। গজাননের কথায় দারগা সাহেব উঠেন, বসেন, তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন; রঘুবীরের অভিযোগ আরম্ভ হইল, আবার কাছারী গরম হইল। রঘুবীর আরম্ভ করিল, "হুজুর চড় চাপড়, কিল, গড়ারি; ঘাড়ধাক্কা, মারপিট, গুতাগুতি, লাঠালাঠির কিছু বাকি নাই।" বলিয়াই আবার রোদন আরম্ভ করিল।

গজানন কহিলেন, "রঘু এতদ্রূপ বলবান্ না হইলে বোধ হয় মারা পড়িত। ও ফেরার ছিল, মনে মনে আপনাকে দোষী না জানিলে একাই দশ গ্রামের লোক ভাগাত।" আবার রঘুর দিকে দেখিয়া কহিলেন, "রহ—রহ তোর হয়ে আমি বলিতেছি—বল্‌ছি, তুমি থাম—থামরে থাম। যখন আত্মহত্যার মোকদ্দমা—"

রঘু। আমার আত্মহত্যা হওয়া ছিল ভাল—বাপ! এত অপমান!

গজা। থামরে রঘু থাম—কথা কইতে দিবি, না গোলযোগ করবি? দারগা সাহেব! যখন আত্মহত্যার উপযোগিতা জন্য, আপনি রঘুবীরকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দেন, সে ফেরার হইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরিতেছিল। মাঠে মাঠে —রৌদ্রে রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া শান্তিপুরের সিংহবাবুদের বাটীর পশ্চাদ্ভাগে পুষ্করিণীর বান্ধাঘাটে শ্রান্তি দূর করিতে গিয়াছিল—ওর গ্রহ!

রঘু অংসভাগ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "না গেলেই ভাল হ'ত—বাপ!"

গজানন কহিলেন, "থাম—থাম রে থাম—তারপর আপন বস্ত্রে পাথেয় খাদ্য বান্ধিয়া রঘু ঘাটে হাত পা ধুইতে অগ্রসর হইল, তখন ঘাটে সেই সিংহ-বাবুদের একটিমাত্র কিশোরী কনা স্নান করিতেছিলেন—"

রঘু। সেই কাল, সেই কন্যাই কাল—

গজা। এদিকে রঘু রৌদ্রতাপে তপ্ত হইয়া জলে নামিতেছে, যত নামে

তত অঙ্গ শীতল বোধ হয়, আরো জলে নামে—ওদিকে কন্যা ভীতা হইয়া জলের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে গভীর জলে পতিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। নিকটে ক্ষেত্রে কতকগুলি কৃষী ঐ ক্রন্দন শুনিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল, মনে করিল কন্যা ঘোর বিপদে পতিত—মনে করিল রঘুবীর জলতৃষ্ণাচ্ছলে দস্যুকার্য্যে প্রবৃত্ত, কারণ কন্যা সালঙ্কারা ছিলেন।

রঘু। দস্যু! চুরি! আমার চৌদ্দ পুরুষ কখন কাহার পাত কেটে ভাত খায় না, তাতে মা জননীর অঙ্গ!

গজা। থাম্—পরে সিংহবাবু স্বয়ং লাঠিয়ালসহ ঘাটে উপস্থিত হইয়া রঘুকে বন্দী করিলেন—তার পর যা হইল উহার সর্বাঙ্গে বর্তমান। ওর ঘোর বিপদ মহাশয়!

রঘু। বিপদের উপর বিপদ বলুন—বাপ। সর্বাঙ্গে ব্যথা!

দারগা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কেবল মাত্র কহিলেন, "ও খফিফ মারপিট—"

রঘু। এ ছোল—দাগ নহে—ছোল মারকে আমরা মারপিট বলি—ইহাতে রক্তপাত হয়েছিল, জিব বেরিয়ে পড়েছিল, অজ্ঞান হয়েছিলাম।

দার। হাঁ, বেহুঁস হইলে আলবৎ মোকদ্দমা সঙ্গীন হইত, অপরাধীকে এইক্ষণেই ধৃত করিতাম।

গজানন কহিলেন, "তবে নিগূঢ় কথা সব বলি, ওরে যাও সকলে বাহিরে যাও"—হুকুম হইবামাত্র সকলে গোলাবাটীর বহির্দেশে আসিল, কেবল আমি নিকটস্থ একটি পাল্কির ভিতর বসিয়া বিনা সন্দেহে সকল কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতে থাকিলাম—

গজানন হস্ত উত্তোলন করিয়া পঞ্চ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ক্ষীণস্বরে দারগা সাহেবকে কহিলেন, "বড়—কম নহে—টাকা!—এক চাপড় টাকা! সিংহ-বাবুদের চরিত্র আপনি কি জ্ঞাত নহেন? দাঙ্গা করিয়া, লাঠি চালাইয়া, সড়কি মারিয়া সেই বাদশাহী জায়গীর গ্রাম সমস্ত বাজেয়াপ্তির সময় আমাদের কি না কষ্ট দিয়েছে? ভুলে গেলেন—হে মহাশয় অল্পদিনে সব ভুলিলেন! একটা পাক লাগান—দুট মোচড় দিন—অমনি অমনি যাবে, ওরা যে এ সরকারের চিরশত্রু—চালান না করিলে আমরা মহাশয়কে ছাড়িব না। কই? আপনি কেমন আমাদের কথা হেলা করে যাবেন যান্ ত?"

রঘু এই সকল কথা শুনিয়া কহিয়া উঠিল, "যেমন সওয়াল করিতে হয় তা দেওয়ানজী করলেন।" ও নিম্নস্বরে গান করিয়া কহিল—

"রাঙ্গা বরণ, দুখানি চরণ,
হৃদে লব জোর করিয়া!"

গজানন অমনি কহিয়া উঠিলেন, "রঘু মারের আঘাতে প্রায় পাগল হইয়াছে। বলি বেহুঁস? তা সব হবে—ও বেহুঁসই ত ছিল কেবল অপার্য্যমানে কি

করে কথা না কহিলে চলে না, এজনাই রঘু—আমি অনেক বলায়—বসিয়াছে নচেৎ ও ত শুইয়াই ছিল—ঐ দেখুন।" (উচ্চস্বরে) "আবার শুইল"—

বলিতে বলিতে রঘু ভূমিশয্যাগত, অচেতন, চোকের গোলা উল্টাইয়া পড়িল। গজানন দারগা উভয়ে তাহার নিকট আগত—স্নিগ্ধ জল আসিল, হিমসাগর তৈল আসিল, রঘুবীর অজ্ঞান, দাঁতে খিল লাগিয়াছে—বেতাব হইয়াছে। আবার মুহূর্তে লোক জমা হইল, অনেক কষ্টে রঘু ঈষৎ চাহিল, চক্ষু মেলিল, কিন্তু বাক্য ? রোধ হইয়াছে· সর্বাঙ্গে গুরুতর ব্যথায় কাতর—আর মোকদ্দমাও গুরুতর হইবার বাকি নাই, সিংহদের ভিটায় ঘুঘু চরাইবার বাকি নাই! দারগা সাহেব খাটিয়া আনিতে হুকুম দিলেন, রঘুবীর সত্য সত্য খাটিয়াশায়ী হইল, সকলে কহিল এবার লাস চালান যাইবে, একে লোকের ভিড়ে পাল্কি অন্ধকার, তাহাতে লাসের নাম, তাহাতে হঠাৎ দেখিলাম একটি কাল কুক্কুরের আঁখিদ্বয় শিবিকার ছাউনিতলে জ্বলিতেছে, সসব্যস্তে শিবিকার দ্বার খুলিয়া বাহির হইলাম। দারগা সাহেব কহিলেন, "এ কোথায় ছিল ?" মনে করিলেন, জটাধারী আবার সব কথা শুনিয়াছে।

মুহূর্তে বাহকগণ উপস্থিত হইল, রঘুবীর খাটসহ তাহাদের স্কন্ধে বাহিত হইল—কেহ কেহ "হরিবোল" দিয়া উঠিল, রঘুবীর একবার বেতাব অবস্থা ভুলিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, "সমুন্দির পো! আমি কি যথার্থই মরিয়াছি ?" গজানন কহিলেন, "বেদনা মস্তকে চড়িয়াছে প্রলাপ দেখিতেছে।" এ দেওয়ানজীর কৃত প্রলাপ!

দারগা সাহেব মনে করিলেন, তাঁহার এক কর্মে দুই কর্ম সিদ্ধ হইল। লোকে জানিল রঘুবীর মারপিটের মোকদ্দমায় বাদী হইয়া চলিতেছে; দারগা তাহার সহিত একটি আত্মহত্যার সাহায্যের অপরাধী বলিয়া চালান গোপনে লিখিয়া দিলেন, আপনার শাফায় ও নিজ বৈবাহিক নাজির সাহেবের পুজার পন্থা করিয়া দিলেন। গজাননের এক বুদ্ধি ত দারগার শত বুদ্ধি: কিন্তু দারগার মনের কথা তাঁহার মনই জানিল। এদিকে আবার সিংহবাবুদের কন্যাটিকে হাজির করিবার জন্য একটি হুকুমনামা লিখা হইল।

অ ষ্ট ম প রি চ্ছে দ

তোমরা কেউ সাহেব দেখেছ ?

এক দিন দুই প্রহর দুইটার সময়, লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয় আহারান্তে পাঠশালার দেওয়ালে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছেন, ঊর্ধকর্ণনিবারিণী মলমলের এক পাট্টা মিহি পাগড়ি কপালের উপর একটি গিরে দিয়া বান্ধিয়াছেন; গিরার ফুঁপি ও মাথার ঋজু পলিত কেশ একত্র হইয়া ঢাকের চূড়ার শোভা ধারণ করিয়াছে, মাথাটি বক্র হইয়া বক্ষঃস্থলের দিকে—বাঁশঝাড়ের পুচ্ছময় অগ্রভাগের

ন্যায় নত হইয়া আসিতেছে; দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে বেতগাছটি তবু ধরা রহিয়াছে। তখন আহারান্তে সকল বালক লিখিতে উপস্থিত হয় নাই, গঙ্গাধর সমুপযুক্ত কয়েকটি সঙ্গী লইয়া মুখে "মহামহিম" উচ্চারণ করিয়া খতের মুসবিদা হাঁকিতেছেন; হাতে পাঠশালের দেওয়ালে একটি হরিণের আকৃতি আঁকিতেছেন। নিদ্রার প্রারম্ভে গুরুমহাশয়ও মধ্যে মধ্যে আমাদের স্বরে সুস্বর মিশাইয়া "হা হয়ে দাঁড়িহস্যিকার" কহিতে কহিতে নাক ডাকাইয়া ফেলিলেন। এমন সময় বেণেদের গোপাল আসিয়া আমার কাণে কাণে কহিল, "ওরে সাহেব দেখেছিস্?" সাহেব দেখিতে ব্যগ্র হইলাম, কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানিতাম দত্তজ মহাশয় কখন কখন কপটনিদ্রা যান ও আমরা কি করি ঈষৎ চাহিয়া দেখেন। সময়ে সময়ে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় আলস্য-প্রিয় বালকের পিঠে বেত্রাঘাতও বর্ষণ করেন, অতএব গুরুমহাশয় প্রকৃতরূপে নিদ্রিত কি না তাহা পাঠশালার বাহির হইবার পূর্বে নিশ্চয় জানা আবশ্যক। ভঙ্গী করিয়া মহাশয়ের নিকট যাইয়া বসিলাম, নিম্নস্বরে "মশয় মশয়" বলিয়া ডাকিলাম ও অবশেষে বেতের অগ্রভাগ ধরিয়া ধীরে একবার টানিলাম, মহাশয় তাহাতেও চমকাইলেন না, জানিলাম তিনি যথার্থই নিদ্রিত। সঙ্গী-গণকে ইঙ্গিত করিয়া এক লম্ফে পাঠশালার বহির্দেশে উপস্থিত হইলাম; পরক্ষণেই দেখিলাম দত্তজ মহাশয় কহিতেছেন "কে ছেলেটা আমার বেত ধরিয়া টানিল রে? নষ্ট জটা—আমার সঙ্গেও ব্যঙ্গ?" এই কথা কহিতে কহিতে বেতহস্তে আমাদের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন, অগ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায়—এই সময়ে পাঠশালায় প্রত্যাগমন করা অবিধেয় মনে করিয়া—অগ্রভাগে আরও দ্বিগুণ ধাবমান হইলাম, কিয়দ্দূর আসিয়া মহাশয়ও শুনিলেন "সাহেব আসিয়াছে।" তখন আমরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসি নাই এই অভিমানেই পূর্বক্রোধ ভুলিয়া তিনিও সাহেব দেখিতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া লম্বা পদদ্বয় চালাইয়া দিলেন। সাহেব দেখিতে গ্রামসমস্ত এত ব্যস্ত কেন? ইহার কারণ আছে; তখন পল্লীগ্রামে সাহেবের প্রায় আগমন ছিল না। এখন যেমন রায় সাহেব, পল সাহেব, কর সাহেব, দে সাহেব, দত্ত সাহেব, চটরজি, বানরজি, পালিত সাহেবদের কৃষ্ণাঙ্গে কাল কোট পেন্টলুনের বাহার দেখা যায় সে সময়ে এ শোভা কোথাও দেখা যাইত না, কেবল শ্যামাঙ্গ সাহেবের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত বিলাতগামী এক রামহরি মালী সাহেবকে সাহেবী পরিচ্ছদে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত ও কোন মহারাজার বিখ্যাত উদ্যানে অধীনস্থ মালীসকলকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া "টুমি নিটান্ট ঠক্ আডমি" বলিয়া ভৎর্সনা করিতে শুনিতাম। এখন রামহরি সাহেবের নাম ডুবিয়া গিয়াছে, পুঞ্জ পুঞ্জ রামহরি সাহেব দেখা দিয়াছেন। সাহেব দেখিতে কৌতুকেরও হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু যে সময় হইতে আমার এই বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইতেছে তখন প্রশস্ত দেশবিভাগের মধ্যে দুই তিনটি শ্বেতকলেবর সাহেব দেখা যাইত। আমরা শুনিলাম ইহাদেরই মধ্যে একটি সাহেবের আশুতোষ-

বাবুর বৈঠকখানায় আবির্ভাব হইয়াছে। বৈঠকখানার বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বড় ভিড়, দুই পার্শ্বে দেওয়ালে দুটি বৃহৎ আরশি আলম্বিত থাকায় একজন লোকের দশ দশ মূর্তি দেখিতে পাইলাম, একা গুরুমহাশয়ের দশ অবতার দেখিয়া ভীত হইলাম; যাঁহার এক সংহার মূর্তিতেই রক্ষা নাই তাঁর দশমূর্তি! কিন্তু এই মূর্তি দেখিয়া বোধ হয় দত্তজ মহাশয়ের বিশেষ স্ফূর্তি বৃদ্ধি হইল, আপনার বালকের দলবৃদ্ধিতে রাজত্ববৃদ্ধি দেখিলেন ও রুদ্ধ মূর্তি শীতল করিয়া এখন আমায় সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়াইলেন: তখন আমাদের সাহেবদর্শন হইল, তাঁহার আয়ত লোচনে নীলপদ্মের আভা, প্রশস্ত ললাট ও প্রকাণ্ড মস্তক দেখিয়া বোধ হইল ইনি রাজপুরুষ মধ্যে যথার্থই অগ্রগণ্য। ইতিমধ্যে সাহেব একবার চুরুটের পাইপে টান দিলেন, অগ্নির আভায় তাহার আঁখি, মুখ, রাঙগা শ্মশ্রুদল ও প্রকাণ্ড বক্ষঃ-বস্ত্র প্রভাশালী হইল, বোধ হইল যেন একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ঝাঁপ দিতে উদ্যত। তাঁহার পার্শ্বে আর একটি আসনে আশুতোষবাবু মহাশয় উপবিষ্ট, এক জন শ্বেতকলেবর, এক জন গৌরাঙ্গ, কিন্তু গঠন প্রত্যঙ্গ দেখিলে বোধ হয় উভয়ে একশ্রেণীস্থ লোক—উভয়েই প্রশস্ত-অঙ্গশালী, গম্ভীরমূর্তি, ভক্তির আস্পদ। উভয়ে নানা বিষয়ের কথা হইল: পত্তনী লইবেন, নীলকুটি খুলিবেন, রেশমের ও লা'য়ের কারবার আরম্ভ হইবে। আশুতোষবাবুর নিকট কেবল বিংশতি সহস্র মুদ্রা ঋণের প্রার্থনা রাখেন, তাহা দিতেও আশুতোষবাবু সম্মত হইলেন, বিষয়-কার্য্য প্রায় শেষ হইল। আমি জানিলাম ইনিই বাবু মহাশয়ের পরম বন্ধু ডাক্তার ইটুয়াল সাহেব, কথা কহিতে কহিতে যখনই সাহেবের চক্ষু আমাদের দিকে পড়িতেছে অমনি গুরুমহাশয় দুই এক পদ পশ্চাতে গমন করিয়া আমার পৃষ্ঠভাগে চিমটি কাটিয়া কহিতেছেন, "চুপ কর, পালিয়ে আয়।" কিন্তু আমি সাহেবের একটি অভ্যাস দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম, রুমাল লইয়া তিনি দন্তপাটি হইতে এক একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য বাহির করিতেছেন পুনরায় বদনে নিক্ষেপ করিতেছেন। গুরুমহাশয় আমার কাণে কাণে কহিলেন, "এ কি ? মাংসখণ্ড ?" আমি কহিলাম, "চুপ করুন, সাহেবের ছোট হাজিরি হই-তেছে।" দত্তজ কহিলেন, "ম্লেচ্ছ! যাঁহারা সাহেব সাজেন তাঁহারাও এইরূপ ছোট হাজিরি করেন।" পরক্ষণেই গুরুমহাশয় ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রমে কার্য্য শেষ করিয়া ২০ হাজার টাকার একটি হুণ্ডি পকেটে ভরিয়া অগণিত ধন্যবাদ দিতে দিতে সাহেব বাহাদুর দাঁড়াইলেন ও হস্ত প্রসারিয়া বাবু মহাশয়ের করাবলম্বন করিয়া কহিলেন, "নগরে গমন হইলে আবার সাক্ষাৎ হইবেক।" সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণ করিলেন, চারিদিকে সেলামের ধুম পড়িয়া গেল।

আবার আমার দিকে আশুতোষবাবু চাহিয়া কহিলেন, "কি হে জটাধারী, সাহেবের ইংরেজি কথা বুঝিতে পারিলে ?" আমি কহিলাম, "মহাশয় অনুগ্রহ

করিয়া বুঝাইলে পারি।" দয়ার শরীর আর্দ্র হইল, বাবু মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, "বল—রিং দি বেল" "বাজাও ঘণ্টা" আবার কহিলেন, "সট্ দি বক্স" আমি কহিলাম, "সট্ দি বক্সো—" "হ'ল না, বক্সো নয়—বক্স।" দুটি পাঠেই আমার সত্বর অভ্যাস হইল, তখন বৃদ্ধ ভৈরব ভৃত্যকে ডাকিয়া একটি বৃহৎ আলমারি খুলিতে অনুমতি দিলেন। ভৈরব আলমারির নিকট গেল, কহিল "আলমারি খুলিল না, কপাট ঝাড়ের ঝালরে ঠেকিতেছে।" আমাদের সকল বন্দোবস্তই এইরূপ সন্তোষজনক! কোনমতে কপাট কতক দূর খুলিয়া একটি দপ্তর বাহির করিলেন, তাহাতে বাঙ্গালা, ফারসী ও ইংরেজি কতকগুলি পুরাতন পুস্তক দেখিলাম, এক একটি ফারসী পুস্তক এক এক হাত পরিমাণ, মনে করিলাম এসব কবে পড়িব। বাবু মহাশয় একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া আমায় দিলেন ও কহিলেন, "এটি মার্চ্চস্ ইস্পেলিং। ভায়া! যে সময় আসিতেছে ইংরেজি বিদ্যা উপার্জ্জন না করিলে আর বড় লোক হইবার উপায় থাকিবে না।" আশুতোষবাবু বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার এই কথাগুলি এখন ভবিষ্যৎ বচনস্বরূপ জ্ঞান হয়: মনে হয় এক জন প্রকৃত হিতৈষী দূরদর্শী পুরুষ উপযুক্ত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যয়ে যত্নে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন হয় ও ইংরেজি শিক্ষার আমার হাতেখড়ি পড়ে।

নবম পরিচ্ছেদ
ইংরেজি পাঠের উন্নতি

জটাধারীর প্রভুত্বে কেহ গর গর করিতেন না—আমার ইচ্ছানুবর্তী হইয়া অনেক বালকই ইংরেজি পাঠে যত্নবান্ হইল। আশুতোষবাবুর আদেশানুসারে ভীমচাঁদনামা একটি সুশিক্ষিত "গুডব্রেড" স্কুল-মাস্টার কলিকাতা হইতে ইণ্ডেণ্ট হইয়া আসিলেন। তাঁহার বেতন মাসিক ১২ টাকা ধার্য্য হইল, কিন্তু তাঁহার মেজাজ ওজনে ১২ হাজার টাকা অপেক্ষা গুরু বোধ হইত। ভীমচাঁদ দেখিতে মন্দ ছিলেন না; শ্যাম মুখের উপর কেশবিন্যাসের বিশেষ পারিপাট্য প্রদর্শন করাইতেন, রুমালে সুগন্ধ লেভেণ্ডর ছড়াইতেন, ইংরেজি জুতায় চরণের শোভা সম্বর্ধন করিতেন, ইংরেজি রকম বাহ্যিক পরিচ্ছদের ইনিই আমাদের দেশের পথপ্রদর্শক বা পাইওনিয়র হইলেন। কিন্তু তাঁহার বামপদ অপর পদাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব থাকায় তাঁহার খঞ্জ ভীম নাম খ্যাত হইল। খঞ্জ ভীম, তর্কালঙ্কার মহাশয়, লাউসেন দত্ত ও আখঞ্জির ছাত্রমণ্ডলে এক প্রধান শরিক হইয়া উঠিলেন। মাস্টরবাবুর চালচলন দৃষ্টে আমাদেরও মসমসে বিনামা ও কেশবিভাগের অর্থাৎ টেরি কাটিবার অভ্যাস হইল, কিন্তু এক কারণে তাঁহার উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি ও ইংরেজি পড়িতে আস্থা

বৃদ্ধি হইল। তিনি লাউসেন দত্তের ন্যায় প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেত দেখাইতেন না, আখঞ্জির মত কেবল রাঙগা চক্ষু ও মেহেদি-রঞ্জিত শ্মশ্রু-দল হেলাইয়া ভয় প্রদর্শন করিতেন না, "বড়ি কাফ" বা "আসরাফ" উচ্চারণ-উদ্যমে ফুৎকারে আমাদের গাত্র সিঞ্চিত করিতেন না, সময়ে সময়ে মিষ্ট কথা ও নগরের নানাবিধ গল্পে মন হরণ করিতেন। দিবা রজনীমধ্যে ৫/৬ ঘণ্টায় পাঠাভ্যাস করাইয়া বিদায় দিতেন। যে বিদ্যা শিখিতে প্রাতে খেলিতে সময় হয়, সন্ধ্যার পর ঠাকরুণদিদির নিকট উপকথা শুনিতে সাবকাশ হয় তাহা কেন প্রীতিকর না হইবে? বিশেষ চাণক্যের শ্লোক অভ্যাস, শুভঙ্করের অংকপাত, পিতামহের নাম, গাঁই, গোত্রাদি শিক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কেহ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে "আমরা ইংরেজি পড়ি" কহিলেই প্রকারান্তরে তাহাকে বিলক্ষণ অপ্রতিভ করা হইত। ক্রমে বাপ পিতামহের নাম না জানা একটি গৌরবের কারণ হইয়া উঠিল! বাপ পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করাও একটি অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া নির্দেশিত হইল। অধিকন্তু আর আমাদের মাটীতে বসিতে হইত না, স্কুল-ঘর মেজ চৌকিতে সজ্জিত হইল, বেঞ্চে বসিয়া বাঞ্ছা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকাল সকাল "স্কুলের ভাত" প্রস্তুত হইতে লাগিল, প্রতিদিন পরিষ্কার বস্ত্রে ও জুতার বাহারে বাহ্যিক পরিচ্ছন্ন সাধন হইতে লাগিল। দিনে দিনে বালকগণের বোল, মেজাজ, বাঙ্গালার বায়ু পর্যন্ত পরিবর্তন হইতে লাগিল। সকলের মুখেই ইংরেজি কথা! বেণেদের রাজকুমারী "কিংস্ ডটার—" রাঙগা ঠাকরুণ "রেড গডেস্" খুড়া "অংকল" তরকারী "কারি" হইয়া গেল। স্কুলের মালি গোপীনাথ সর্দার জল ছাড়িয়া "ওয়াটর" কহিতে লাগিল ও দুই এক ছিলিম গাঞ্জিকায় মত্ত হইয়া শুভ্রবর্ণ গোঁফযুগল হেলাইয়া "ইয়াস" "নো" করিতে আরম্ভ করিল, সেই "ইয়াস" "নো" ক্রমে বিপুল ভারতব্যাপী হইয়া উঠিল, ঘরে ঘরে মুখে মুখে বেড়াইয়া সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যালঙ্কার ন্যায়রত্ন প্রভৃতির ওষ্ঠে পর্যন্ত আরোহণ করিল, এমন কি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এক্ষণে বৃদ্ধাঙ্গুলিবিনিময়ে "থম্ব" শব্দ প্রয়োগ করেন, বাঁশের বদলে "বেম্বু" চাহেন। কিন্তু শুদ্ধাচারী বৃদ্ধ তর্কালঙ্কার মহাশয় ম্লেচ্ছবর্ণ ব্যবহার দূরে থাকুক অপরের মুখে শুনিলেও বিমর্ষ হইতেন, ও কহিতেন, "শাস্ত্রধর্ম দূরে গত ম্লেচ্ছকৃত বিপ্লব-কাল আগত।" এদিকে আখঞ্জি সাহেবও মাস্টরবাবুর প্রাদুর্ভাবে বিরক্ত। মনে করিতেন, "বাদশাহী তক্তের সহিত বাদশাহী যবানও লোপ হইল।" এক্ষণে মাস্টরের প্রতি উভয়ের বিরক্তি হেতু পরস্পরের মধ্যে আনুরক্তির কারণ জন্মিল—মহিষের বাঁকা শিং যুদ্ধকালে একা হইয়া উঠিল। সনাতন ধর্মবাদী তর্কালঙ্কার মহাশয় ও চিরদ্বেষী মোসলেম-অনুচর আখঞ্জি বাহাদুর স্বার্থাশয়ে ঐক্য হইলেন ও ইংরেজি পড়া ও ইংরেজি পাঠ গ্রাম হইতে উত্যক্ত করিবার জন্য একটি গভীর প্রস্তাবনা সৃজন করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর বিন্ধ-সায়েরের উত্তরতীরে শিবমন্দির সম্মুখে চাঁদনির সোপানে বসিয়া গঙ্গাধর কয়েকটি সমবয়স্ক বালকসহ আপন আপন পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। বঙ্গ-ইতিবৃত্ত হইতে কালাপাহাড় কর্তৃক হিন্দুদেবগণের উপর অত্যাচারসকল একটি বালক গল্পচ্ছলে কহিতে-ছিল, এই সময় সম্মুখস্থ গঙ্গাধর মহাদেবের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি কহিলাম, "দেবদেবীদের যেরূপ নিস্তেজ ব্যবহার পুরাবৃত্তে পড়া যায় তাহাতে বিশ্বাস হওয়া দুষ্কর, সে সকল কথা যদি সত্য হয় তবে এইরূপ অচল দেবতার উপর ভক্তি সচল হইয়া পড়ে।" কথা কহিবার সময় আমার মনে ছিল না যে ঐ গঙ্গাধর দেবের প্রসাদেই আমার নাম গঙ্গাধর প্রসাদ হইয়াছিল। আমার কথা শেষ না হইতেই মন্দিরের পার্শ্বে "কি সর্বনাশ!" এক গর্জন শুনিলাম, পরক্ষণেই দেখিলাম, তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ গর্জন প্রয়োগ করিয়া দ্রুতগতি আশুতোষবাবুর বৈঠকখানার দিকে ধাবমান হইতেছেন। গঙ্গাধরও দৌড়িতে অপটু ছিলেন না—সত্বর বৈঠকখানায় পেঁাহুছিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় আমা-দের নামে একটি অনর্থক অপবাদ দিতে আসিতেছেন, অদৃশ্য থাকিয়া এই কথাটি আকাশবাণীর ন্যায় বাবুমহাশয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া প্রস্থান করিলাম। ক্ষণকাল পরেই তর্কালঙ্কার মহাশয় পেঁাহুছিলেন ও কহিলেন, "মুণ্ডপাত উচ্ছন্ন! সকলে এককালে পাষণ্ড হইল—মহাশয় স্কুল স্থাপন করিলেন, না নাস্তিকতার নিশান তুলিলেন?" তর্কালঙ্কার মহাশয় স্কুলের ছাত্রদের নাস্তিকতার সালঙ্কার পরিচয় দিলেন। আখঞ্জি সাহেব কোথা হইতে আসিয়া সেই কথার অনুমোদন করিলেন। ইংরেজি পাঠের পক্ষে একটি মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল, গ্রামসমস্ত ঐ কথায় আন্দোলিত হইল। জটাধারী নাস্তিকতায় তিলকধারী হইলেন—ক্ষীণপ্রাণী স্কুলটি যায় যায় হইল; খঞ্জ ভীমের পা গর্তে পড়িবার সম্ভাবনা হইল—আশার মধ্যে দিব্য নক্ষত্রস্বরূপ আশুতোষবাবুর দূরদর্শিতা জাজ্জ্বল্যমান রহিল।

এই সময়ে আর একটি সুঘটনা উপস্থিত। নিকটস্থ আলমনগরে একটি নূতন মহকুমার সৃষ্টি হইল। এক দিন প্রাতে দুই জন অশ্বারোহী অর্থাৎ জেলার কালেকটর সাহেব নূতন মহকুমার কর্মচারী নূতন হাকিম মৌলবি খাঁ বাহাদুর সহিত আমাদের গ্রামে হঠাৎ পেঁাহুছিলেন। গ্রামে একটি স্কুল হইয়াছে শুনিয়া ছাত্রদের দেখিতে চাহিলেন, নিমেষ মধ্যে আমাদের রাখালবেশ ছাড়িয়া বাবু সাজিয়া সভীত মনে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইল—পরীক্ষার সেই প্রথম ঢেউ দেখি-লাম। সেই ঢেউয়ে ভাসিতে ভাসিতে হাবুডুবু করিতে করিতে সংসারসাগরে উপনীত হইয়াছি—পরীক্ষার শেষ তবু দেখিতেছি না! যাহা হউক সেই যাত্রা ইসফের একটি ফেবল পাঠ করিয়া সাহেবের নিকট উত্তমরূপে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। কালেকটর সাহেব স্বহস্তে একখানি হোলি বাইবল

পুরস্কার দিলেন। তাহাতে জটাধারীর নামে নিকটস্থ গ্রামসকলে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। আরও সুখের বিষয় হইল, সাহেব মহোদয় আপন সন্তুষ্টির নিদর্শনস্বরূপ লর্ড হারডিঞ্জের দত্ত পনর মুদ্রার হিসাবে মাসিক সাহায্য আমাদের স্কুলে দান করিতে স্বীকার করিলেন—তাহাতে স্কুলের জড় নামিল, খঞ্জ ভীমের পদে বল বৃদ্ধি হইল—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অভিসন্ধি বিফল হইল!

কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় নিষ্ফল হইয়াও নিরুৎসাহ হইলেন না—যাহাতে সাহেবী চাল চলিত না হয়, সাহেবী সাজে কেহ না সাজে, ইংরেজদের পাপানুকরণ ইংরেজি পাঠপদ্ধতি প্লাবন দ্বারা হিন্দুসমাজের রীতিনীতি গ্রাসিত না হয় তাহাই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনিবার চেষ্টা রহিল; যেখানে দশজন যুবাকে একত্রিত দেখিতেন অধ্যাপক মহাশয় অমনি একটি সমাজ-সম্বন্ধে অভ্যাসগত বক্তৃতা করিয়া সকলের হৃদয় আর্দ্র করিতেন—এই বক্তৃতার একটি পরিশিষ্ট আমার রোজনামচার অন্তর্গত ছিল।

"ও হে! তোমরা বালক, আমার কথায় বিরক্ত হ'তে পার কিন্তু আমার অভিপ্রায় তোমরা যেরূপ মনে কর তদ্রূপ নিন্দনীয় নহে—ইহার নিগূঢ় মর্ম-ভেদ শিশুর পক্ষে দুঃসাধ্য। নিজ নিজ হৃদয়গত ধর্ম ও চির আদরণীয় দেশীয় প্রথা রক্ষার অনেক গুণ আছে। আমাদের সমাজে কি সুখ ছিল না? আমোদ ছিল না? সে সুখ সে আমোদ যদি কোন অংশে বিশুদ্ধ না হয় তাহার দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগের উন্নতি করিবার চেষ্টা কর—জাতীয় উন্নতিফল লাভ হইবে। যদি তা না করিয়া পরজাতির যাহা দেখিবে তাহাই অনুকরণ কর, তাহাতে তোমাদের কি উপকার হইবে, একবার দূরে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখ। আপনাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম, সমাজমন্দির যদি কেবল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিদেশীয় ছাঁচে বা আদর্শে প্রস্তুত করিতে চাহ বঙ্গ-সমাজের যাহা ভাল আছে তাহা বিলয় হইবেক—উভয় জাতিতে প্রভেদ না থাকিলেও না থাকিতে পারে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে অপর জাতির দলে মিশিয়া বঙ্গদেশ হইতে বাঙ্গালির নাম লোপ হইয়া একটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীবমাত্র সৃজন হইবে।

আত্মধর্ম পরিত্যজ্য পরধর্মেষু যোরতঃ।
স তিরস্কারমাপ্নোতি নীলবর্ণশৃগালবৎ॥

"এইখানে আমার একটি গল্প মনে পড়িল—একবার নবদ্বীপ হইতে বাটী আগমনকালীন গঙ্গাতীরস্থ কোন গণ্ডপল্লীর ঘাটে স্নানান্তে পূজা আরম্ভ করিয়াছি ও শিব গড়িতেছি—গড়িতে গড়িতে শিবটি মনের মত না হওয়ায় দুই একবার ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। দুই একটি গ্রাম্যলোক ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ বয়সে বিহ্বল হইয়াছে—আবার একজন কহিল, একেই বাহাত্তরে বলে—আমি উত্তর করিলাম, একেই মাটীর গুণ বলে, তোমার গ্রামের মাটীর একটি বিস্ময়কর শক্তি দেখিতেছি, যত শিব গড়িতেছি বানর হইয়া উঠিতেছে

—সাবধান বঙ্গদেশের মাটীর প্রতি দৃষ্টি রেখ, এই মাটীতে বিলাতি সাহেব গঠন হইবার নহে—দেখ যেন শিব গড়িতে বানর না গড়িয়া ফেল!"

দশম পরিচ্ছেদ

রাঙ্গা ঠাকরুণ

অতি অল্পদিন হইল, আমি কোন বুদ্ধিমতী মহিলার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলাম। বোধ হইল, জটাধারীর রোজনামচার কিয়দংশ সুমতি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন—ইহাও জটাধারীর সৌভাগ্য! কারণ স্ত্রীলোকে ত নিন্দাবাদ জানেন না। যাহা হউক, সন্তুষ্টি প্রকাশের বিশেষ কারণ মহিলা এই বলিয়া নির্দেশ করেন যে, "এখন পর্যন্ত জটাধারী আমাদের অংগস্পর্শ করেন নাই—যাঁহারা চিত্তপট লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা প্রথমতঃ স্ত্রীজাতির চিত্ত-ভ্রম অংকিত করিয়া আমাদের মুখে কলংক লেপন করেন; আবার দেখি সংসারপটে দুই একটি কোমলাংগীর প্রতিমূর্তি অংকিত না হইলেও ছবিটি শোভাহীন ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে।" মহিলার এ কথাগুলি শুনিয়া অবধি আমি ভাবিতেছিলাম, "স্ত্রীনিন্দা কি গুরুনিন্দা অপেক্ষা অধোগতির মূল, যে সেই সম্বন্ধে কোন কথা সত্য হইলেও আলোচনা করিতে কাতর হইব?" আমি ত বিনাকারণে কাহারও সুন্দর অংগের ক্ষুদ্র তিলটি পর্যন্ত দেখাইতে ইচ্ছুক নহি; যদি দেখাইয়া দিই, তখন মনে করি, যে ছুরি লইয়া চাঁচিয়া ফেল না ফেল, ঔষধ দিয়া আরাম করিতে পার, কর—গৌরাংগীর গা আরও গোরা দেখাইবে। সুন্দরীদের আরো সতত মনে করা উচিত যে, জটাধারী তাঁহাদের নিতান্ত বন্ধু, যখন কটু কথাও কহিয়া থাকি, তখন কেবল তাঁহাদের কোমল মন ও কোমল অঙ্গ নির্মল দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু বিনা দলনে মলা উঠিবার নহে, এ কথাও মনে করা উচিত।

এ দিকে যেমন তিলটি পর্যন্ত দেখি, অপর দিকে আবার সুন্দরীগণের স্নেহ, দয়া, প্রীতি-সুধা-সার-সুনির্মিত হৃদয়ের গুণসকলের বলিহারী দিয়া থাকি! বাল্যকাল হইতে এই স্নেহের অনেক পরিচয় পাইয়াছি—এই স্নেহ কলুষিত বিপদজলের নির্মলী বলিয়া থাকি; দরিদ্র, ভিক্ষুক, পীড়া-প্রপীড়িত শয্যাগত ব্যক্তির অন্তঃকরণে সেই স্নেহ, শুষ্ক মরুভূমে অমৃত-বিন্দুর ন্যায় পতিত হইয়া থাকে, সুন্দরীর মনে সুন্দর গুণ থাকিলে আরও সুন্দর দেখি; সেই জন্যই অতি অল্প বয়স হইতে আমি সুন্দরী সুধার্মিকা-গণের বিশেষ প্রশংসাবাদক হইয়াছি—যখন বালক ছিলাম, গ্রামের সমবয়স্ক সমস্ত বালিকার আমি "জটাদাদা" ছিলাম। কামিনীর 'পিঠে' নগা একটি কিল মারিয়া মুড়ির পালিটি লইয়া পলাইল, প্রফুল্লের চুলের দড়িটি গোপলা লইয়া কাঠের ঘোড়ার লাগাম করিল—মোহিনীর ক্ষুদ্র ধুতিখানি দেবা পরিয়া

বাজনা শুনিতে দৌড়িল, এইরূপ অনেকগুলি নালিশ আমাকে প্রতিদিন নিষ্পত্তি করিতে হইত, আমি বালিকাগণের বিচারক ও রক্ষক ছিলাম; রাঙ্গা ঠাক্‌রুণ আমাকে সেইজন্য পাড়ার মেজেস্টর বলিয়া আদর করিতেন। এই জন্যই স্ত্রীগণের দোষ গুণ বিচারের জটাধারী অনেক দিন পর্যন্ত অধিকারী ও আপাততঃ রাঙ্গা ঠাকুরাণীর চিত্র লিখনেও লেখনী-ধারী।

রাঙ্গা ঠাক্‌রুণ বহুগুণসম্পন্না হইয়াও দাম্পত্যসুখে চিরবঞ্চিত। তিনি যে কবে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই—জ্ঞানারম্ভ হইতে তাঁহাকে শুভ্র, পবিত্র, বেশহীনা বিধবাই দেখিতাম। যে বৃহৎ পরগণার উপস্বত্বে আশুতোষবাবু এতদ্রূপ সমৃদ্ধিশালী, তাঁহার অনেক অংশ রাঙ্গা ঠাক্‌রুণের স্ত্রীধন। কিন্তু ভাসুরের হস্তে সমস্ত বিষয়ই গচ্ছিত করিয়া তিনি কেবল ধর্মকর্মে ব্যাপৃতা থাকিতেন, দরিদ্রের দুঃখমোচনই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি যখন শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিধানে আলু থালু কাল কেশরাশি কপালের উপর-ভাগে এল বন্ধনে, রাঙ্গা হস্তে দবী ভরিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালক বালিকাকে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন, সকলে কাণাকাণি করিত, যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহস্থ-কার্য্য নির্বাহকারিণী—রাঙ্গা ঠাকুরাণীই প্রধান ভাণ্ডারিণী ছিলেন। তিনি নিজ হস্তে যাহাকে যাহা দিতেন তাহাই তৃপ্তিকর—তাহার দ্বিগুণ অপরের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না, এজন্য জটাধারী ব্যঙ্গ করিয়া কহিতেন, "রাঙ্গাদিদির বড় হাত-যশ" হাঁড়ি হাঁড়ি মণ্ডা হউক, থাল থাল মেওয়া হউক, বড়দীঘীর বড় রুহি হউক, বা উদ্যানের সামান্য সামান্য ফল হউক,—আম হউক বা কুল হউক—রাঙ্গা ঠাক্‌রুণ বাঁটিয়া না দিলে কাহারও মঞ্জুর নাই। আজ অন্নমেরু, কাল তুলা, পরশ্ব সাবিত্রীব্রতদানের আনন্দেই রাঙ্গাদিদির রাঙ্গা তবু নিয়ত ম্লান মুখভঙ্গিটি কখন কখন প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইত। স্বয়ং নিঃসন্তান কিন্তু দেশের ছেলে তাহার সন্তান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না; তখন জুতে মোজার চালও ছিল না, সাধও ছিল না, কিন্তু কাহার ছেলে রাঙ্গা ঠাকুরাণীর প্রদত্ত রাঙ্গা ধুতি চাদরে সজ্জিত না হইত? তাঁহার কল্যাণে গুরুমহাশয়ের সিধার অভাব ছিল না, ছাত্রদের পুস্তক কিনিবার বা পুস্তক ছিঁড়িবার কষ্ট ছিল না; বিশেষতঃ ক্রিয়া-কাণ্ডের ভোজের দিনে কমলমুখীর কোমলাঙ্গ যেন ধর্মবলে দৃঢ় হইত, সূর্য্যোদয় না হইতেই প্রাতঃস্নান করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত অনাহারে দেখ রাঙ্গাদিদি সসব্যস্ত—আমি আবার ব্যঙ্গ করিয়া কহিতাম, "বেশ রাঙ্গা-দিদি, আজ নাটাই হইয়া ঘুরিতেছ"—তাঁহার কেবল হাসিতে অবসর থাকিত, কখন কেবলমাত্র কহিতেন, "ক্ষীরের ছাঁচ কেমন হয়েছে দেখে যাও"—জটাধারী চাকীতে তৎপর। প্রকৃতার্থে রাঙ্গা ঠাক্‌রুণ অতি প্রসিদ্ধ পাচিকা ছিলেন। নিমন্ত্রিত প্রবীণগণ আহারকালে কখন কখন কহিতেন, "এই লক্ষ্মীর হস্তেই যথার্থই অমৃত নিবেশিত হইয়াছে।"

এখন কৃতবিদ্যা ব্রাহ্মিকা, এ-বি-পড়া বিবিসজ্জিতা বালিকা, দোজবরের যুবতী বসুনী, ঘোষাণী, ব্রাহ্মণী, সহধর্মিণী, ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "পাক করা ত পাচিকা বা বাবুর্চির কার্য—তাহার প্রশংসা কি?" আমি এইমাত্র উত্তর দিতে পারি, যে পাকনিপুণতার প্রশংসা তোমাদের উচ্চ শিক্ষার সহিত লুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে পরিচয় দিবার স্থল কোথায়? কিন্তু উৎকৃষ্ট উদাহরণ অভাব বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না, যে সুমিষ্ট পাক-নৈপুণ্য রমণীগণের প্রশংসা বা শিক্ষার ভাগ নহে। আমাদের গ্রামের বিচক্ষণ ভট্টাচার্য সেতার কিম্বা অন্যান্য বাদ্যের রসগ্রহণে অক্ষম হইয়া কহিতেন, "সর্ব বাদ্যময়ী ঘণ্টা!" আমি ঘণ্টা বাজাইতে পারি—ঘণ্টার মত কি আর বাদ্য আছে? সেইরূপ হে কুলকামিনীগণ! গার্হস্থ্য শিক্ষার প্রধান রসবিবর্জিতা হইয়া আর বৃথা গৌরব করিও না—দেশের লজ্জাবৃদ্ধি করিও না, আর কহিও না আমরা কার্পেট বুননের ফাঁসি দিতে শিখিয়াছি, সেই ফাঁসের উপর কি আর শিল্পনিপুণতা আছে? কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া মনে করুন সেই ফাঁসিতে অনেক গরীবের গলায় ফাঁসি পড়িতেছে। আপনারা বহুরূপিণী হইয়া ব্রাহ্মিকা সাজিয়া একদিকে "গাউন" ও "পাউডার-পট" আর একদিকে দোল-যাত্রার নাম না শুনিতে বাসন্তী রঙের ধুতি ও আঙিয়ার জন্য ব্যস্ত কর। সোণার গোড় মল চলন উদ্দেশে বোধ হয় আপনারা একটি সভা শীঘ্র সংস্থাপন করিবেন। রাঙ্গা ঠাকুরুণের সহিত তোমাদের তুলনা করিলে আমার মনে হয় "পিতল-কাটারি, কামে নাহি আইনু, উপরহি ঝকমকি সার।"

একাদশ পরিচ্ছেদ
কাদম্বিনী-মেঘমালা

আজ ভাবিয়া দেখিলাম, কর্তৃপক্ষদের অজ্ঞাতে তিনটি কার্যে নিপুণ হই-য়াছি। অশ্বারোহণ, শিকারনৈপুণ্য ও সন্তরণ-পটুতা! আমাদের দেশীয় সভ্যেরা শিকার-খেলা নৃশংস কার্য বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু আমার পক্ষে শিকারভূমি প্রত্যুৎপন্নমতি ও প্রমোদবর্ধনের কারণ এবং অংগচালনা ও বুদ্ধি-চালনার রঙ্গভূমি হইয়াছিল; তাহার সঙ্গে বনভ্রমণে পশু পক্ষীর ক্রীড়া ও বনশোভা অবলোকন পল্লীমধ্যে অস্থিরকর লোকবিবাদ হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া অনুভব হইত। কখন দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভাবি-তাম, বনের এ শোভা কিরূপে কেমন করে নিষ্পন্ন হইল।

আশুতোষবাবুর অশ্বশালার সহিস সকলেই জটাধারীর অনুগত ছিল। বারুণী, রথে, পূজাপার্বণে খেলানা খরিদের নিমিত্তে যাহা কিছু সংগ্রহ হইত, যে মিঠাই সন্দেশ জটাধারীর হাতে আসিত, তাহার অর্ধেক সহিসদের সহিত ভাগাভাগি ছিল। গ্রামের ঈশান কোণে বিসর্জনের ঘাটের উপর যে বিস্তৃত

ময়দান ছিল, তথায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যাকালে ঘোটকদল "রোলে" যাইত, জটাধারী সেই সময় অশ্বারোহী হইতেন ও একটি ভুটিয়া টাট্টু সতেজে দৌড় করাইতেন।

দারগা সাহেব যে দিবস রঘুবীরকে বেতাব অবস্থায় চালান দিলেন, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি ঐ ভুটিয়া টাট্টুতে আরোহণ করিয়াছি। অশ্ব চলিতে চলিতে থামিল, ঘামিয়া দৌড়িল, দৌড়িতে দৌড়িতে পতঙ্গসম উত্তর-মুখে ছুটিল। ঝড়ুয়া সহিস চীৎকার করিতে লাগিল, "বাবুজী সাবধান, দেখিবেন যেন পড়েন না!" সহিস যাহাতে সংগী না হইতে পারে তাহাই আমার উদ্দেশ্য হইল, ঘোড়া আরও তেজে চালাইলাম, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শান্তিপুরে সিংহদের বাটীর নিকট মাঠে উপস্থিত হইলাম। এখানে দেখিলাম, একটি ঘোর যুদ্ধ বাধিয়াছে—পশ্চাদ্ভাগে কয়েকটি বৃক্ষ রাখিয়া দেওয়ান গজানন একটি জড়সহিত বাঁশ উৎপাটন করিয়া মল্লবেশে দণ্ডায়মান। তাঁহার ঘোটকটি পশ্চাতে সহিসের হস্তে ধৃত। দেওয়ানজী বাঁশটি হাতে করিয়া "রে—ওরে—আয়—কে আছ—আগে আয়" কহিতেছেন। তাঁহার দীর্ঘ, গৌর, স্থূল দেহ যেন ক্রোধে ফাটিতেছে। বিপরীত পক্ষ হইতে থেকে থেকে দুই একটি সড়কি ক্ষেপণ হইতেছে। দেওয়ানজীর অশ্বকে বধ করাই সড়কি-ধারীদের প্রথম উদ্দেশ্য। যেমন উভয় দলে চীৎকার স্বরে কথোপকথন হইতেছে সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গ্রাম্য মৃগ "ব্বাও ব্বাও" রবে গণ্ডগোল আরও গোল মিশাইতেছে। সিংহবাবুর নিজগ্রাম, তাঁহার দল বল প্রবল। এদিকে দেওয়ানজীর সহিত থানার দুই একটি দুর্বল সিংহ বরকন্দাজ মাত্র আছে। তাহাদের মধ্যে একটি পদাতিক বায়ুব্যাধি পীড়িত; সে যত বাক্য প্রয়োগে ব্যস্ত হয় ততই তাহার কথা জড়াইয়া যায়, সর্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে: উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলি যেন চঞ্চল বায়ুতে খর্জ্জুরপত্রের অগ্র-ভাগের ন্যায় কাঁপিতে থাকে। দুর্বল সিংহের সহিত কম্প সিংহ যোগ দিলে লড়াই কবে ফতে হয়? আবার দেওয়ানজী যদিও সাহসী ও বলবান, তথাপি একাকী, অপর দিকে সিংহদের গ্রাম হইতে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় পিল্‌পিল করিয়া লোক বাহির হইতে দেখিয়া ভাবিতেছেন। এমন সময়ে দূর হইতে একটি গগনভেদী স্বর শুনা গেল "ক্যাডর? হাম জাতা হুঁ" তার সংগে সঙ্গে এক হুঙ্কার প্রয়োগ হইল, এক মুহূর্তের জন্য সেই প্রান্তরে শরতের গগন যেন কাঁপিয়া উঠিল, যেন মাঠের জল, খালের জল কম্পিত হইল। সকলে চমকিয়া কহিল, "এ রঘুবীরের হুঙ্কার।"

রঘুবীর ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট হস্তগত করিয়া, মোকদ্দমার দিন পরিবর্তন করাইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, এখন দাঙ্গার গন্ধ পাইয়া সেই দিকে ফিরিয়াছে—যুদ্ধাভিমুখে চলিতেছে; আবার জয়ী হইব, দেওয়ানজীর আরো প্রিয় হইব ভাবিয়া উৎসাহিত হইতেছে। রঘুবীর নিকটস্থ হইয়া আবার একটি হুঙ্কার ছাড়িল। সেই হুঙ্কারে যেন সব যোদ্ধার মত্ততা

বৃদ্ধি হইল। সকলেই উত্তেজিত, সকলের হস্ত হইতে তীর শড়কি অনর্গল ছুটিল। মুহূর্তে গজাননের ঘোটক কর পাতিয়া ভীষ্মদেবের ন্যায় শরশয্যা-শায়ী হইল, চক্ষু হইতে লাঙ্গুল পর্যন্ত তীক্ষ্ম ফলকে বিদ্ধ ও রক্তপ্লাবিত হইল। দুর্বল সিংহ ও কম্প সিংহ কোথায় গেল কেহ দেখিতে পাইল না। কিন্তু গজানন? তাঁহার হাতের বাঁশ ঘুরিতেছে, পাকা খেলোয়াড়ের ন্যায় সড়কির গতিরোধ করিতেছে। এ কম দক্ষতা নয়! সুশিক্ষিত পুস্তকপ্রিয় লেখনী-অস্ত্রধারী সভয় সভ্যগণ যাঁহারা লাঠিয়ালের নামে কাঁপেন ও পথের সাঁকোর তলে হামা দিয়া প্রবেশ করেন বা জঙ্গলের জন্তুমুখে পড়েন। তাঁহা-দের অপেক্ষা দেওয়ানজীর দক্ষতা নিন্দনীয় নহে! দেওয়ানজী ভদ্রসন্তান হইয়াও দুই এক হাত খেলিতে জানিতেন, তজ্জন্যই এত সাহস, কিন্তু সে সাহস এখন অকর্মণ্য, বিপক্ষ দলের লোকসংখ্যা প্রবল, গজাননকে ঘেরিয়া ধৃত করিতে প্রস্তুত। এই ঘেরিল! চারি দিকে দল বল গোল হইয়া শ্রেণী-বদ্ধ হইতেছে—ক্রমে অগ্রসর! কেহ কহিতেছে, "সড়কিতে ভুঁড়ি ভস্‌কে দে" তখন তাহার কয়েদের ও জীবনান্তকাল উপস্থিত। দর্শকদল খালের তীরে জাঙ্গালের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। ইতিমধ্যে একটি ভয়ানক হুঙ্কার শুনিলাম ও তাহার পরক্ষণেই দেখিলাম রঘুবীরের স্কন্ধে দেওয়ানজী আরোহিত, দুই চারি লম্ফে খালের তটে, আর এক "বারো হাতি" লাফে খালের অপরপারগত। সকলে মনে করিল, যেন একটি সিংহ আসিয়া শৃগাল-মুখ হইতে শিকার হরণ করিয়া লইল, পশ্চাতে অনেক লোক ধাবিত হইল; কিন্তু কোথায় ব্যাঘ্র, কোথায় শৃগাল? মুহূর্তে রঘুবীর ভাবসহ প্রশস্ত ময়দান অতিক্রম করিয়া দৃষ্টির অগোচর হইল।

এই সময় সিংহদের ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বৃদ্ধ পুরুষ কহিলেন, "ঐ সর্বনাশীর জন্যই এই সমস্ত বিপদ। ও না স্নানে যায় যদি" —আমিও সেইদিকে দেখিলাম, যেরূপ সীতা রাক্ষসকুলের সর্বনাশিনী, দ্রৌপদী কুরুকুলের সর্বনাশিনী, হেলেনা ট্রয় নগরের নাশের কারণ, সেইরূপ একটি সর্বনাশিনী রাজপুতানী লাবণ্যশীলা কুলকামিনী ছাদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সাধের নামটি কাদম্বিনী, সর্বাঙ্গে নবমেঘ সদৃশ নীলাম্বর আবৃত, কেবল কমলমুখীর সুকুমার মুখখানি ও হীরকখচিত-বালা-সুশোভিত হস্তদ্বয় দৃশ্যমান। এখন সূর্য্যদেব অস্তমিত, "কনে দেখানী" বেলা উপস্থিত, সকল দ্রব্যই এখন সোণার জলে রঞ্জিত দেখাইতেছে। কিন্তু কাদম্বিনী? তাহার লাবণ্যেই যেন প্রাসাদ আলো করিয়াছে, ঊষাকালের অর্ধস্ফুট কুসুমকলিকার ন্যায় কিশোর বয়স প্রায় অতিক্রম করিয়া গৌরাঙ্গী উজ্জ্বল যৌবন-সীমায় উপনীতোন্মুখ। একবার দেখেই, দেখি, দেখি, আবার এই প্রতিমা দেখি, এই ইচ্ছাই প্রবল হইতে লাগিল। প্রতিমা দেখিতে দেখিতে হিংস্র অন্ধকারের ছায়া আসিয়া গগন ঘেরিল। মনে হইল আলো আরও একটু থাকিলে ভাল হইত, কিন্তু দিবালোক থাকুক না থাকুক, কাদম্বিনীর মুখলাবণ্যে প্রাসাদগগন

আলো হইয়াছিল, সেই আলো আমি দেখিতেছিলাম, যেন কাল গগনে বহুদূর-স্থিত অদৃশ্য তারাপুঞ্জের শ্বেত আভা! এমন সময় গঙ্গারাম সাহস কহিল, "কি দেখেন বাবুজী, কনে?" আমি একটি "দূর" বাক্য মাত্র প্রয়োগ করিয়া গৃহাভিমুখে টাট্টু চালাইলাম।

দ্বা দ শ প রি চ্ছে দ
সন্ধি

আমরা অতি সন্ধিপ্রিয়, সুযোগ পাইলে আত্মীয় প্রতিবাসীর ভূমির উপর যৎকিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রাচীরের ভিত্তি পত্তন করি; দুই একটি বৃক্ষশাখা ফলভরে আমাদের গৃহের দিকে নত হইয়া আসিলে সেই ফলের মিষ্টতা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হই; পরক্ষেত্রের বেড়া পাতলা হইলে পথ চালাইবার চেষ্টা করি, এক একবার বলি "ও চিরকেলে"; দুর্বল লোকের লাখরাজের অনুগত প্রজা ভাঙ্গাইয়া আমাদের মালের সামিল করিতে ত্রুটি করি না, লুকিয়ে লুকিয়ে ছুরি চালাইয়া থাকি, তবু আমরা পরস্পর আত্মীয়, চারচোখে দেখাদেখি হইলে হাসি খুসি, খেলার ধুমে সন্ধিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়া থাকি। অপরিচিত লোক আমাদের বৈঠকে বসিলে মনে করেন এ গ্রামের সমাজ সৌহার্দবন্ধ, বড় সুখী!

আমি এখনও বুঝিতে পারি না যে স্থানান্তরে এইমাত্র যাহার সর্বনাশের পরামর্শ করিতেছিলাম, তাহার সহিত সাক্ষাতে আবার সঙ্গে সঙ্গে কিসের বন্ধুত্ব, কিসের সম্প্রীতি? যদিও দুই নৃপতির বন্ধুত্ব অপেক্ষা দুই দরিদ্রের বন্ধুত্ব নিষ্কপট, যদিও দুই বিষয়ীর আত্মীয়তা অপেক্ষা দুই ভিক্ষুকের আত্মীয়তা সরলভাব, তথাপি গরিবের কে গুণগ্রাহী? কিন্তু যখন বড় লোকে বড়লোকে কোলাকোলি করেন, যখন ব্যাঘ্র ভল্লুক করস্পর্শ করেন, এক দেশের সিংহরাজ অন্য দেশের ঋক্ষনৃপতিকে "আমার প্রিয়তম বন্ধু" বলিয়া সম্ভাষণ করেন, তখন বন্ধুত্ব শব্দের কেমন সার্থকতা সম্পাদন হয়? রোজনামচা হইতে সেই নিষ্কপট গৌরবের আজ একটি পরিচয় দিতেছি।

দেওয়ান গজানন আজ বিগ্রহবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিসজ্জায় সজ্জিত। তাঁহার প্রশস্ত স্থূল কলেবর সর্বদাই সুনির্মল, লোমহীন, গৌরবর্ণ, ব্রাহ্মণের সুচিহ্ন শুভ্র সরল মার্জিত যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধ হইতে বক্ষদেশ হইয়া সেই লম্বোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে লম্বমান, লম্বা লংকলাথের ধুতি মাত্র পরিধেয়, তাঁহার উভয় কাছা ও কোঁচা উদরের এক অন্ত হইতে আর এক ধার পর্যন্ত পরিসর—এই গজাননের পোশাকী বেশ! তিনি যখন নিজগৃহে বসিয়া থাকিতেন, অতি খর্ব কম চৌড়া ধুতি মাত্র তাঁহার পরিধানে থাকিত, কাছা প্রায় থাকিত না, কাছা বাঁচাইয়া গামছা করিতেন এবং দুইখানি ঐরূপ কাছা

বাঁচাইয়া আর একখানি আবার ঐরূপ ক্ষুদ্র ধুতি করিতেন, সেজন্য শ্রীনগরে ছেলের মুখে একটি নামতা শুনা যাইত, জটাধারীই তাহা রচনা করিয়াছে বলিয়া আমার অনর্থক কেহ কেহ অপবাদ দিত, নামতাটি এই—

"কাছাকে কাছা,
কাছা দুগুণে গামছা,
দুই গামছা যোড় ভাই,
গজাননের ধুতি তাই।"

এই বচন গজানন কখন কখন স্বকর্ণে শুনিতেন, কিন্তু কাহারও কথায় তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, বরং ভাবিতেন, এই বচনের সার সংগ্রহ করিলে, অনেকের সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধি হইতে পারে। যাহা হউক আজ সঞ্চয়শীলতা পরিত্যাগ করিয়া, অনাবশ্যক খরচ করিয়াও দেওয়ানজী পোশাকী বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; তাঁহার চরম আজ "ফুলপুখুরীয়" ফুলদার জরির ফুলতোলা পাদুকাদ্বয়ে শোভমান। জুতাযোড়াটী দ্বাদশ বৎসর হইল খরিদ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার রঙ্গ টস্‌কে নাই। বিশেষ বিশেষ মঙ্গলের দিন, পুণ্যাহ, পূজা, দশমী ইত্যাদি বৎসরের দুই চারি দিবস বাহির হয়, নচেৎ ভৈরব খানসামার জিম্বায় একটি পশ্চিমে বাক্‌তার বস্তানিতে বান্ধা থাকে, ভাদ্র মাসে দুই এক দিবস মাত্র সূর্যদেব দেখিতে পান, বার বৎসরের মধ্যে বুড় ভৈরব একবার তামাকের অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ঐ পাদুকার একটি শ্বেত ফুলে দাগ লাগাইয়া আপনার বাম গণ্ডে গজাননের এক চাপড়ের কালিশিরারূপ চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। দেওয়ানজীর সুসজ্জা দেখিয়া আমি ভাবিতেছি, আজ শুভদিন, কারণ যে দিন দেওয়ানজী সুসজ্জিত হন একটি পর্ব উপস্থিত হয়, মিষ্টান্ন সন্দেশের প্রায় আমদানি হইয়া থাকে। কিন্তু গজাননের দুই একটি কথা শুনিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইল। একটি প্রিয় অনুচরকে লক্ষ্য করিয়া গজানন কহিলেন, "এস, আজ ভোরেই কর্তা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, আশুতোষ ত আশুতোষ! যেমন নাম তেমনি গুণ, আমার ঘোড়াটি হত হইয়াছে শুনিয়াই কহিলেন, নূতন একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া লও, সিংহদের নিকট আর দাবি করিও না—" গজানন আবার নিম্ন স্বরে কহিলেন, "ঘোড়াটি ত সরকারী খরচেই খরিদ হইবে, কিন্তু সিংহদের নিকটেও মূল্য আদায় করা চাই, চাই বৈ কি?—চাই গো—চাই!" এই কথা কহিয়া দেউড়ির সম্মুখে যথায় শিবিকা প্রস্তুত ছিল দেওয়ানজী আসিয়া দাঁড়াইলেন। আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় আমি কহিলাম, "দাদা মহাশয় আমি যাইব।"

গজা। কে রে ভাই—জটু! কোথায় যাইবে?

"তোমার সঙ্গে" কহিয়াই আমি গজাননদাদার শিবিকার এক কোণে বসিলাম। অধিকক্ষণ মুখ বন্ধ রাখা আমার পক্ষে কষ্টকর, বাহকগণ কয়েকটি পদ না চলিতেই কহিলাম, "গজুদাদা আজ আবার দাঙ্গা হবে?"

গজা। রাম কহ, রাম কহ! রঘুবীর রঘুবীর! সন্ধি মানসে যাইতেছি, যাত্রার সময় এ কুকথা কেন শুনালি?

আমি বলিলাম, "কি কুকথা দাদা দাঙ্গা? দাঙ্গা দেখায় আমোদ আছে।"

গজা। রাম কহ, গঙ্গা কহ, আবার ঐ অকথা।

আমি কহিলাম "কি অকথা দাঙ্গা।"

গজা। তুমি আজ বিপদ ঘটাইবে দেখিতেছি! আবার ঐ কথা বল ত, নামিয়ে দিয়ে যাব।

"আর কহিব না—কিন্তু দাদা আমি সে দিন দেখেছিলাম—আপনার কৌশল চমৎকার!"

গজা। ভাই এ সকল শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, বেটাছেলে হয়ে কেবল পুঁথিপড়া নয়—বল্ চাই, বুক্ চাই, দম্ভ চাই, তবে অদৃষ্ট যোগ দেয় বড়লোক হয়—হয় রে—ভাই—হয়।

এদিকে রঘুবীর সর্দার আজ রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, রাঙ্গা পাগড়ি মাথায় দিয়া কুম্ভীরচর্মনির্মিত ঢাল পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, কোমরের বামপার্শ্বে মহিষের চর্মকৃত-কোষসংযুক্ত তরবাল ঝুলাইয়া, লাঠি হাতে পাল্কির এক বাড় ধরিয়া চঞ্চল পদচালনায় বাহকদলের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। আমাদের কথা শুনিয়া কহিয়া উঠিল।

"বেটাছেলে হ'লেই কি ভাগ্য হয় হজুর? আমরাও ত বেটাছেলে, বেটাছেলে হওয়া বড় সুখ! বরং মেয়েরা কাটনা কাটিয়া, মাছ ধরিয়া ভাল থাকে, আমাদের—"

সর্দার বেহারা কহিয়া উঠিল, "এই বোঝা কাঁধে করিয়া কাদা কাঁটা ভাঙ্গিতে বড় সুখ!" রঘুবীর কহিয়া উঠিল, "আর মধ্যে মধ্যে দারগা সাহেবের পয়জারে বড় সুখ!"

কথা কহিতে কহিতে বিস্তৃত হরিত ক্ষেত্র, শেষে নিবিড় বৃক্ষশির ভেদ করিয়া সিংহ বাবুদের প্রাসাদের শ্বেত ঊর্মিপৃষ্ঠবৎ আলিসা ও কারনিস্ দৃষ্ট হইল। বেহারাগণ সজোরে হাঁকিতে লাগিল, রঘুবীর দ্রুতপদ হইল, সর্দারের লাল কুক্কুর যেন ভারি বিষয় কার্যে তৎপর হইয়া সবার অগ্রে দৌড়িল—জমাদারের টাটুঘোড়া দৌড়িল, কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সিংহবাবুদের গৃহদ্বারে পাল্কি থামিল।

শ্রীযুত বাবু শিবসহায় সিংহ দেউড়ির সম্মুখে শিবিকা দেখিয়াই নিজ আসন একটি নিয়ারের খাট হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়ম পায়ে দিয়া দাঁড়াইলেন। উপরে সুপক্ক ভ্রূযুগল, নিম্নে কদম্বকেশরের ন্যায় প্রচুর শ্বেত গোঁফের দলমধ্যে বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয়, বয়োগুণে তারাদ্বয় আর তাদৃশ ভ্রমরকাল নাই; ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া যখন গজাননের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন তখন রাজবাটীর সিংহদরজায় সেই বড় সিংহের মূর্তিটি মনে পড়িল—মনে হইল, গজাননের গজস্কন্ধ চিরিয়া রক্তশোষণ

করিবেন। বাবু শিবসহায় সিংহ চৌহান রাজবংশীয়—তাঁহার পিতামহ সুবাদারী করিয়া শেষ মারহাট্টা ও পিণ্ডারী যুদ্ধে বিশেষ যশোলাভ করিয়া জঙ্গল স্থানে বিস্তৃত জায়গীর মহল লাভ করিয়াছিলেন। অদ্য তিন পুরুষ বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিম বিভাগে বাস করিয়াও চৌহান জাতির কুল-নীতি ভুলেন নাই, পশ্চিম অযোধ্যাবাসী স্বজাতি সদ্বংশের সহিত কুটুম্বিতা রক্ষা করিতেছেন। কাদম্বিনী একমাত্র কন্যা, অধিষ্ঠাত্রী করালবদনী কালীকাপ্রসাদে এই কাদম্বিনী পাইয়াছেন। সেই কন্যার কল্যাণবিধান জন্য প্রতি অমাবস্যায় সিংহমহাশয় ঘোররূপ কালীর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া থাকেন, আবার কালোচিত সুনীতিতে সেই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন কাদম্বিনী পুস্তকপাঠে নিপুণা, সুকাব্যের রসগ্রাহিণী, তেমনি গৃহধর্মে শিল্পকার্যে অবশেষে প্রসিদ্ধ পাচিকা রাঙ্গা ঠাকুরুণের শিক্ষায় রন্ধনকার্যে সমীচীন ব্যুৎপন্না—মাতৃহীন হওয়ায় কন্যার পরিণয়কার্যের ব্যাঘাত হইয়াছে—বাল্যবয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনোম্মুখী হইয়াছেন। সম্প্রতি সুলতানপুরনিবাসী কোন ছত্রিয় বংশ হইতে কোন যুবা রাজপুত্র আনাইয়া আপন জামাতৃপদে বরণ করিবার শিবসহায়বাবুর ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যৎ অযোধ্যাকুসুম আপাততঃ বঙ্গকাননে সিংহদের গৃহপ্রাঙ্গণই উজ্জ্বল করিয়াছিল; কিন্তু সেই সোহাগের ধন অচিরাৎ বিশ হাত জলে মগ্ন। এই কুসুম হইতে পীযূষ পরিবর্তে গরল উৎপন্ন হইয়া সিংহকুলকে একবারে বিষবারিসিক্ত করিতে উদ্যত। বাবু শিবসহায় সিংহ যে সময়ে গজাননের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাদম্বিনীর রূপলাবণ্য ও কুলগৌরব তাহার মনে জাগরূক ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন, সেই রূপে সেই গৌরবে গজাননের ষড়যন্ত্রে কলঙ্কক্ষেপণের চেষ্টা হইতেছে। সেই সুরূপা প্রাসাদ হইতে দাঙ্গা দেখিয়াছিলেন, তাহাকেও অভিযুক্ত ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। দেওয়ানজী কহিয়াছেন, তাঁহার আদেশেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়; তিনিই কহেন "বাবা ওদের মারতে হুকুম দিয়াছেন" ও তাঁহার ইঙ্গিতে কয়েকটি দাসী ছাদ হইতে ইট নিক্ষেপ করে, তিনিই ত প্রধান আসামী। দেশবিভাগের তেজীয়ান্ বিচারপতি মৌলভি সাহেব কাদম্বিনীর নামেও সমন জারি করিয়াছেন।

গজানন মিষ্টমুখ, সতত নম্র, বিনয়ী, বাবু শিবসহায়কে দেখিবামাত্র ত্বরিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুটি হাত বিনয়ে ধরিলেন; এবং কথা কহিতে কহিতে গজাননবাবু শিবসহায় সিংহকে খাটিয়ায় বসাইলেন। খাটিয়ার নিম্নভাগে একটি শতরঞ্জিতে নিজে বসিয়া নিম্নস্বরে কি কথা কহিলেন। শিবসহায় সিংহ জল হইয়া গেলেন। দেওয়ানজী প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন, "রাগ চণ্ডাল, চণ্ডাল মশাই চণ্ডাল! রাগে মানুষের বুদ্ধিহীন হয়, আপনি যে জন্য ক্রুদ্ধ আমি বুঝিয়াছি, কেহ আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া থাকিবে, আপনার যাহাতে অসম্ভ্রম হয়—দোহাই রঘুবীর! সে চেষ্টা গজাননের সততই কষ্টকর জানিবেন। যাহা হইয়াছে, হইয়া গিয়াছে, নির্বোধ সেই ছোঁড়া

মোক্তারটা এক বুঝিতে আর বুঝেছে, এক্ষণে ক্ষমা করুন, রাম বলুন, শান্তি শান্তি বলুন—না বলবেনই বা কেন? যাহাতে ইজ্জত রক্ষা হয় তার অনিচ্ছা বা কেন? তা করাই কি কঠিন কাজ? উভয় পক্ষ সম্মত হইলে হাকিম কি করতে পারেন? দায়ী মুদ্দয় রাজী ত কি করবে কাজী?" দেওয়ানজীর মন্ত্র সর্বশক্তিমান, মিথ্যাবাদ, কপটতা কি এতই মিষ্ট? সরল সিংহবাবু এক্ষণে মন্ত্রে বশীভূত, দেওয়ানজীর কথা যথার্থই হিতৈষী সুহৃদের পরামর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পার্শ্ববর্তী লোক সমস্তের প্রতি গজানন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "ওহে তোমরা একবার অন্তরে যাও, যাও হে যাও" পরক্ষণেই কহিলেন, "মহাশয় এখন এখানে কেহ নাই—এই শ্বেত চূণের ঘরে বসিয়া হিতেছি—স্বরূপ কহিতেছি—কোন বিষয়ে চিন্তা করিবেন না, যদিও সমন হইয়াছে তাহার উপায় আছে। আপনার মান, বুকে হাত দিয়া বলিতেছি, এই আমার মান, আমার মান, মশাই, আমার মান! কুলকন্যাকে কাছারিতে উপস্থিত করা—রাম কহ, রাম কহ—সে কথা মনে করিবেন না—না হয় দুহাজার টাকা গেলই। নিতান্ত সমনজারি নিষেধ না হয়, অল্পবয়স্ক দাসী একজনকে সাজাইয়া দিব—মৌত নাম লিখাইয়া দিব—একটি চিতা সাজাইয়া শবদাহ দেখাইব —কথাটা কি এতই ভারি? সহজ কথা মশাই সহজ কথা! আজ চৌকিদারকে দিয়া থানায় একটা এত্তেলা দিয়া রাখুন যে, গ্রামে বিসূচিকার পীড়ার বড় প্রাদুর্ভাব, যেই পীড়ার উদয় সেই মৃত্যু—মৃত্যুরেব ন সংশয়! ব্যাস হ'ল কি ম'ল—আর শুনুন—গ্রামে চাঁদা করিয়া একটি রক্ষাকালীর পূজা আরম্ভ করে দিন, লোকে জানুক যে মহামারী যথার্থই উপস্থিত হইয়াছে—হয়েছে ত —কোন্ না হয়েছে।"

সরল শিবসহায় সিংহ ঘোর শাক্ত, কালীভক্ত, রক্ষাকালী পূজার নাম শুনিয়াই সব বিপদ ভুলিলেন, দেওয়ানজীর কথায় মত্ত হইয়া তাহার পরামর্শ একান্ত মনে গ্রহণ করিলেন, পরক্ষণেই দেওয়ানজী চাঁদার ফর্দ লইয়া বসিলেন। কালীপূজার খরচের সহিত আপন মৃত ঘোড়ার মূল্য উঠাইতে লাগিলেন। বন্দোবস্ত সমাপ্ত হইলে আমাদের শিবিকা কিঞ্চিৎ কাল পরেই গৃহাভিমুখ হইল। যখন আমরা শান্তিপুরের বাহির্দেশে আসিলাম ঢাকের শব্দ উঠিল। রঘুবীর কহিল প্রতিমার মাটী তুলিতে যাইতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গোয়েন্দা

শান্তিপুরে শান্তির শেষ হইয়াছে। আমরা সেদিন সিংহবাবুদের বাটী হইতে বিদায় হইবার পরক্ষণে যে বাদ্য শুনিতেছিলাম সেই বাদ্যশেষই উৎসবের শেষ—সেই বাদ্যই সিংহদের শেষ গর্জন। রক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছে।

থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে গ্রামে বিসূচিকার পীড়ায় হুলস্থূল পড়িয়াছে। বাবু শিবসহায় সিংহের কন্যা কাদম্বিনী নাই, এমতও একটি জনরব ব্যাপ্ত হইয়াছে। একটি সজ্জিত চিতাতে নিশীথ শেষে তাহাকে দাহ করিতেও দেখিয়াছেন, কেহ কেহ কহিয়া থাকেন। গবাক্ষ, ছাদে, স্নানাগারে, দেবমন্দিরে কেহ তাহাকে কোথায় দেখিতে পায় না, নাপিত বধূ তাহাকে আলতাভরণ দিতে যাইয়া নৈরাশে ফিরিয়া আসিয়াছে। সকলে বিমর্ষ, রক্ষাকালীর বিসর্জনের সহিত সিংহবংশের আমোদের বিসর্জন হইয়াছে, কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, বিপদ খণ্ডন হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইয়াও হইল না, আমাদের দেশে গোয়েন্দার অভাব নাই—আসল কথা ব্যক্ত হইয়াছে। ছিদ্রানুসন্ধানী মহাত্মা গোয়েন্দা! তোমার অগম্য স্থান ভারতে কোথায় আছে? যে রাজনিকেতনে দণ্ডধারী ভীষণ প্রহরীর পাহারা সেখানেও তুমি। সভাপতি, অধ্যাপক, মোসাহেব, সম্পাদক সাজিয়া দেশের খবর দিয়া থাক। যে স্নানাগারে রাজমহিলা পিপীলিকার প্রবেশদ্বার পর্যন্ত রুদ্ধ করিয়া স্নিগ্ধ হইবার আশা করেন সেখানেও তুমি। সেকেন্দরের জয়পতাকা তুমিই ভারতে উত্তোলন কর, যবন পতনের পথ তুমিই না দেখাইয়া দাও? তোমার কথায় ব্রাহ্মণবৃত্তির লোপ, সংস্কৃতশাস্ত্রের লয়প্রাপ্তি, তোমার প্রভাবেই আজ সিংহবংশের ঘোর বিপত্তি।

আমাদের নূতন রাজ্য-বিভাগ স্থাপন হইয়াছে, সরকার বাহাদুর বাছিয়া বাছিয়া একটি সুযোগ্য কর্মচারী পাঠাইয়াছেন, তিনি ছালা ছালা ইংরেজি পুস্তক পাঠ করিয়া কত কত আলমারী খালি করিয়াছেন, কয়েক বৎসর কালেজের অধ্যাপক থাকিয়া শিক্ষকশ্রেণীতে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন, বিষয়বুদ্ধিতে মন উথলে পড়িতেছে, নূতন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শিষ্টপালন করিবেন, দুষ্ট দমন করিবেন বলিয়া উৎসাহে মন পরিপূর্ণ, তাঁহাকে ঠকাইতে পারে এমন কে আছে? দরখাস্ত পড়িলেই তিনি বাদীর মনের ভাব জানিতে পারেন। কাগজ পাঠ হইতে হইতেই মৌলবী সাহেব কহিয়া উঠিলেন, "দারগা একটি মিথ্যা রিপোর্ট লিখিয়াছে যে, কাদম্বিনীর বিসূচিকা পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছি, যে অমূলক ইজ্জতের ভয়ে সিংহবাবুরা একটি ফেরেব বানাইয়াছেন, ইহার বিহিত উপায় করা যাইবে।"

পরদিন প্রভাত, সিংহবাবুর কুপ্রভাত হইল; বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি কুঠরী বাবু শিবসহায় সিংহের শয়নগৃহ, তাহার গবাক্ষদ্বার সিংহবাবু উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, কাল কাল পাগড়ী ও বড় বড় লাঠি হস্তে কতকগুলি যমদূত তাঁহার গৃহ বেষ্টন করিয়াছে। নাজির ঘোটকারোহণে বাটীর চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সকলকে সতর্ক করিতেছেন ও কহিতেছেন, "খান বাহাদুরের ঘোড়া আগতপ্রায়।" বাবু শিবসহায় এখন বিপদ সম্মুখে দেখিয়া কালী তারা ডাকিতে লাগিলেন ও ভাবিলেন ইহার অর্থ কি? কি

অপরাধ করিয়াছেন তাহাও স্থির করিতে অক্ষম, ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইতেছেন এমত সময় তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য রামা পরামাণিক গৃহের দ্বার ধীরে ধীরে খুলিল। বৃদ্ধবাবু চমকিত হইলেন, মনে করিলেন, এই ধরিল, রামা অতি মৃদুস্বরে কহিল—“আমি।”

শিব। আরে আমি কে?

রামা। আজ্ঞা, আমি।

শিব। ফের আমি, নাম কি?

রামা। আমি রামপ্রসাদ।

শিবসহায়বাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, রক্ষা হউক, সংবাদ কি বলিতে পারিস্?

রাম। পারি, মহাশয়—আমি—

শিব। তুই “আমি” ছাড়িবি না?

রাম। আমিই ভগবান্ মহাশয়—তা—

শিব। আ! আরে খবর বল।

রাম। আমি যেই জাগ্রত ছিলাম তাই রক্ষা। রাত্রি দুই প্রহরের সময় শঙ্কর সর্দার কহিল, যে কাদুদিদিকে হাজির করিবার জন্য স্বয়ং হুজুর আসিবেন, আমি তখনি তার উপায় করিয়াছি। রামার এই কথা শেষ না হইতেই দ্বারে একটি আঘাত হইল, ও সঙ্গে সঙ্গে নাজির সাহেব কহিলেন, “ও বাবু শিবসহায় সিংহ! আপনাকে হাজির করিবার জন্য হাকিম সাহেবের হুকুম পাইয়াছি।”

বাবু শিবসহায় সিংহ ক্ষণমাত্র কালী স্মরণ করিলেন, চক্ষু মুদিলেন, কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ভাবিলেন, যে তাঁহার পূর্বপুরুষ রক্তবিসর্জন ও প্রাণদানে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, এখন আইনের গৌরবে সেই রাজ্যে উচিত প্রতিফললাভ সম্ভাবনা। আবার ভাবিলেন, ঈশ্বরের বিড়ম্বনা, পিতৃলোক যে যবনরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এখন সেই যবনের হস্তে তাঁহার বংশের অনিষ্ট হওয়া চাই—আবার ভাবিলেন, “আমার বল কোথায়? গ্রামে যে সহস্র যুবাপুরুষকে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া যুদ্ধপটু করিয়াছিলাম, যাহাদের মধ্যে এক ষোড়শ বৎসরের ছোকরার সাহায্যে সহস্র সহস্র সড়কি ক্ষেপণে সেই অত্যাচারী নীলকর বিডেল সাহেবকে সম্মুখযুদ্ধে পরাভব করিয়া দেশচ্যুত করিয়াছিলাম সে বল কোথায়? কেহ প্লীহাগ্রস্ত, কেহ মেলেরিয়াজ্বরাক্রান্ত, অনেকেই জীর্ণ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে—হউক, তবু ইজ্জত রক্ষা করা চাই।” রামা খানসামা এই সময় কাণে কাণে কহিল, “বাবুমহাশয় কাদম্বিনী দিদিকে হরণ করিতে দিব না—গোপাল চৌকিদারকে বলে সেই ভোররাত্রেই জলছেঁচা মরায়ের ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি।”

এই সময়ে গোপাল চৌকিদার উপস্থিত হইল, সে শিবুবাবুকেই প্রভু

বলিয়া জানে, অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহার অন্নদাস, নাজির সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "আপনারা যাঁহাকে তল্লাস করেন তিনি কি আছেন?" কর্ণে যেমন এই বাক্য প্রবেশ, অমনি নাজির সাহেবের হস্ত হইতে গোপালের পৃষ্ঠে জোড়া চাবুকের আঘাত বর্ষণ!

গোপাল। ওগো আছেন—আছেন,—আছেন।

নাজির সাহেব বলিলেন, "পথে আয়, কোথায় বল—বল কোথায়?"

গোপাল। যথায় থাকুন, বাবুদের বাটী শূন্য।

নাজির। তবে কোথায় বল্‌—নাজির সাহেব কিঞ্চিৎ শান্তমূর্তি হইয়া মনে করিলেন সন্ধান পাইব।

নাজির। কোথায় আছে বল।

গোপাল করযোড় করিয়া কিঞ্চিৎকাল করঘর্ষণ করিয়া কহিল, "বৈকুণ্ঠে।" আবার বেত বর্ষণ হইল। গোপালের চীৎকারে বাবু শিবসহায় অন্যমনস্ক হইয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন ও তৎক্ষণাৎ নাজির সাহেবের ইঙ্গিতে আসামী মধ্যে গণ্য হইলেন।

শিব। আপনি মহকুমার নাজির সাহেব, আমার কন্যা জীবিত আছেন কি না তাহাই সন্ধান করিতে আসিয়াছেন।

নাজির সাহেব কহিলেন, "আর তাঁহাকে লইয়া কাছারীতে হাজির করিতে আদেশ পাইয়াছি। তিনি কোথায়?" গোপাল চৌকিদার কহিল, "জলমগ্ন।" নাজির সাহেব আবার বেত উঠাইয়াছেন এমন সময় এক জন অশ্বারোহী পুলিস কর্মচারী আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিলেন, "মহাশয় একটা সন্ধান পাওয়া গেল, একটি কুলকন্যা এই গোপাল চৌকিদারের গৃহ হইতে উহার স্ত্রীর সহিত বহিষ্কৃত হইয়া শ্রীনগরের দিকে যাইতেছে, সেই লাবণ্যময়ী যুবতী মলিনবসনা; কিন্তু মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রিমার ন্যায় আরো সুন্দরী দেখাইতেছে। শুনিতেছি যাহার সন্ধানে আসিয়াছি সে কন্যা আর আমরা পাইব না।"

নাজির। শ্রীনগর? দ্রুত যাও ও স্ত্রীদ্বয় যে হউক পথিমধ্যে ধৃত কর।

আদেশমাত্র দুইটি সজ্জিত অশ্বারোহী পুরুষ তীরবেগে ধাবিত হইল। শিবসহায়, কালীর নাম অন্তরে জপিতে লাগিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জলমগ্ন

দেওয়ান গজানন হঠাৎ সিংহবাবুদের দরজায় নাজির সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত। "বলি মিথ্যা এখন ত আর মিথ্যা রহিল না, মিথ্যাই সত্য হ'ল, কাদম্বিনী কন্যা অদ্য পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, না ছিলেন, ভগবানই জানেন, রঘুবীরই জানেন—কিন্তু

যদি আজ যা দেখিলাম, যদি মহাশয়! আঁখিদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে হয়, তবে সর্ব সন্দেহই ভঞ্জন হইল, কাদম্বিনী জলমগ্না। আমি ব্রাহ্মণী-নদী পার হইয়া এক শত বিঘামাত্র আসিয়াছি, দেখিলাম, জনাব নাজির সাহেব! শুনুন মহাশয় শুনুন, আপনারই অনুচর হইবেক, দুই অশ্বারোহী পুরুষ ধাবমান, বামপার্শ্বে রাস্তা ছাড়িয়া দুটি অনাথিনী অবলা নদীর ঘাটে ত্বরিত উপস্থিত ও নৌকায় আরোহিত: ঐ স্ত্রীদ্বয়মধ্যে এক জন একটি নিজ অঙ্গ হইতে কি একটি সামগ্রী পাটনির হস্তে অর্পণ করিবামাত্র খিল। নৌকা ঘাট হইতে ত্বরিত চালিত হইল। এদিকে অশ্বারোহী উভয়ে 'নৌকা রাখ' বলিয়া গম্ভীরস্বরে পাটনিকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু আজকাল বন্যার জলে উভয় কূল টইটম্বুর, একটানা: নৌকা রেলের বেগে চলিল ও বাদশাহী ভগ্ন সাঁকোর নিকট যাইয়া সেই পাক্কা নেড়া থামের উপর যেমন পড়িল একটি পতঙ্গের ন্যায় জলস্রোতে ভাসিয়া নৌকাটি নয়নপথের বাহির হইল, একটি গাল উপস্থিত হইয়া থামিল, বোধ হইল নৌকা চুরমার হইয়া তর্কালঙ্কারের আশ্রমের ঘাটের নিকট জলমগ্ন হইল, ছারখার হায় রে! ছারখার!"

এই কথাগুলি শেষ না হইতেই অশ্বারোহী উভয় পুরুষ আসিয়া উপস্থিত। একজন কহিয়া উঠিল, "মহাশয় সব চেষ্টা বিফল, স্ত্রীলোকের এমন বুদ্ধি! আমরা প্রায় ধরেছিলাম, একটি স্বর্ণালঙ্কার পাটনির হস্তে দিয়া পার হইতে যাইয়া নৌকা সহিত জলশায়ী হইয়াছে, নিরুপায় হইয়া মহাশয়ের নিকট প্রত্যাগত হইয়াছি।" নাজির সাহেব ভাবিয়া বসিয়া পড়িলেন। সমুদয় মারাসাই, দেখিতে দেখিতে আসামী হস্তান্তর! কি কৈফিয়াৎ দিব! নাজির সাহেব মনে মনে ভাবিতেছিলেন—গজানন তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছেন ও এক কথায় মোকদ্দমা ফাঁস করিবার বুদ্ধি রচনা করিতেছেন। কিঞ্চিৎ কাল সকলে নিস্তব্ধ, এমন সময় সম্বাদ আসিল যে, খাঁ বাহাদুর অদ্য স্বয়ং আসিতে অক্ষম, সাহেব ঘোড়া চড়িতে হঠাৎ অপারগ হইয়াছেন। সংবাদদাতা হরকরা কহিল, "মহাশয় সব প্রস্তুত, সাহেব পোষাক পরিয়া টুপি লাগাইয়া ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া চশমা বাহির করিয়া দেখিলেন একটি পরকলা ফাটিয়া গিয়াছে, আর ঘোড়া চড়া হইল না—" অশ্বারোহণেব সহিত চশমার সম্বন্ধ বিচার করিতে অনেকেই অক্ষম, কিন্তু খাঁ বাহাদুর আণ্ডা আহার করিতে প্রবৃত্ত হউন, বিচারাসনে রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হউন, আলবালার লম্বা নল ধারণে প্রবৃত্ত হউন, বেগম সাহেবের মহলেই যান, বা ঘোড়া চড়ুন, বা যাহাই করুন সকল কার্যেই তিনি চসমা ব্যবহার করিতেন: কিন্তু তাহা যে কেবল শোভা বর্ধনের নিমিত্ত এমত নহে, তিনি আদৌ দেখিতে পাইতেন না। শুনা যায় যে চশমা ভিন্ন তাঁহার শয্যায় সুনিদ্রা আসিত না—চশমা ভিন্ন তাঁহার স্বপ্ন দেখিতেও কষ্ট হইত। যাহা হউক সামান্য কারণ হইতে বৃহৎ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে—আজ চশমা ভাঙ্গাতে অনেক অবসর ও গজাননের বুদ্ধি-চালনার সুসময় হইল। গজানন নাজিরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,

"মহাশয়ের কি অভিপ্রায়? যখন আমি আসিয়াছি যা চাহিবেন তাহাই সিদ্ধ হইবে। আমার নাম গজানন চৌধুরী, হাকিমদের খিদমতেই আমি চিরকাল কাটাইলাম।" যেমন ফ্রিমেসনারী দলভুক্ত ব্যক্তি আপন ধর্মাক্রান্ত লোককে ইঙ্গিতে চিনিতে পারে, দেওয়ানজীর অঙ্গুলিবিক্ষেপণে ও নাকচোকের ভঙ্গিতে নাজির সাহেব তাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয়মধ্যে গণ্য করিয়া একটি সেলাম করিয়া কহিলেন, "মেহেরবান হুজুরের. আপনিই বাবু সাহেবের দেওয়ান?" গজানন শুধু সমেত সঙ্গে সঙ্গে সেলাম প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "কার্য পরে, এখন খানার উদ্যোগ করা যায়?" খানা নামমাত্র, দুধ আর বক্রি রুহিমাছ আর তরকারী ও গণ্ডা আণ্ডেক আণ্ডার বরাত হইল, চারিদিকে লোক ছুটিল, কাছারি যেরূপ গরম হইতেছিল অনেক ঠাণ্ডা পড়িল। গজানন আবার কহিলেন, "মহাশয় এখানে বড় চমৎকার রেশমের কারখানা হয়—আপনার যে ইজের দেখিতেছি ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্ত্র, জানানার বেগম সাহেব সে কাপড় বড় ভাল বাসিবেন। এই যে বাবুদের ঘরে আপনি আসিয়াছেন, লক্ষ্ণৌ সাসিরাম, বানারসের মহাজনদের সঙ্গে এদের কারবার বরাবর প্রচলিত রহিয়াছে—এরা লক্ষ্ণৌয়ের টুপি ও বেনারসী মুরেটার ব্যবসা করেন. পছন্দ হয় তো খরিদ করুন।" আবার নিম্নস্বরে কহিলেন. "বন্দাও আপনার ঘরের লোক. মর্জি হয় তো দুই চারিটা দ্রব্যের নজর দিবার অধিকার রাখি—অধিকার মশাই, অধিকার!" পরক্ষণেই প্রাঙ্গণের পূর্ব দিকের কামরাতে নাজির সাহেব গজাননের সহিত একটি গালিচার উপর তাকিয়া ঠেশ দিয়া, সযত্নে হাটুদ্বয় অগ্রসর করিয়া ও তাহার তলে পদযুগল গজকাটির ন্যায় মুড়িয়া, আবার দুটি হাত উল্টাইয়া ফরাসের উপর ভর দিয়া. একটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোকের ন্যায় বসিলেন—একজন ভৃত্য একটি বড় তালবৃন্ত লইয়া হেলাইতে লাগিল, বায়ু সঞ্চালন হইলে নাজির সাহেব একবার টুপিটি উঠাইলেন. দেখিলাম তাঁহার মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে যেরূপ প্রচুর কেশ, মধ্যে সেরূপ নহে—চাঁদিটিতে তীক্ষ্ম ক্ষুর পরিভ্রমণে গোল শাদা জমি বাহির করিয়া দিয়াছে. বোধ হয় সেটি দেখাইতে লজ্জিত হইয়া পাগড়ি ঈষৎ ঊর্ধ্ব করিয়াই আবার তৎক্ষণাৎ পরিলেন, কিন্তু জটাধারী তাঁহার ফাঁকা মাথা দেখিয়া লইলেন। আবার দেখি, আমাদের চাপকানের যেদিকে বোতাম তার বিপরীত ভাগে নাজির সাহেবের চাপকান আবদ্ধ। কেবল নাজির সাহেবের ও দেওয়ানজীর সহিত একটি বিষয় সাদৃশ্য—চশমার ডাঁটি উল্টো পরান নহে। নাজির সাহেবের খানসামা তাঁহার একখানি ধুতি আনিল। দেখিলাম তাহাও কাছাবিহীন। মনে করিলাম উভয়েরই কাছা নাই বলিয়া অল্পকালের মধ্যে এত সম্প্রীতির উদয় হইল, যাহা হউক এখন উভয়ে বসিয়া কাজের কথায় প্রবৃত্ত। একটি পরওয়ানা পাঠের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় রাজকার্যনিষ্পাদক আর এক অবতারের আবির্ভাব হইল—ইনি বড় লোক, রাণীর বাজারের ডাকমুন্সি, পূর্ণ-চন্দ্র গাঙ্গুলী। ইনি বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টকে মানেন না, তদধীনের কর্মচারী-

দর ভ্রূক্ষেপ করেন না। বলেন আমরা ওদের গ্রাণ্ড ফাদার, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ।বর্ণর জেনারেলের কার্যকারক। ইনিই সেই গাঙ্গুলী মহাশয়, যিনি বাতার ।াখারীর কলমের একপাশে ইংরেজি লিখিতেন ও অন্যদিকে ডাকঘরের থামের ূণ খসাইয়া বদনে অর্পণ করিয়া পানের ঝাল নিবারণ করিতেন। ইনিই মাবার সেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জন্য ডাক্তার ইটওয়াল সাহেবের নিকট চূণ খরিদের নমিত্ত মাসিক এক মুদ্রা বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। ইহার প্রভুত্ব প্রতিপত্তি এক্ষণেও এ অঞ্চলে বিখ্যাত। আজ অনেক হাকিমের কথা শুনিতেছিলেন; কিন্তু নাজির সাহেবের উপরেও হাকিম আছে এই কথাটি জারি করিবার জন্য ইহার আগমন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিধানে একটি সামান্য ধুতি, াতেই উদরের তৃতীয় অংশ বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিৎ নিম্ন পর্যন্ত আবৃত; তদুপর একটি মারকিনের হাতখাট বেনিয়ান—খাট খাট চুল, প্রায় বার আনা পাকা, অবশিষ্ট মাত্র কাঁচা, কপাল উন্নত—ওষ্ঠদ্বয় পরিষ্কার ও দন্তপাটি আরও উজ্জ্বল, চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ। নাজির সাহেবের সহিত চার চক্ষে—বরং আট চক্ষে—কারণ উভয়েরই চশমা ছিল—একত্র হইল। নাজিরের চশমা চিক্কণ —গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চশমা চৌড়া পিত্তলের হাসিয়াদার, কলঙ্কময়। পশ্চাতে সূত্র দিয়া টিকির নীচে আবদ্ধ। নাজির সাহেবকে দেখিবামাত্র আপনার চশমাদ্বয় মাথার চুলের উপর উঠাইলেন। তাহাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে একটি চতুর্লোচন মানুষ বোধ হইল—ও একবার ভ্রূযুগল উত্তোলন ও গর্জন করিয়া কহিলেন, "আপনিই বুঝি নাজির? এ আপনার কোন্ দেশী নাজিরী? আমরা কি কখন নাজির দেখি নাই, নাজির! নাজির! নাজির! কাল ডাক্তার ইটুয়াল আসিবেন, আপনি আজ আমার ডাকঘরের েতা হ'তে বেহারা ধরিতে পাঠাইয়াছেন। বাক্র, মুরগি, আণ্ডা এসব বুঝি আপনার জন্যই গণ্ডায় গণ্ডায় সংগ্রহ হতেছে? ঐ এক বিবাহের বরযাত্রীসহ শখানি পাল্কির বেহারা আটক করিয়া দিলাম। আর আপনাকে কহিয়া াইতেছি আমার একটি কাহার, একটি কুলি, আধখানি বাঙ্গিদার পাইবেন । এখন, কাহারও পাল্কি চড়া হউক না হউক, ঘরে যাওয়া হউক আর হউক, আমি বলে রাখলাম।" দেওয়ান গজাননের প্রতি এতক্ষণে ডাকমুন্সি হাশয়ের চক্ষু পড়িল। গজানন কহিয়া উঠিলেন, "ও মহাশয়, ঘরের কথা আমি এখানে আছি; আপনিও হাকিম, উনিও হাকিম।" গঙ্গোপাধ্যায় হাশয় কহিলেন, "হাকিম হ'লেই হয় না, হকিয়তের বিচার করা চাই, ন্যায় অন্যায় প্রভেদ করা চাই কি না? 'আল্লার পর হাকিম' একথা মনে রাখা াই কি না?"

দেও। সে শক্তি কি সকলের আছে? একবার অনুগ্রহ করিয়া বসুন।

গাঙ্গুলী। "বসিবার কি অবসর আছে!" বলিয়া বেনিয়ানের জেব হইতে একটি চূণের ডিবার মত ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন, "মেল-ব্যাগ প্রস্তুত

করিতে হইবে আর টাইম (সময়) নাই।” আমি তত বড় ঘড়ি কখন দেখি নাই—কহিলাম, “ওটা ঘড়ি না তালআঁটি?—আমপাড়া ঘড়ি?”

গাঙ্গুলী। “এ ছোকরা কে হে, পাক্কা ছেলে!” বলিয়াই প্রস্থান করিলেন।

এখন শিবসহায় সিংহের অজ্ঞাতে এই স্থির হইল, কাদম্বিনীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করাই উচিত। কিন্তু কাদম্বিনী কোথায়? সাজাইতে হইবে। দেওয়ানজী নাজির সাহেবের কাণে কাণে কি কথা কহিলেন, নাজির সাহেব মস্তক হেলাইয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। একটি শত মুদ্রাপূর্ণ বগলি কক্ষ হইতে বাহির করিয়া চারিদিকে চাহিয়া নাজির সাহেবের প্রতি অভয় ও সদ্ভাব-প্রকাশক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থলিটি ত্বরিত নাজির সাহেবের তাকিয়ার নীচে রাখিলেন। বাহিরে জানালার নিকট হইতে রঘুবীর তাহা দেখিল, সুখাদ্য মাংসখণ্ড দৃষ্টে লোভী কুক্কুর যেরূপ লোভদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহার নয়নে সেইরূপ লোলুপ্য দেখা গেল! ইতিমধ্যে সংবাদ আবার আসিল যে, আগামী কল্য প্রাতেই খাঁ বাহাদুর সরেজমিনে পৌঁহুছিবেন ও মোকদ্দমা এইখানেই তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবেন। পরদিন প্রাতে নাজির সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া পোষাক পরিয়া তাকিয়ার তল হইতে থলিটি লইতে যান, দেখেন তাহা অপহৃত হইয়াছে—পশ্চাদ্ভাগে জানালার রেল ভাঙ্গিয়া সিঁদ দিয়াছে--কথা প্রকাশ করিবার যো নাই, চোরের টাকা বাটপাড়ে লইয়াছে, হুজুরের ঘরে চুরি একশত মুদ্রাই বা কোথা হইতে আসিয়াছিল? গজানন জানেন কে লইয়াছে, রঘু বন্ধকী জায়গীর উদ্ধারের উপায় করিয়াছে—ভরিককে ভরি উঠাইয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

“রাম না হ'তে রামায়ণ”

অনধিকারচর্চ্চা করিতে আমরা কখন ত্রুটি করি না। যদি কণ্টকাকীর্ণ বন্য তরু ও বন্য লতাজালে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ বেষ্টন করে, যদি সর্প ভেকে আমাদিগের গৃহে ভাগাভাগী করিয়া বাস করে, যদি জলবন্ধ হইয়া সেৎসেতে সেওলার বিছানা হইতে দুর্গন্ধ বিস্তার হয়, যদি দিনে দুই প্রহরে, হেতে জোঁক ও শিলেটি হাঁড়ির মত মশা রক্ত শোষণ করে, তথাপি হস্ত বাহু পরিচালনা করিয়া কৃষ্ণের জীবকে বিনষ্ট করিতে বড় মায়া হয় ও সরে বসিতেও ক্লেশ বোধ হয়। সসর্প গৃহে বাস, দুর্গন্ধভোগ ও জ্বরের জ্বালা সহ্য হয়, তবু আলস্য পরিত্যাগ করিতে কাতর, আবাসভূমি পরিষ্কার করিতে কাতর, সকল কার্য্যেই কাতর; কিন্তু বাক্যব্যয়ে, অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি আমাদর তুল্য অকাতর কে আছে? মিথ্যা বাক্যে যে আমাদের নিজ কার্য বিশৃঙ্খল হয়, ন্যায়বিচারক্ষমতা ও চিন্তাশীলতার হ্রাস হয়, গুরুতর পরিশ্রম

লব্ধ কার্যসম্পন্ন শক্তি শিথিল হয়, সমাজের অনিষ্ট হয়, হ'লই বা, অম্বুরি তামাক মিশাইয়া বৃথা গল্প করার তুল্য মধুর আর কি আছে? বৃথা গল্প বড় ভাল লাগে, তাহাতে, নিজ উপকার হউক না হউক, যাহারে ভাল না বাসি তাহারও কখন কখন অনিষ্ট হয়, না হয়, তাহার নিন্দাবাদও তো প্রচার হয়? সে বড় কম কর্ণসুখ নহে!

আমাদের খঞ্জ ভীম স্কুলমাস্টার ও বিখ্যাত হাকিম ডাকমুন্‌সি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া ডাকঘরের মেজেতে পাটি পাড়িয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। মাস্টারবাবু গজাননের বিরুদ্ধ। গজানন ইংরেজি শিক্ষার শত্রু, গজানন নিঃসন্তান, চক্ষু মুদিলে তাঁহার ধন কে ভোগ করে? কাহাকেও ধন দান করিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু তিনি মহান্ হিন্দু। পরলোকে পিণ্ড পাইয়া নরক হইতে উদ্ধারের আশা রাখেন। এই জন্য বহু যত্নে একটি দূরদেশস্থ জ্ঞাতির সন্তান লইয়া পালিতেছেন, তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন ও পোষ্যপুত্র করিয়া পিণ্ডাধিকারী ও ধনাধিকারী করিবার বিশেষ প্রয়াস রাখেন, আশুতোষবাবুর অনুরোধে এই নীলমণিকে তিনি খঞ্জ ভীমের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; সুশিক্ষার জন্য মাস্টারবাবুও অনেক যত্ন করিতেছেন; কিন্তু যাহাকে প্রকৃতি দেবী প্রতিকূল, মানব-চেষ্টায় তাহার কি হইতে পারে! নীলমণি আজ যাহা বহু কষ্টে শিখিয়া গৃহে যান, কাল প্রাতে ক্ষীর, ননী, সন্দেশের সহিত বেমালুম "জলপান" করিয়া আসেন। তিনি "লোককে" "নোক" রসিককে "অছিক" রাঙ্গাকে "নাঙ্গা" ভিন্ন কহিতে পারেন না—এ দিকে রাঙ্গাকে "লাঙ্গ"—অভয়কে "রভয়" বলিয়া থাকেন। "লোকোমোটীব"-কে "নৌকো মাটি" কহিতেন ও একদিন "কামস্‌কাট্‌কা" উচ্চারণ করিতে উদ্যম করায় দন্তপাটীতে খিল লাগাইয়া মাস্টারবাবুকে বিশেষ তিরস্কৃত করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি পরীক্ষার সময়ে (প্রাইজ) পারিতোষিক পান না বলিয়া গজানন মাস্টারবাবুর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে গজানন মাস্টারবাবুর কাছে প্রস্তাব করিয়া থাকেন, "বাবু! পরীক্ষককে কিছু রেশবত দিলে আমার নীলমণি প্রাইজ্ পেতে পারে না? না হয় আশুতোষ-বাবু দ্বারা পরীক্ষককে একখানি অনুরোধপত্র লিখাইলে ছাত্রবৃত্তির পাশ আসিতে পারে না?" আবার কখন কখন বলেন, "বাবা, আমি উহার তত লেখাপড়া চাই না—যাহাতে মতভ্রষ্ট না হয়, পিণ্ডটি বজায় থাকে তাহাই করুন।" মাস্টারবাবু একদিকে এই সকল মতের অনুমোদন করিতে অন্যদিকে নীলমণির শিক্ষার কিছুমাত্র উন্নতি দেখাইতেও পারিতেন না। তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া নূতন মাস্টার আনাইবার জন্য গজানন দুই একবার আশুতোষ-বাবুর নিকট অনুরোধ করেন। মাস্টার সেই সব কথা শুনিয়া দেওয়ানজীর বিশেষ বিদ্বেষী হন। আজ মাস্টারবাবু সুসময় পাইয়াছেন। দেওয়ানজী যে নাজির সাহেবের যোগে মিথ্যা করিয়া সুরসিকা ললনা সুন্দরী গোপিনীকে কাদম্বিনী সাজাইয়া বিচারস্থলে আনয়ন করিবেন, তাহা মাস্টারবাবুর কর্ণ-

গোচর হইয়াছে। সুন্দরীর সঙ্গে তাঁহার অনেক কথা হইত—ও সেই সকল কথা ব্যক্ত করিবার জন্য পূর্ণবাবুর বৈঠকে আসিয়াছেন।

এ দিকে পূর্ণবাবু নাজিরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছেন, গ্রামে একজনই হাকিম থাকিতে পারে—এক কম্বলে চার জন দরবেশ বসিতে পারে, কিন্তু এক রাজ্যে দুইজন রাজার স্থান হইতে পারে না—নাজির আবার কোথাকার হাকিম, দুই দিবস পর্যন্ত গ্রামে প্রভুত্ব করিতেছে অথচ ডাকমুন্সী মহাশয়কে একটি কথা, একটি পরামর্শও জিজ্ঞাসা করে না। ভাল, কেমন তার হাকিমী, কেমন তার পরামর্শ দেখা যাইবে।

ডাকঘরের কার্য পরিদর্শনাভিপ্রায়ে অদ্য ডাক্তার ইট্‌ওয়াল্‌ সাহেব আগত-প্রায়; তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, জজ লুসুল্‌ সাহেব সকল কথা শুনিবেন। একজনের মনোবাদ সোণা, আর এক জনের বিদ্বেধ সোহাগা—মাস্টারবাবু ও ডাকমুন্সী মহাশয়ের গল্প শেষ হইল—পরস্পর হস্তস্পর্শ করিয়া বিদায় হইলেন—পরক্ষণেই একজন হরকরা আসিয়া কহিল, সাহেব বাহাদুরের ঘোড়া নদীর বাঁধের উপর দেখা গেল।

সাহেবের নাম শুনিবামাত্র ডাকমুন্সী মহাশয় পার্শ্বস্থিত ডাকবাঙ্গলায় উপস্থিত হইলেন। আজ ডাকবাঙ্গালা পোষাকী বেশ পরিয়াছে. সকল দ্রব্য মার্জিত; দেওয়ালে খানসামা সাহেব পান চিবাইতে চিবাইতে শ্লেষ্মা বর্জনে যে চিত্রবিচিত্র অঙ্কপাত করিয়াছিলেন, বাখারির কলমের আঘাতে ডাকমুন্সী মহাশয় যে থামের চূণ খসাইয়া পানের ঝালের লাঘবতা সম্পাদন করিয়াছিলেন. তাহা সকল সংস্কার হইয়াছে, সকল শ্বেত খড়িতে মার্জিত হইয়াছে. বড় মেজের উপর শুভ্র চন্দ্রজ্যোতির ন্যায় চাদর বিছান হইয়াছে, বেলওয়ারি বাসন. চীনের প্লেট, গিল্টির জলে আজ খানার কামরা ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে, দ্বারে দুইটি পূর্ণ কলসী ও কলার গাছ রোপণ করা হইয়াছে, টেবিলের উপর গরম ডবল ডিসে বড় হাজরির জাতিবিনাশিনী পিরিলিকুলকলঙ্কিনী ভ্যাপ্সা গন্ধ বিস্তার করিতেছে। খানসামার বয়স প্রায় অশীতি বৎসর, গৌরবর্ণ. গোলাম আলি, দন্তগুলি পরিষ্কার ফাঁক ফাঁক, পরিধানে অতি শুভ্র চাপকান, তাহার বামপার্শ্বে শ্বেতলোমবিকীর্ণ বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিদংশ দেখাইয়া ও উপর হই: প্রচুর শুভ্রশ্মশ্রুকেশরাশি দোলাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, মাথার পাগড়ি বন্ধনে ৩০ গজ মলমল পর্য্যবসিত হইয়াছে--হাতে একখানি মান্দ্রাজি রুমাল ও বগলে একটি সার্টিফিকেটের তাড়া লইয়া আছেন; আবশ্যক হইলে আপন কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত। এই তাড়ায় ভারতবর্ষের নব পুরাবৃত্ত পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ হইতে পঞ্জাব অধিকারের সময়তালিকা এই তাড়া হইতে নির্ধার্য হইতে পারে—উহা পাঠ করিলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের পুরাবৃত্ত, বা বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস সংগ্রহের পরিশ্রম লাঘব হইতে পারে—সার চারলস্‌ দুইটি মাত্র আধপোড়া চিকিন ভক্ষণ করিয়া এই পথে সিন্ধুযাত্রা কোন কালে করেন, প্রথম নেটিব ইঞ্জিনিয়ার বৈকুণ্ঠবাসী

বেচারাম হালদার মহাশয় স্বাধীন বিভাগের ভার কোন সময় প্রাপ্ত হন, ও কোন দিনে সার কলিন কেম্বেল মিউটিনি নিবারণ জন্য মরিচমিশ্রিত অলোণা কাঁচা আণ্ডা ৫ গণ্ডা আহারান্তে এই পথে প্রয়াগদুর্গে গমন করেন, সকল তারিখ এই তাড়া হইতে স্থির হইতে পারে। কোন্ সাহেব কি খাইতে ভাল বাসেন ও কোন্ বাবু প্রথমতঃ হিন্দুধর্মনিষিদ্ধ দ্রব্য ঐ হাতের গুণে নিজগ্রাসে গ্রহণ করিয়া আনন্দলাভ করেন—সকল কথা গোলাম আলি বলিতে পারেন। কিন্তু আপাততঃ গম্ভীর প্রকৃতি ধীর লোকের ন্যায় সম্পূর্ণ ভক্তি-সহকারে ডাক্তার সাহেবকে একটি সেলাম করিবার আশয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়া-ছেন।

ইতিমধ্যে অশ্বপদের দড়বড়ি শব্দ শুনা গেল, ও পবক্ষণেই ঘোড়া বারাসতের মধ্যে দেখা দিল, একজন বেহারা কহিয়া উঠিল "ওঃ! তীর আসছে!" সাহেবকে দেখা যায় না কেবল অশ্বপৃষ্ঠে একটি ক বর্গের পঞ্চম অক্ষর ঙ ঠাকুরের ন্যায় মস্তকে বৃহৎ টুপিধারী পাদদ্বয় সম্মুখভাগে হেলান দেখা যাইতেছে, চতুষ্পদের ঘর্ষণে ধূলা রজ্জুপাকের ন্যায় ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছে। কথা কহিতে কহিতে গাড়ির বারান্দায় ঘোটক উপস্থিত, সাহেব বাহাদুর চকিতে অবরোহণ করিলেন, সেলামের উপর সেলাম চতুষ্পার্শ্ব হইতে বর্ষণ হইল। সাহেব বাহাদুর কেবল টুপিটি চকিতমাত্র উঠাইয়া বৃহৎ মস্তকের টাক সকলে দেখিতে না দেখিতেই আবার টুপি মাথায় রাখিলেন, কারণ সরদির ভয়ে সাহেব টুপি খুলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বারেণ্ডা হইতে সোপানের দিকে দেখিলেন ও পূর্ণবাবুকে ইঙ্গিত করিয়া "ওয়েল" "Well" মাত্র কহিয়া দ্রুতপদে কামরায় প্রধান চৌকিতে উপবিষ্ট হইলেন—পাখা অমনি শন্ শন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

ডা, সা। All right with you, Purna ? (সব ভাল ত পূর্ণ ?)

পূ। Sir, Master, your blessing (হুজুর, খামিন্দ! আপনার আশীর্বাদ।)

ডা, সা। My blessing!

পূ। You master! you are my most obedient servant. এখন পূর্ণবাবু বিহ্বল হইয়াছেন, কি বলিতে কি বলিলেন, ও কহিয়া উঠিলেন forgot, forgot sir—!

ডা, সা। Am I your most obedient servant ?

পূ। No sir.

ডা, সা। No sir.

পূ। তবে Yes sir.

ডা, সা। I am your most obedient servant, either you or I must be a fool.

পূর্ণ। Both, my Lord.

সরলচিত্ত ডাক্তার সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ণবাবুর ইংরেজি বিদ্যায় যতদূর ব্যুৎপত্তি তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু খুঁট আখরের প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল, তাঁহার কার্যবিভাগ ঐরূপ খুঁট আখরেতেই পরিপূর্ণ ছিল, ও যখন বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় পত্র পাইতেন, নিশ্চয় জানিতেন, তাহা অপর হাতে লিখিত। পূর্ণবাবুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া আবার কহিলেন, "What's the news" খবর কি?

পূ। খবর—Sir Ghost's father's verb done! (ভূতের বাপের শ্রাদ্ধক্রিয়া হইতেছে।)

ডা, সা। What do you mean?

পূ। The cake of Udo on the neck of Budo. (উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে) Horses evil on monkey's neck (ঘোড়ার বালাই বানরের ঘাড়ে।) পূর্ণবাবু এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া দেখিলেন, সাহেব তাহার অর্থসংগ্রহে অক্ষম; তখন খানসামাকে ইঙ্গিত করিলেন. সে বাহিরে গেল কিঞ্চিৎ নিম্নস্বরে গাঙ্গুলি মহাশয় ডাক্তার সাহেবের নিকট নাজিরের অত্যাচার ও গজাননের ফেরেপি বুদ্ধি ও জালকন্যা সাজাইবার অভি-সন্ধি সমস্ত ব্যক্ত করিয়া দিলেন, ও যাহাতে তাহা জজ সাহেব বাহাদুরের কর্ণগোচর হয় তাহাই যাচ্ঞা করিলেন। ডাক্তার সাহেব কেবলমাত্র কহিলেন, "এ সকল অনধিকারচর্চ্চা, তোমাদের সমাজে এ সকল মিথ্যা রচনা অভ্যাসের কর্ম, বিশেষ এ বিষয়ের বিচার পরে জজ সাহেবের নিকট হইতে পারে, তাঁহাকে পূর্বাহ্নে কোন কথা জ্ঞাত করান সঙ্গত হইতে পারে না"—এই সময় পকেট হইতে ঘড়ি লইয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "Hang them!" আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত—নগরে আপন কুটীতে পেঁহুছিতে হইবেক। জজ সাহেবের মেমের সহিত খানা খাইতে হইবেক—"বহি লাও। বহি লাও।" তিলেক সময় মধ্যে আফিসের পুস্তকসকল আসিল; ও কোন রেজিস্টারির উপরি-ভাগে, কাহার তলদেশে, কাহার মধ্যদেশে, যেখানে প্রথমে হাত পড়িল প্রায় দুই মিনিট মধ্যে শত স্বাক্ষর ছড়াইয়া পরিদর্শনকার্য সমাপ্ত করিলেন ও থাম মেরামত দেখিয়া এবং পূর্ণবাবুর দন্ত ও ওষ্ঠাধর খদিররাগ-বিবর্জিত দেখিয়া "I am satisfied" (বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি) কহিলেন। পরক্ষণেই কাঁটা ছুরী অস্ত্রধারী হইয়া খানসামার প্রতি ইঙ্গিত করিবামাত্র ডিসের ঢাকুনি খোলা হইল, ও কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি আরম্ভ হইল। প্লেট হইতে ধূঁয়া উঠিতে আরম্ভ হইল, পূর্ণবাবু দুই নাকে দুটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। "You eat nothing? your stomach very small sir!" (মহাশয় কিছুই খান না, এতটুকু পেট!)

ডা, সা। Can you eat more of this meal.

পূ। Ram Ram, sir, my caste go, I worship stone every day.

(রাম রাম! জাত যাবে, আমি প্রতিদিন শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকি)—but say "rice."—two seers every time, mind sir, I am old.

ডাক্তার সাহেব চা ও জল ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য পান করিতেন না—কহিলেন, "এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্নিগ্ধ বরফবারির তুল্য আর উপাদেয় কি আছে?"

পূ। তপশি মাছ আর আম বড় মন্দ নহে। মদ্যপান ডাক্তার সাহেব সর্বদা নিষেধ করিতেন। অতএব কহিলেন, "মদেই তোমার দেশ ডুবিবে।" পরে আহার সাঙ্গ করিয়া সাহেব বড় প্রফুল্ল হইলেন, অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন ও কহিলেন, "আমরা আহার করিয়া নিদ্রা যাই না। Well Gangooly what do you want?"

পূ। I want, thank sir, nothing sir, but pension next October and—

ডা, সা। And what? (এবং কি?)

পূ। My son well learned English, missionary School Daff sahib scholar, Inspectori wants.

ডা, সা। I shall see what I can do for him, Purna, I give you no promise.

তখন সাহেবরা অনুগত লোক প্রতিপালনে সর্বদা সুখী হইতেন।

পূর্ণবাবু সেলাম করিলেন। সাহেব দুটি মাত্র আধপোড়া পক্ষী রুমালে বাঁধিয়া পকেটে ফেলিলেন। পথে টিফিনের উদ্যোগ রহিল, পরক্ষণেই বারেন্দায় আসিলেন। খানসামার হস্তে ঝনাৎ করিয়া মুদ্রা দিবামাত্র অশ্বারোহী হইলেন, আবার ক্ষণমধ্যে অশ্ব ধাবিত হইল।

দ্বিতীয় আড্ডায় ঘোড়া প্রস্তুত আছে, কি না, পূর্ণবাবু তাহাই চিন্তা করিতে করিতে সাহেবের ঘোড়ার গতি সর্বাগ্রে দেখিতে লাগিলেন। ঘোড়া দৌড়িতে দৌড়িতে ক্রমে দূর গগনে পাখি, পরে বর্তুলসম, পরে কাল বিন্দুসম, কাল মেঘে প্রান্তরশেষে মিশিয়া গেল। পূর্ণবাবু কি ভাবিয়া "হরিবোল" কহিয়া উঠিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বেসবারী

গজানন ব্যয়কুণ্ঠ। পয়সাটি যার ব্রহ্ম, সুখদ পদার্থ তাহার চক্ষের শূল। যাহাতে প্রকৃতির সৌন্দর্যবৃদ্ধি, যাহাতে শিল্পের শ্রীসাধন, যাহাতে বিজ্ঞানের উন্নতি, যাহাতে মানবের শক্তিবৃদ্ধি তাহা কৃপণের অসাধ্য ও অসহ্য। নৃত্যগীতে যাহারা আসক্ত তাহারা গজাননের পরম শত্রু। সাধারণ প্রমোদের চিহ্ন-

মাত্র তাঁহার ক্রোধের কারণ। কোথাও তাসযোড়া দেখিলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, শতরঞ্চ বা পাশা খেলার আয়োজন দেখিলে বলের থলিটি পর্যন্ত তাঁহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিতে দেখা গিয়াছে। কাহারও তানপুরা দেখিলে তারটি খুলিয়া রাখিতেন ও আবশ্যকমতে আপনার জীর্ণ দন্ত বান্ধাইতেন। তাঁহার ভয়ে গানবাজনা অতি সংগোপনে করিতে হইত; কেবল ঢোল ভাঙিগয়া দিতেন না, তবলার ছাওনিটি ছুরি লইয়া কাটিয়া দিতেন না, তাহার চর্মতন্ত্রী খুলিয়া লাঙগলের যুয়ালে লাগাইতেন ও যার ঘরে বৈঠকি গীত হইয়াছে শুনিতেন, তাহার সঙিগন জরিমানা লাগাইতেন ও স্ত্রীলোক হইলে গোপনে উত্তম মধ্যম দেওয়াইয়া গ্রামত্যাগিনী করাইতেন। কোন ব্রাহ্মণযুবার স্কন্ধে অনেকগুলি যজ্ঞসূত্র দেখিলে লাম্পট্য-চিহ্ন জ্ঞান করিতেন ও ক্রোধভরে কাঁচি দিয়া অর্ধেক কাটিয়া ফেলিতেন।

এই সকল কারণে সুন্দরী গোপিনী গজাননের বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন না, কিন্তু প্রজাবৎসল আশুতোষবাবুর আশ্রয়ে সুন্দরীর বাস। আশুবাবু গুণরাশী হইলেও তাঁহার দুই একটি বিলক্ষণ মনোভ্রান্তি ছিল। তিনি সৌন্দর্যপ্রিয়। প্রকৃতি মধ্যে হউক, ঊষার গগনে বা হরিত পল্লবক্ষেত্রে বা নীলিময় জলস্রোতমিশ্রিত চন্দ্রকিরণে বা চন্দ্রমুখীদের চন্দ্রবদনে বা বিচিত্র চিত্রপটে বা প্রস্তরময় প্রতিমূর্তিতে বা কবিতাকলাপে, যেখানে হউক, কমনীয় সৌন্দর্য দেখিতে পাইলেই তাহাতেই তাঁহার পক্ষপাত দৃষ্টি হইত, যাহাকে ভালবাসিতেন তাহার শত দোষ থাকিলেও অন্ধ, এই তাঁহার লোকানুরাগের এক কারণ। তিনি গুণই দেখিতেন এবং এই গুণগ্রাহিতা জন্য তিনি অভাগিনী সুন্দরী গোপিনীর নিকট যোগী ঋষি হইতে ভক্তিভাজন ছিলেন। তাঁহার নামের দোহাইয়েই গজানন সকল কার্যে সুসিদ্ধ হইতেন, অদ্য সন্ধ্যার পর সেই নাম উচ্চারণ করিয়া গজানন সুন্দরী গোপিনীর দেখা পাইয়াছেন।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টি করিলে নিকটের বৃক্ষকায়াগুলি ঘনীভূত অন্ধকারে চাপ মাত্র বোধ হইতেছে। আকাশের উপর একটি ঘন মেঘখণ্ড মন্দ মন্দ গতিতে উড়ে যাইতেছে। আলোকের পরিচয় দিতে কেবল খদ্যোতিকার দীপ্তি, শব্দের পরিচয় দিতে শত শত ভেককণ্ঠনিঃসৃত সপ্ত গ্রাম, মধ্যে মধ্যে একটি কট্ কট্ শব্দ হইতেছে, যেন ভূতদলে বর্ষায় বাতের আশঙকায় অঙগচালনা করিতেছে আর হাড় মটকাইতেছে। এমন রাত্রে কি অবলা স্ত্রীলোক ঘরের বাহির হয়? তবু আশুবাবুর নামে ও দেওয়ানজীর ভয়ে একটি ভৃত্যসহ সুন্দরী গোপিনী দোতালার উপর একটি ক্ষুদ্র কামরায় গজাননের নিকট আসিয়া উপস্থিত। গৃহের এক কোণে একটি বাঁশের ছেঁচা-নির্মিত ঘেরার মধ্যে এক তাল গোময়ের উপর এক নির্বাণপ্রায় ক্ষীণপ্রভা মিহি পলিতা দীপ্তিমান্। দীপটি মিটমিট করিতেছে। গজানন একটি ক্লিষ্ট তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন ও মধ্যে মধ্যে দংশনজ্বালায় বজ্জাত ছারপোকাকুলের উপর তম্বি করিতেছেন। পার্শ্বে নীলমণি—তাঁহার প্রাণাধিক

নীলমণি—শয়ন করিয়া একটি একটি কথা কহিতেছে। গজানন কহিতেছেন, "ও বাপ্‌, রাত্রি হ'ল, বাড়ী চল, ঘুমাও, ব্যাম হবে।"

নী। কি বাবা? জ্বর?

গ। বালাই! অমন কথা বলতে নাই। তুমি না ঘুমাও, চুপ করে থাক।

নী। কেন বাবা চুপ করলে জ্বর হয় না।

সুন্দরী নিকটে বসিয়াছিল। কহিল, ক্ষেপা ছেলে!

নী। হুঃ তুই ক্ষেপি—

সু। অমন কথা বলতে আছে? আমি—তোমার—

নী। কে, খুড়ি?

সুন্দরী কহিল, খুড়ি হ'লে কি তোমার বাপের কাছে আসি।

নী। তবে কি পিসি? বাবা! টুমি বাপ না জেঠা—জেঠা ছিলে কি করে বাপ হলে?

গ। তা নয় ক্ষেপা, ও দিদি হয়।

নী। ঠাকুরুণডিডি?

এই কথা কহিতে কহিতে প্রদীপ নির্বাণপ্রায় হইল। গজানন কহিল, "ওরে উসকাইয়া দে।"

নীলমণি কহিল, "নিবে যায় ত বেশ হয়, সকলের ঘুম হবে—"

সুন্দরী কহিল, "তোমার পিতাঠাকুরের যে প্রদীপ, নির্বাণ, দীপ্তিমান্, উভয় সমান—"

নী। আমি বড়লোক হই—পিডিম ভেঙ্গে বাটি লণ্ঠন জ্বালাব।

গজানন অমনি সজলনয়নে কহিলেন, "কে বলে এর বুদ্ধি নাই। রঘুবীর করুন তুমি বড়লোক হবে।"

কথা কহিতে কহিতে নীলমণির তন্দ্রা আসিল। সুন্দরী কহিল, "আমাকে কেন স্মরণ করিয়াছেন?"

গজানন কহিলেন, "পারবি?"

সু। আমি কি না পারি? কারও যোগ ভঙ্গ করিতে হইবে?

গ। তা নয়, ভ্রম দর্শাইতে হইবে। সেই যে কথা সে দিন বলিয়াছি, কাদম্বিনী সাজিতে হইবে।

সু। কি মেঘমালা? কারও গলায় কি জড়াইতে হইবেক?

আজ গজানন রসিক হইয়াছেন, তাঁহার কেবল কেটো রস কার্যসিদ্ধির পন্থা—কহিলেন, "জড়াও ত হাকিমের গলায়।"

সু। ও মা জাত যাবে! সে যে গোখাদক! ও হরি!

গ। এখন যে কথাগুলি বলছি বুঝেছ কি না? বুঝ ত বল, না বুঝ তাও বল—বল গো বল।

সু। সব বুঝিছি, কাপড় আর অলঙ্কার চাই।

আমাকে নীলমণি "জটা ডাডা" বলিয়া বড় ভক্তি করে! আমি তার পাশে শুইয়া এতক্ষণ কপটনিদ্রায় ছিলাম। এখন কহিয়া উঠিলাম, "সুন্দরীর কাপড় আর গয়না আর সোণা।" আমার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল ও কহিল, "গঙ্গাদাদা! ঘুমাও নাই? যে আমায় সোণা দেয়, গহনা দেয়, আমি তার; তুমি দিবে?"

আমি কোন উত্তর দিবার পূর্বেই সুবুদ্ধিমান্ নীলমণি ভবিষ্যদ্বাণীর স্বরূপ কহিল, "ডিডি! আমি দিব।"

গজানন কহিয়া উঠিলেন, "ক্ষেপা ছেলে।"

নীলমণি আবার কহিল, "আমার যে দু টাকার ডুয়ানি আছে—টোনা খরিদ করব।"

আমি কহিলাম, "ভাই নীলমণি, দুই টাকায় কটা দুয়ানি হয়?"

নী। সাড়ে নয়টা—জটাডাডা।

গ। ভীমে মাস্টারতা অতি বেল্লিক, শিখাইবার প্রণালী আদৌ জানে না।

সু। একটা বন্দোবস্ত করুন—আমার কাপড় অলঙ্কার?

গ। সব প্রস্তুত।

সম্মুখে একটি হাতবাক্স ছিল। দুইটি গিল্টির বাগ্‌মুখো চক্‌চকে বালা দেওয়ানজী সুন্দরীকে দিলেন। সেও সঙ্গে সঙ্গে পরিল ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আবার একটি পার্শ্বস্থিত বস্তা হইতে একখানি শাড়ি ও উড়ানি ও পাদভূষণ পশ্চিমে পাঁইজর সুন্দরীকে দেওয়া হইল।

সুন্দরী বারেণ্ডর দিকে গেল। মুহূর্ত মধ্যে বেশ পরিবর্তন করিয়া রাজপুতানী কাদম্বিনী হইয়া প্রবেশ করিল। বাস্তবিক তাহাকে তাদৃশ রাজপুতানীর মত দেখাইত না, সে তাদৃশ গৌরাঙ্গী স্থূল উন্নতকায় নহে। তাহার আঁখির ও ভ্রূযুগলের ভাবভঙ্গি সেরূপ প্রশস্ত পরিমাণের নহে; সে উজ্জ্বল-শ্যাম, কৃশাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, পঞ্চদশবর্ষীয়া বঙ্গ গোপকন্যা মাত্র; তথাপি যেদিন হইতে সে রাজপুতানী সাজিল, সেই দিন হইতেই তাহাকে ঠিক রাজপুতানী বলিয়াই অনেকে দেখিতে লাগিল, ও গ্রামে দুই একটি বৃদ্ধ লোক ভ্রূ উত্তোলন করিয়া কহিতে লাগিল, "না হবে কেন, এ কে জান?" আর এক বৃদ্ধ কহিল, "এ বাবুর বাটীর জমাদার ভবানী সুকুলের ঔরসজাত কন্যা, সেইজন্য ও কেমন লোচ হিন্দিতে কথাবার্তা কহে শুনেছ?" এখন সজ্জা পরিবর্তন করিয়া গজাননের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র গজানন কহিলেন, "বেশ সেজেছ—সুন্দরি!"

সুন্দরী কহিলেন, "এ আপনার ভ্রম—আমি কাদম্বিনী।"

নীলমণি কহিয়া উঠিল—

"ডিডি! তুমি জান কত রঙ্গ,
ধানভান, চিঁড়ে কোট—
বাজাও মৃডঙ্গ।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
প্রেম-বিকার

শ্রীনগর ও শান্তিপুরের প্রান্তরের মধ্যে বেগবতী ক্ষুদ্র নদীর কূলদ্বয় শরদাগমে আজকাল রমণীয় শ্রী ধারণ করিয়াছে। উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হরিত-ময় শস্যক্ষেত্রে শিখাপরিপূর্ণ শস্যদল নিরন্তর ঊর্মিবৎ হেলিতেছে, দুলিতেছে, চকিত মাত্র আলোকচ্ছায়া শন্‌শন্‌ করিয়া হরিত পল্লবের শয্যোপরি বেগবান্‌ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রগাঢ় পীতবর্ণ শণকুসুম শস্যক্ষেত্রের উপর শিরো-ত্তোলন করিয়া শরৎ বায়ুতে আন্দোলিত হইতেছে, আবার কোথাও দুই একটি ক্ষেত্রে উচ্চ উচ্চ পাট-বৃক্ষশিরে তীক্ষ্ম ষট্‌কোণ পত্রসমূহ বায়ুশ্বাসে উল্টাইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষেত্রের প্রান্তরে বহুদূরবিস্তৃত নীল জলাশয়, শ্বেত রক্ত শতদলে পরিপূর্ণ, নীলবসনা মহীর স্বচ্ছ উরসে আভিগয়া সদৃশ দৃশ্যমান। এই সরসীর পার্শ্বে আশুতোষবাবুর বিস্তৃত "রমণা" কাননের পাকা প্রাচীরপরিধি দেখা যাইতেছে। রমণার কোন অংশে ফলের উদ্যান, কোন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বদেশী বা বিদেশজাত বহুল পুষ্পতরুতে শোভমান। আবার কোন স্থল শত শত ক্ষুদ্র ফুলের বীজভূমি; শরৎ-জলে ধৌত হইয়া সকল বৃক্ষের সকল পত্রের সকল পুষ্পেরই রং নবভাব প্রাপ্ত, শরদা-লোকে সকলই কমনীয়। উদ্যানের নৈঋত কোণে একটি পুষ্করিণীর তটে একটি শ্বেত অট্টালিকা শোভমান। তাহার ছায়া স্বচ্ছ সরোবর-বক্ষে নতশিরে কাঁপিতেছে, আজ বর্ষাজলসিক্ত শারদ মেঘদল আকাশের মধ্যভাগ ত্যাগ করিয়া বহু দূরে, প্রান্তরে, বৃক্ষশিরে শয়ন করিয়া যেন সূর্যকিরণে অংগ বিশুষ্ক করিতেছে। আকাশের মধ্যদেশ নির্মল, নীলিম, স্বচ্ছ স্ফটিকের কটাহের মত উদ্যানের উপরিভাগে চাপিয়া বসিয়াছে। অট্টালিকার যেদিকে পুষ্করিণী তাহার অপরদিকে সোপানশ্রেণীর পাদদেশ হইতে একটি কঙ্করনির্মিত বিস্তৃত পথ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে ও বহুদূরে একটি সুরম্য ঝিলের উপর কাষ্ঠনির্মিত সেতুর সংগে মিলিত হইয়াছে। সূর্যদেব আজ প্রাতেই কোমল রশ্মিতে নির্মল আকাশ, উচ্চ বৃক্ষের পল্লবদল, অট্টালিকার কাচদ্বার, শ্বেত শতদল, রাংগা পদ্ম, রাংগা জবা, শেফালিকা, কৃষ্ণচূড়া, হাস্যমুখী স্বামি-সোহাগিনী সূর্যমণি, নানাজাতীয় গোলাপ, নবদূর্বাদল, জলজ পুষ্প উজ্জ্বল করিয়াছেন। বর্ষা শেষ হইল এমনি বোধ হইতেছে, কারণ, বায়ুতে হিমানুভব হইতেছে ও দূর্বাদলে শিশিরবিন্দু দেখা যাইতেছে। প্রিয় ভৃত্য ভৈরব, আশুতোষবাবুর মাথার উপর রাংগা সাটিনের ছাতাটি হেলাইয়া ধরিয়াছে, ঝালর ঝলমল করিতেছে, আশুতোষবাবু একটি ক্ষুদ্র কাঁচিহস্তে ইতস্ততঃ বৃক্ষপরিদর্শনে যথার্থ প্রভুশ্রী ধারণ করিয়া পাদচালনা করিতেছেন ও কর্তব্য-বিমূঢ় মালিগণ আসিলে যে কয়েকটি কথা কহিবেন, তাহা ভাবিতেছেন। ইত্যবসরে খঞ্জ ভীমকে বাগানের লম্বমান পথে আসিতে দেখা গেল। আমি

বৈঠকখানার একটি গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি। শনৈঃ শনৈঃ তালে তালে খঞ্জপদ চালাইয়া বাবুমহাশয়ের সম্মুখে আসিলেন ও নমস্কার করিলেন।

"কি হে ভীমচন্দ্র" বলিয়া আশুতোষবাবু সম্ভাষণ করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার কহিলেন, "এত চঞ্চলচিত্ত, মলিনমুখ কেন?"

খঞ্জ ভীম কহিলেন, "মনের কথা কখন আপনাকে কহিতে ভীত নহি। আমার ধর্মনীতি সমুদয় মহাশয় পরিজ্ঞাত। 'ব্রাহ্ম ধর্ম' অবলম্বন করিয়া আমার জাতিভেদের প্রতি যে বড় ভক্তি নাই, তাহাও মহাশয় জানেন, আমি যে সুন্দরী গোপিনীতে অনুরক্ত তাহাও মহাশয় শুনিয়া থাকিবেন। তাহার সুনীতি ও সতীত্ব রক্ষাহেতু আমি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। তাহার জন্মদাতা কনৌজিয়া শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাহার নিজের প্রকৃতি বিশুদ্ধ। এখন কিশোরী সুন্দরী গোপিনী সদ্যোজাত বনকুসুমের স্বরূপা, পবিত্রা ও নির্মলা। কি কহিব! দেওয়ানজী মহাশয়ের ষড়যন্ত্রে সেই সুন্দরী গৃহত্যাগিনী হইয়া যবনধর্মানুসারী নাজির সাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অবশেষে লোভ-পরায়ণা হইয়া ভ্রষ্টা হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমার পরিণয়ের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত দেখিতেছি।" শেষোক্ত কথাগুলি কহিতে কহিতে খঞ্জ ভীমের চক্ষে জল আসিল।

আশুতোষবাবু ভাবিলেন, এ এক প্রকার বায়ুগ্রস্ত লোক, এবং বিয়ে-পাগলা শীতু ক্ষেপাকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, "এ বিবাহের ফল কি?"

খঞ্জ ভীমচাঁদ উত্তর দিলেন, "আমার অতি আনন্দের শুভদিন যে, মহাশয়ের মত মহদভিপ্রায় মহাজন এ কথার জিজ্ঞাসু হইলেন; কিন্তু এই আক্ষেপই ত নিতান্ত শোচনীয়, যে আপনারা একবার দেখেন না যে, জাতিভেদে কি অনিষ্টপাত হইতেছে, পরিশুদ্ধ প্রীতির পথে কি কণ্টক রোপিত হইয়াছে—আমাদের ইংরেজি পুস্তকে একটি কথা রহিয়াছে, 'সুশিক্ষা হইতে সুদৃষ্টান্ত ভাল।' আমি বলি কুলীন কন্যাপেক্ষা বিধবা কন্যা বিবাহ করা ভাল, তাহা করিলে কত উন্নতি লাভ হইতে পারে।—আমায় বাঙ্গাল বলুন আর যাহাই বলুন, তবু আমরা সভ্য—ব্রাহ্মসমাজ করেছি, বিধবা ভাদ্রবধূর বিবাহ দিয়াছি, আমরা দেশের ভদ্র স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়াছি, কত-বার সভ্যতার পরিচয় দিয়াছি, এখন আবার আর একটি শ্রেয়স্কর দৃষ্টান্ত সকলকে দেখাইব। জাতিভেদ যে মন্দ তাহা কেবল মুখে না কহিয়া এক্ষণে কার্যে তাহার অসারতা দেখাইব এবং আশা করি, আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপরে উৎসাহিত হইবে। কেবল রিফরমার কথায় হয় না।"

আশুতোষবাবু কহিলেন, "শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ কার্য হঠাৎ করা কি ভাল? চরম ফল কি হইবে?"

"মহাশয় এ কার্য প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিরুদ্ধও নয়। শাস্ত্র শাস্ত্র কি? আপনি যা চালাইবেন, তাই চলিবে, আপনার বাক্যই শাস্ত্র —আপনি কি বৈষ্ণবীর সহিত গরিব ব্রাহ্মণের বিবাহ দেন নাই? আবার

তাহাকে জাতিতে তুলেন নাই? আপনি চালাইলে সকলই চলিতে পারে, মহাশয় পতিতপাবন।"

আশুতোষবাবু কহিলেন, "এ কথা বিবেচনাধীন, সুন্দরীর কি বিপদ?"

খঞ্জ ভীম নিম্নস্বরে আশুতোষবাবুকে কি কথা কহিলেন, শুনিতে পাইলাম না; কিন্তু বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র মুন্‌সির নিকট কি এক আদেশ লইয়া এক হরকরা দ্রুতপদে চলিল। এদিকে তর্কালঙ্কার মহাশয় ও রঘুবীর আসিয়া উপস্থিত হইল। তর্কালঙ্কার মহাশয় কাশীর নস্য প্রচুররূপে প্রশস্ত নাসারন্ধ্রে যেন জোড়ানলী বন্দুকে বারুদ ঠাসিতেছেন মধ্যতর্জনীর অর্ধেক প্রবেশ করিতেছে অথচ নস্য তেজোহীন হইয়াছে, বর্ষায় জলসিক্ত হইয়াছে, কহিতেছেন।

রঘুবীর একটি শুভ্র রেকাবিতে শুভ্র রুমাল ঝাঁপিয়া কি দ্রব্যহস্তে বাবুজি-মহাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া সসম্মান মূর্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইল। দ্রব্য-গুলি কি আমি জানিতাম, আমি স্বস্থান হইতে আরও অন্ধকার স্থানে লুক্কায়িত হইলাম।

আশুতোষবাবু প্রথমতঃ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বর্ণ-সঙ্করের বিবাহ কতদূর শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তাহারই বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। তর্কালঙ্কার তদুত্তরে বিশুদ্ধ জাতির সহিত বিশুদ্ধ জাতির বিবাহ ভিন্ন অপর সমস্ত বিবাহ পশুবৎ বা পৈশাচিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। আশুতোষবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "শাস্ত্রসকল অনুসন্ধান করিলে কোন বিষয়ের বিধান প্রাপ্ত না হয়?"

রঘুবীর কহিয়া উঠিল, "হুজুর, বড় দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তা আর এ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুঁথি কামধেনু, আমার মোকদ্দমায় বড় উকীল সাহেব রকম বরকম আইন বাহির করে আমায় খালাস দিলেন, সুগন্ধিবাবুও ষ্টম্বর-কাগজে খুব মোসাবেদা করেছিলেন। সাহেব শুনিলেন আর কহিলেন, 'রঘু নির্দোষী—খালাস।' বাবাঠাকুর মাস্টারবাবুকে উদ্ধার করিবেন?"

তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন, "হ'তে পারে—অনেক বিষয়ই যুক্তির উপর নির্ভর।"

রঘু কহিল, "আর দক্ষিণার উপর।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় গর্জন করিয়া উঠিলেন ও চর্মপাদুকা গ্রহণ করিতে-ছিলেন, কিন্তু নাসের শম্বুক ভূমে পতিত হওয়ায় নস্য ছড়াছড়িতে বস্ত্র তাম্রবর্ণ হইল।

আশুবাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বিধানানুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন ও রঘুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ভূমে একটি থালি রাখিয়া রঘুবীর নজর দান করিল।

আশু। এ কি?

রঘু। মোকদ্দমা জিতে ঘরে আসিয়াছি। প্রভুর জন্য যৎকিঞ্চিৎ নজর আনিয়াছি। ফল মাত্র—

ভৈরব রুমাল উঠাইল ও কহিল, "এই তোমার এলাইচদানা—আর বেদানা!" এদিকে ঢাকুনী উঠাইতেই রেকাবের একাংশ হইতে ফর ফর করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত কাঁচপোকা থালা হইতে উড়িয়া গেল; আর এক পাশে বিলাতী ঘেটুবৃক্ষের নব নব রাঙ্গা কুসুমগুলি মাত্র রহিল।

আশু। এ কি?

রঘু। এ ঘেটুফুল আর কাঁচপোকা অনেক যত্নে জমা করিয়াছিলাম, প্রভু, পোকাগুলি মারিয়া আনিয়াছিলাম, বাতাসে বাঁচিয়া উঠিল।

আশু। এ কি তামাসা?

রঘু। আজ্ঞা না, উভয় দ্রব্যই ত হুজুরের প্রিয়। এই বিলাতী ঘেটুফুল যাহাকে হুজুর বেদানা কহেন। এ ক্ষুদ্র কাঁচপোকা যাহাকে বড়লোকে এলাইচ-দানা বলেন।

আশু। এ শিক্ষা তোরে কে দিলে?

রঘু। জটাধারী। এখন হুজুরের মর্জি হয় ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের টোলে পাঠাইয়া দিই। এ ত পক্কান্ন নয়, ইহায় কোন দোষ নাই—বাবু মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিলেন, এই সময় এক জন অশ্বারোহী পুরুষ দড় বড় করিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীযুত মহাশয় একখানি পত্র পাইয়া পুনরায় তাহার হস্তে অর্পণ করিবামাত্র অশ্বারোহী আবার বেগে উদ্যানের বৃহৎ দ্বার হইয়া বহির্দেশে ত্বরিত গমন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
বিয়ে-পাগলা শীতু

রমণা কাননের বৈঠকখানার হল-কামরায় আশুবাবু বসিলেন। পাখা শন্ শন্ শব্দে দুলিতে লাগিল, সেই শব্দ বাহিরে ঝাউগাছের উচ্চ উচ্চ পত্রশীর্ষে সাঁও সাঁও শব্দের সহিত সম্মিলিত, এক একবার বাতাসের ঢেউ কামরায় প্রবেশ করিয়া বেলওয়ারি লণ্ঠন, ঝাড়, দেওয়ালগিরি আর গিল্ড লেম্পের স্ফাটিক ঝালরে সংস্পর্শনে সুমিষ্ট বাদ্যের তরঙ্গ উঠাইয়াছে, এই সময় ইঙ্গিতমাত্র একটি ভৃত্য বিলাতী বাজার বাক্সের কল ঘুরাইল, অমনি সুমিষ্ট বাদ্যতরঙ্গ ঝলকে ঝলকে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। পাখার শন্ শন্, ঝাড় লণ্ঠনের ঠন্ ঠন্, ও আরগিনের সঙ্গীত মিলিয়া এক সুমিষ্ট রাগিণী উত্থিত হইল। সকলেই কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ, এমন সময় দূরে ঝিলের উপর কাষ্ঠ-নির্মিত সেতুর রেলে ঠেস দিয়া শীতু ক্ষেপা সুকণ্ঠ হইতে একটি গ্রাম্য গীত ছাড়িয়া দিল।

অতি সামান্য গীত—কিন্তু সময়গুণে মিষ্ট লাগিল।

সদা, ববম্, ববম্, ববম্, বাজায় ভোলা গাল।
ভাঙে ভোর, নেশায় ঘোর,
আবার ভাং, ভাং, ভাং বলে শিঙে,
ডম্বুরেতে ধরে তাল॥
আজ আমাদের কি আনন্দ, নৃত্য করে সদানন্দ,
সদানন্দের সঙ্গে আবার নাচে তাল বেতাল।
সুরধুনীর শুনে ধ্বনি,
আমাদের নৃত্য করে মহাকাল॥

গীতটি শিখতে হবে, কারণ জটাধারীর একটি গোপনীয় আখড়া ও সঙ্গীতের দল ছিল। এই মনে করে ফেরতা গাইতে আরম্ভকালে, পাশের একটি দ্বার দিয়া বৃক্ষতল হইয়া এক দৌড়ে সেতুর নিকট উপস্থিত। শীতু-ঠাকুর গানে মত্ত, আমি আশে পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, তাঁহার গানেই মন, দুইবার গীত গাওয়া হইল, আমি কহিলাম, "শিখেছি শীতুখুড়।"

ক্ষেপা উত্তর করিলেন, "কি ভাই।"

আমি কহিলাম, "খুড়ীর ঠিকানা হইয়াছে, বাবুমহাশয় কহিতেছিলেন, যে আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার শুভবিবাহ নির্বাহ হইবে—আজ আপনার গানে বড় সুখী হইয়াছেন।"

আমার শেষ কথা উচ্চারিত না হইতেই শীতুঠাকুর আবার গান করিতে উদ্যত। আমি এমন সময় কহিয়া উঠিলাম, "আপনি সকল গুণসমন্বিত, কেবল বর সাজতে হবে কিনা,—এক পদের রসাবাতটি আরাম করা আবশ্যক।"

শীতু। আর বাবা চুলগুলি যে পাকিয়াছে, তার ঔষধ জানিস্? তোমরা যে ইংরেজী পড়ছ, ইংরেজীতে অনেক ঔষধ আছে যে শুনি ভাই।

আমি কহিলাম, "ডাক্তারবাবু আমায় বড় ভালবাসেন, তা সব আরাম করে দেওয়া যাইবে, কেশ কাল হইবে, পদদ্বয় স্বাভাবিক ভঙ্গী পাইবে—দাঁত? সব আছে না?"

শীতু। বাবা সব আছে, কেবল কষের আটটি গিয়াছে, আর সম্মুখের নিম্নপাটিতে একটিও নাই।

"এখন যে দাঁত তৈয়ার হ'তেছে।" মনে মনে কহিলাম, বনপাশের কর্মকার ভিন্ন ও কোদালিদন্ত সংস্কার হওয়া কঠিন।

শীতু আবার কহিলেন, "তা বাবা ইংরেজে সব পারে, বিবাহের পণ উঠে যাবে না? বাবা চক্ষুদুটি ত আছে?"

"পদ্মচক্ষু (প্রকৃতার্থে গুগলিগঞ্জিত)। আবার মহাশয়ের নাকটি যথার্থই বাঁশী বলিলেও হয়; ইংরেজী, 'হাওইটজার' আখ্যাধারী ডবল তোপ-বিনিন্দিত বলা যাইতে পারে।"

শীতু। দেখতে ভাল?

"ভাল বই কি! আয়নাতে মুখ দেখেন নাই? মহাশয়, পরকালে আপনি যথার্থই লক্ষ গোদান করিয়াছিলেন, বক্ষদেশ, পৃষ্ঠদেশ সমলোমাকীর্ণ, ঐ সৎপুরুষের প্রকৃত লক্ষণ। কেশ কাল করা ও পায়ের ফুলটুকু আরাম করা আমার ভার, টাকার কি খুড়মহাশয়?"

শীতু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তারও কি ভাবনা ছিল, বাবা, গজানন অধঃপাতে যাক! বার বার বিঘা ব্রহ্মত্তর সে কুচক্রী রাহু এক কলমে গ্রাস করিল, বাজাপ্ত করে নিলে, তা না হলে আর কিসের অভাব।"

আমি কহিলাম, "সে গজানন তোমার অভিসম্পাতেই মরবে।"

শীতু কহিলেন, 'তার মরণ আছে? মলে ব্রহ্মস্ব হরণ কে করবে—সে অন্ধ হয়ে পাপ ভোগ কর্‌বে।"

আমি কহিলাম, "বৃথা কথার সময় নাই, উদ্যোগ কি আছে?—"

"তোমার পিতৃপ্রসাদে আমি নিঃসম্বল নই, যখন মোকদ্দমা হয় জেলায় গেছ্‌লাম, দুইরকমই গান অভ্যাস করেছিলাম, দুই দলেই গেয়েছি,—দুই দলেই টাকা লয়েছি, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন—এই দেখ কোমরে গেঁজে, এখন কিছু টাকা নগদ মজুত আছে, আর নাখেরাজ পুষ্করিণীর অর্ধেক অংশ আছে তাহা বন্ধক দিব, আবার বিবাহ করি, স্থিতি হই—আমার বগলে এই কাগজের তাড়া দেখছ? দলিল দস্তাবেজ সব প্রস্তুত, আমি কি ব্রহ্মত্তর বৃথা ত্যাগ করব! আবার মোকদ্দমা আরম্ভ করব, ডিক্রি হাসিল করব, বাঁশগাড়ী করে খরচা আদায় করে তবে ছাড়ব, ওটাকে তবে ছাড়ব, তবে দেখবে শীতুশর্মা! ব্রাহ্মণ-ঔরসজাত! তবে দেখবে শীতুক্ষেপা! হতভাগার এতই লোভ—" কহিতে স্বর কম্পিত হইল, শীতুঠাকুরের কোন হৃদয়গত গূঢ় ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল ও বগল হইতে একটি বস্ত্র-প্রলেপিত কাগজের নথী বাহির করিয়া কহিলেন, "এই দেখ, মোহর দস্তখত, মহারাজ রাজচন্দ্রের ছাড়—এই দেখ পরওয়ানা ফয়সালা কি নাই? এই জজ সাহেবের মোহর দস্তখত—"

আমি কহিলাম, "খুড়ো একবার যে কলিকাতা পর্যন্ত মোকদ্দমা করিলে কোথাও জিত ত হল না।"

শীতু। হবে কিসে, সব সত্য ত মিথ্যে করে দিলে, আমায় ক্ষেপা বলে কাছারীর বার করে দিলে, আইন আদালত কি দরিদ্রের জন্য বাবা! ছেঁড়া কাপড়ের জন্য, মাটাপালামের জন্য, ভিক্ষুকের রক্ষা জন্য, না সামলার পাগড়ি রেশমের চাপকান, সোণার চেনের শ্রীবৃদ্ধি জন্য স্থাপিত হয়েছে বাবা? যা হোক এবার পাঁপর করব। উকীলবাবু বলেছেন সীমানা ফেরফার করে দিলে আবার মোকদ্দমা চলবে।

জটা। খুড় আগে মোকদ্দমা না আগে বিবাহ?

শীতু। আগে সংসারটা বজায় করি, গৃহী হই।

জটা। আর কি কখন গৃহ হও নাই।

শীতুখুড়া হাসিয়া কহিলেন, "লোকে বলে আমার বাবার হয়েছিল কি না সন্দেহ। আহার আভরণের যা সংস্থান ছিল, পোড়া দেওয়ানজি তা সকল নৈরাশ করিল, বিবাহের চিন্তা কি ছিল?"

"ফলে এখন পিণ্ডের উপায় করা উচিত হয়েছে; চল ঔষধ দিইগে।" এই কথা কহিয়া শীতুঠাকুরকে ঝিলের মধ্যস্থিত উপদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র গৃহে আনিলাম, তথায় তাঁহাকে তৈল মাখাইয়া তাহার উপর এখানে সেখানে শিমূল তুলা বসাইয়া ঔষধ দিলাম।

একদিকে অর্থপ্রিয়, মোকদ্দমা-ব্যবসায়ী, আরদিকে লোভী বিষয়ীর প্রাদুর্ভাবে দেশবিদেশে এমন কত ক্ষেপা ক্ষেপিয়াছে! আমার শীতুঠাকুরের মূর্তি দেখিয়া হাসি সম্বরণ করা দুষ্কর হইল। আমি কহিলাম, "খুড়ে চল, গীত গাইতে গাইতে বাবুর নিকট চল।"

শীতু রামপ্রসাদী সুরে গীত আরম্ভ করিলেন—

ক্ষেপা ক্ষেপা বলে সবে, কিসের ক্ষেপা
কেবা জানে।
আমায় উকিল চাঁদে মজালে ভাই,
আকাশের চাঁদ হাতে এনে।
সেটেমে ফুরাল টাকা,
চিরকুটের দাম হাজার টাকা,
ফিয়েতে ফকির শেষে, ভিটে নিলে মহাজনে।
বাকি জমি যে কয় কাঠা,
সব নিলে গজানন বেটা,
এখন সম্বলমাত্র এই দলিল কটা, সুবিচারের
গুণ বাখানে।

গাইতে গাইতে শীতু বৈঠকখানার হল-কামরায় উপস্থিত। ভৈরব খানসামা কহিয়া উঠিল, "কি বিটকেল।"

শীতু যত দূর পারিলেন উপরপাটির দংষ্ট্রা নির্গত করিয়া ভৈরবের মাথার উপর দুইবার "কি বিটকেল! কি বিটকেল!" কহিলে, ভৈরব ভীত হইয়া কহিল, "মালাকারের ঘরে গিয়াছিলাম, ভাল মটুকের ফরমাইস দিয়াছি।" যেন চকিতে মেঘান্ত-শশীর উদয়। শীতু হাস্য করিলেন ও চর্মের ক্ষুদ্র থলি হইতে এক গুলি গঞ্জিকা ভৈরবকে হাসিতে হাসিতে অর্পণ করিলেন।

আশুতোষবাবু শীতুঠাকুরের উভয় পাদার্দ্ধ তৈল তুলায় রঞ্জিত দেখিয়া শীতুকে কহিলেন, "কি হে শীতলচাঁদ, এ যে নায়কের বেশ।"

শীতু কহিলেন, "কন্যা স্থির করিয়াছি।"

আশুবাবু কহিলেন, "কোথায়?"

শীতু। মহাশয়! সুন্দরী গোপিনীকে আমার মনোনীত, কাল সেই পথে আসিতেছিলাম, সে স্নান করিয়া কেশ মুক্ত করিয়া একটি ক্ষুদ্র পূর্ণ-কলসী কক্ষে লইয়া বক্ষঃ ঈষৎ বাঁকাইয়া গৃহমুখে আসিতেছে; আমি তার অনুসারী হ'লেম, তাদের ঘরে গেলাম—তার মা সাহেবিনী গোপিনীকে বলিলাম, আমায় জামাই করতে হবে, সে বললে কি দিবে? আমি কোন কথা না কয়ে গেঁজে খুলিলাম। ডবল টাকা দুই হাতে দিয়া বায়না করিয়া আসিলাম।

কথা শুনিয়া খঞ্জ ভীম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মনে করিলেন, হাতের ধন আসিতে আসিতে পথেই মারা যায়। প্রকাশ্যে কহিলেন, "মহাশয় কেমন কথা! উনি যথার্থই পাগল—আপনি কর্তা এর সদ্বিচার আপনার নিকট; আমার অনেক কালের দাবি, বোধ করি সুন্দরীকে জিজ্ঞাসিলে সে আমারই প্রিয়া প্রকাশ পাইবে। আমার উদ্দেশ্য 'রিফরমেসন' ইহাও মহাশয় জ্ঞাত আছেন।"

আশুতোষবাবু কহিলেন, "ইহার যথার্থ মীমাংসা সত্বরই হইবে।"

এমন সময় গজানন আসিয়া উপস্থিত। খঞ্জ ভীমের সাক্ষাৎ তেলেবেগুণে দেখাদেখির মত খঞ্জ ভীম ঠিকুরে চলিয়া গেলেন। শীতুকে গজানন কহিলেন, "কি খুড়!"

শীতু। এ নাগর বেশ!!

গজা। মোকদ্দমা করবে?

শীতু। মোকদ্দমা করবে! তুমি জমিগুলি ফাঁকি দিবে?

গজা। যেদিন কনের মায়ের নিকট জামাইয়ের আদর পাবে, সেদিন খুড়ো জমি লবার মর্ম জানবে। শীতুর হাত ধরিয়া গজানন অন্য কামরায় লইয়া গেলেন। দুজনে একটি "নিরালা" মজলিস করিলেন।

গজা। বলি বেশ কথা বাবা, এত বেশ কথা। সুন্দরীই স্থির, ও ভীমাটাকে আমিই ভাগাব, তোমার যে জমি লইয়াছি, তাহার মর্ম আছে; দোহাই ভগবান! দোহাই রঘুবীর! তুমি আশুতোষবাবুকে কোন কথা বলো না, সেই জমি পাঁচ বৎসরের জন্য বন্ধক রেখে পণের আড়াইশ টাকা প্রস্তুত করেছি। বাবা আড়াই, আড়াই শ টাকা, পণের টাকা, পণের?

শীতু। ভালারে মোর ভাইপো! গজু তোমার নিত্য নিত্য শ্রীবৃদ্ধি হ'ক। পরক্ষণেই আবার শীতু গীত গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

চলি চলি পা পা, ঘুরে গজুর চাকা
সংসারটা চলে, গজাননের কলে,
মন জ্বলে দাবানলে
(গজুর) প্রাণ ঠাণ্ডা নগদ পেলে॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোষ্ঠযাত্রা

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। কেহ কেহ কহিতেছেন আজ "শীত শীত" বোধ হইতেছে, দুই একটি বৃদ্ধ হিমের ভয়ে মস্তকে চাদরের উল্টা ফেটা লাগাইয়াছেন, শুভ্র শুভ্র চুলের দুই পার্শ্বে কর্ণদ্বয় বাহির হইয়া রহিয়াছে, কৃষকেরা গো-পাল লইয়া চ-অ-ল অমুকেব গোরু বলিয়া প্রভুর গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। কোন গোপাল কহিতেছে, চল আজ ঠাণ্ডা হয়েছে এখনি ধুমও দিব। কোন রাখাল কহিতেছে, আজ কেবল ত্যালে কিছু হবে না ভাই, ঘরে খ্যাড় জ্বালতে হবে। এমন সময় হুঁ হুঁ শব্দ শুনা গেল—দেখা গেল একটি তানযানে আশুতোষবাবু উদ্যান হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছেন। লাল পাগড়ি মস্তকে, লম্বা লাঠি হস্তে, দুইজন পদাতিক অগ্র পশ্চাতে দৌড়িতেছে ও একজন ভৃত্যমাত্র একটি বৃহৎ উজ্জ্বল রৌপ্যনির্ম্মিত ফুরসী হস্তে পশ্চাতে শশব্যস্ত। বেহারাদলের, দ্বারবানের, হুঁকাবরদার ভৃত্যের, সকলেরই এক চাল, তালে তালে পা পড়িতেছে। ক্রমে সকলে সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হইলে, বাবু মহাশয় যান হইতে অবতরণ করিয়া কালিন্দী সায়েবের ঘাটোপরি গঙ্গাধরের মন্দিরে একটি প্রণাম করিলেন, পরে অস্ফুট বচনে কোন স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে বৈঠকখানার দিকে গমন করিয়া প্রশস্ত বারান্দায় পাদচালনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরবাটীতে আরতির বাজনা বাজিতেছে, নহবতে টিক্‌কুরা সংযুক্ত সানায়ে পূরবী গাইতেছে; সেই দিকেই মন দিয়া যেন বাবুমহাশয় মধ্যে মধ্যে মস্তক হেলন করিতেছেন। ইতিমধ্যে একটি কামরা আলোকময় হইল, দুগ্ধফেননিভ প্রশস্ত চাদরোপরি একটি ক্ষুদ্র গদি, এক বৃহৎ তাকিয়া ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিস সংযুক্ত হইল; পার্শ্বে একটি মোচার খোলের ন্যায় বৃহৎ স্বর্ণজ্যোতির্ম্ময় বাঁধা হুঁকা ও কদলীপত্রনির্ম্মিত হস্তদ্বয় প্রমাণ পুষ্পজড়িত নল শোভমান হইল, রজতনির্ম্মিত শুভ্র রেকাবীতে কয়েকটি চামেলীপুষ্প ও রজনীগন্ধ সংস্থাপিত হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে বাবুমহাশয়ের কাঞ্চননিভ সুগঠনশালী অঙ্গ শয্যোপরি শোভমান হইল। সকলেই জানিত যে বাবুমহাশয়ের একটি সোণার খল নুড়ি ছিল, প্রতিদিন প্রাতে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত মধু দিয়া ঘর্ষিত হইত ও ঐ মধুসংযুক্ত স্বর্ণ, বাবুমহাশয়ের দৈনিক ভোজ্য ছিল, তাহাতেই তাহার রঙ্গে সোণার আভা। বাবু মহাশয় গদির উপরে উপবেশনমাত্র ভৈরবকে তলব ও তালবৃন্তের পাখা হেলাইবার হুকুম হইল। আজ সবার শীতানুভব, তবু বাবুমহাশয়ের এক, একটু পাখা চাই। সকলে জানিত, তাহার গরম ধাত, কেহ কেহ কহিত সে কেবল টাকার গরমী।

ভৈরব তাকিয়ার পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ অন্তরে বসিল। এক হাতে পাখা হেলাইতেছে ও আর এক হস্ত হেলাইয়া মুখভঙ্গীর সহিত সকলকে কহিতেছে, "যা, বলে দেব এখনি দেখবি।"

আমি গৃহের দ্বারে এক উঁকি মারিলাম। বাবুমহাশয় কয়েকটি ফুল-হস্তে আঘ্রাণ লইতেছেন, ভৈরব আমাকে দেখিয়া চক্রাকারে অঙ্গুলি ঘুরাইল ও ঠাকুরবাটীর দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিল।

আমি ঠাকুরবাটীতে গেলাম, দেখিলাম, রাধাবল্লভের সমস্ত দিনের বাহান্ন ভোগ বিতরণ হইতেছে, শীতল-ভোগে তাদৃশ আস্থা ছিল না, লুচি মোণ্ডা, চাল ছোলা ভাজা, কতকটি লইয়া বৈঠকখানার প্রতি আবার ধাবমান। আমার মনে সেইখানেই রহিয়াছে, শুনিয়াছি দেওয়ানজী আগতপ্রায়, অনেক পরামর্শ হইবে। এ দিকে রাঙ্গাঠাকুরুন আমাকেই রিপোর্টার বাহাল করিয়াছেন, তাঁহার এজলাশে এক একবার সব কাছারীর বিচারের আলোচনা ও সুখ্যাতি অখ্যাতির মীমাংসা হইত। আমি সত্বর ভৈরবের নিকট সমাগত, ক্ষণকাল মধ্যে গজানন গৃহমধ্যে বিছানার কাঠার্দ্ধ স্থান জুড়িয়া উপবিষ্ট।

বাবুমহাশয় কহিলেন, "শিবসায়ের কি বিপদ শুনিতে পাই?"

গজানন সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন, কেবল সুন্দরী গোয়ালিনীর পালাটি গোপন রাখিলেন।

বাবুমহাশয়। তবে শিবসায়ের বড় বিপদ, আদালতে কি তলব হবে?

গজা। হাকিমের একান্ত জেদ।

আশু। এখন উপায়; তখন বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, কিন্তু সে কথা ত আমার এখন মনে রাখা আর উচিত নয়। সে সময়ও গত, সে শত্রুতাও গত, এখন রক্ষা করা চাই, উদ্ধারের উপায়?

গজা। উপায় মহাশয়, শিবসহায় ইহার যে কষ্ট দেয়—স্মরণ আছে—

আশু। সে কথা স্মরণ করে লাভ, সে শত্রু হউক, মিত্র হউক, এখন বিপদগ্রস্ত, উদ্ধার করা চাই।

গজা। এত উদারতা কেন? একটু পাকে পড়ুক, দুই এক ভেউ ঢেউ খাক, দুই একটা ঢেউ; বড় বড় নয়।

আশু। বল কি! পরের বিপদ চিন্তা করিতে আছে; অনিষ্ট সকলেই ঘটাতে পারে, সংসার ত অনিষ্টপূর্ণ, মঙ্গলবর্ধন করাই ধর্ম্ম।

গজা। তবে হাকিমের সহিত দেখা করুন, তিনি এলেন, কি আগত-প্রায়।

আশু। দেখা করিয়াই বা ফল কি দাঁড়াবে, বলি কি, আবার তিনি না বুঝেন যে, তাঁহার কর্তব্য কর্মে প্রতিরোধ করিতেছি, বড় কঠিন কার্য। তবে দয়া? বিচারকার্যে কি দয়া সংশ্লিষ্ট হ'তে পারে না—সুবিচারক, ভদ্রের মান রক্ষা করিতে পারেন না? হাকিম পৌঁছিলেই যেন সংবাদ পাই। হাকিম হ'লেই কি দয়া বিসর্জন দিতে হয়? পরের সম্মানে উপেক্ষা করিতে হয়?

এই কথার পর উভয়েই স্তব্ধ, উভয়েই গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, পাখার স্বন্ স্বন্ ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই; এমন সময় কি একটি কট্‌কট্ শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, "কিসের শব্দ রে ভৈরব?"

ভৈরব কি উত্তর দিবে, শেষ বলিল,—"এই জটাধারীবাবু ঠাকুরবাটীর প্রসাদ খাইতেছেন।" ভৈরব এবার মজালে! বাবুমহাশয় পশ্চাদ্দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, জটাধারী শায়িত।

আমাকে উঠে বসিতে হইল, কিঞ্চিৎ তিরস্কৃত হইলাম, সন্ধ্যার পর নিদ্রা? পাঠাভ্যাস কখন হইবে—ভগবান বিপদের বন্ধু! আমার মনে পড়িল, হউক না হউক, বলিয়া দিলাম, আজ যে শনিবারের রাত্রি। সকলে নিরুত্তর।

আশু। এখন কেমন পড়া হইতেছে?

কহিলাম, কিছুই নয়। মাস্টার পাগল হইয়াছে।

আশুবাবু জিজ্ঞাসিলেন, কিসের পাগল?

ভৈরব কহিল, "শীতু-ক্ষেপাসুন্দরী গোয়ালিনীর সহিত কথা কহিয়াছিল বলিয়া তুমুল যুদ্ধ করিয়াছে।"

ইহা গজাননের কর্ণে অতি সুসম্বাদ। সময় পাইয়া কহিলেন, "এখানে ইহাদের আর পড়ার আবশ্যক নাই, হেয়ার স্কুলে বা ব্রাঞ্চ-স্কুলে পড়াইলে ভাল হয়।"

আশুতোষবাবু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, "সকলকে? যাহারা বার বৎসরের উপর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে পাঠান যাইবে। তোমার নীলমণিকেও পাঠাও, সেও ত প্রায় চতুর্দশবর্ষীয় হইল।"

গজানন বিপদ মনে করিলেন, প্রকাশ্যে কহিলেন, "সে নিতান্ত শৈশব"—

ভৈরব কহিল, "মহাশয় নীলমণিবাবুকে পাঠাইলেই ত লক্ষ্মী ঝিকে সঙ্গে দিতে হইবে?"

গজানন একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ভৈরব আবার কহিল, "এবার নীলমণির গোষ্ঠযাত্রা।"

বিংশ পরিচ্ছেদ
যে যার কর্মে ব্যস্ত

এখন চিকিৎসালয়ের যেমন আড়ম্বর, রোগও তেমনি উৎকট—যেমন বাঘা তেঁতুল তেমনি বন্য ওলেরও তেজ বৃদ্ধি। যেমন কুইনাইন, তেমনি না-ছোড়-পিয়াদা জ্বর প্লীহা, যেমন বিয়াড্ হায়পর-ক্লোরোডাইন, তেমনি জলদ পিয়াদা বিসূচিকার সংবৃদ্ধি। যেমন রিলিফের প্রশস্ত প্রণালী তেমনি বিস্তার প্রদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষপীড়ন, যেমন শীত-তাপের গণক "ওয়েদার প্রফেট" তেমনি রঙ্গশালী হঠাৎবাহী বাত্যা বা সাইক্লোন। যেমন কার্য-কৌশল-সম্পন্ন সুনির্মিত সেতুশ্রেণী, তেমনি বানের তোড়। যেমন ইরিগেসন সিস্টেমের বহুব্যয়সাধ্য খাল-প্রণালী তেমনি ঘন ঘন বিন্দুপাতবিহীন শুষ্ক ও শস্যাপচয়।

একদিকে বাঁধ দিতে অন্য দিকে ভাঙ্গে—ইহাই কি বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির পরিচয় ? বা পাশ্চাত্য উচ্চতর সভ্যতার অনুকরণফল!

আজকাল কোন পীড়া হইলে শীঘ্র আরাম হউক না হউক, দুই একদিনেই গৃহ সাজে শোভমান হয়। যেমন প্রতিমা সাজে খুলে, তেমনি রোগীর বিছানার পার্শ্বে রংবেরঙ্গ দীর্ঘ খর্ব গণ্ডা গণ্ডা কারফা, বোতল, অর্ধ বোতল, দুয়ানি বোতল, ক্ষুদ্র সেন্টর শিসাতে রুগ্নশয্যার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। বরফের তলব ঘন ঘন, নাপিতের ক্ষুরের আঘাতেই মস্তকের গ্রীষ্মতাপ ছুটিয়া যায়। মৃত্যুর পরে মৃতদেহ পার করা সহজ কিন্তু আলামত শিশি বোতলাদি স্থানান্তর করা ব্যয়সাধ্য কর্ম হইয়া উঠে। গঙ্গাধর যে সময় জটাধারীর বেশে বাল্য-ক্রীড়া করিতেন, তখন কোন কার্যেরই এত আড়ম্বর ছিল না। এক রামার মা, নাপিত বুড়ি, নরুণ দিয়া ডাক্তার সার্জন জান্দরেলের কর্ম শেষ করিত--আমাদের শুভঙ্কর লাউসেন দত্ত মহাশয়ের ধাতুজ্ঞানে ও মুষ্টিযোগে অনেকের প্রাণরক্ষা হইত। যাঁহারা প্রবীণ বিজ্ঞ বৈদ্য ছিলেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ কেহ ডাকিত না, তাঁহারা বিকারকালে আসন্নাবস্থায় বিষম বটীকা বা চালানে-বড়ি দিতে নিমন্ত্রিত হইতেন।

অদ্য পূজার বন্দের পর, দত্তজমহাশয়ের কার্যগৃহদ্বার সুবিস্তার হইয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পাঠশালার একদিকে অনেক ছাত্র আর এক দিকে কতকগুলি রোগী বসিয়াছে। যাহার গাত্রকণ্ডু হইয়াছে তাহাকে তুলসীপাতার রস প্রয়োগ করিতে কহিলেন;—বুড়ো জেলেকে গঙ্গামৃত্তিকামর্দনে দাদ ভাল করিতে পরামর্শ দিলেন, তাহাতে একান্ত ভাল না হয়, ক্ষুদ্র কণ্টকাকীর্ণ শিউলিপল্লব ঘর্ষণ করিতে কহিলেন;—বৃদ্ধ হায়দরবক্স শিরঃপীড়ায় অস্থির তাহাকে দাড়িম্বকুসুমরেণুর নস্য লইতে ও আহারান্তে একটি বস্ত্র দিয়া শিরো-বন্ধনের ব্যবস্থা কহিয়া দিলেন;—মিদ্যা বুড়ো অম্লশূলে কাতর, রাত্রে উষ্ণ জলে ঘটিম দিয়া পরদিন প্রাতে সেই জল পান করিতে কহিয়া দিলেন;—যাহার শিশু সন্তান শ্লেষ্মাভিভূত, তাহাকে রসাসিন্ধু নাম দিয়া রাঙ্গা মাটীর বটীকা হস্তে বিদায় করিলেন, ও যাহার শিশু দুধ তুলিয়াছে, তাহাকে দোতল-বাসী প্রদীপের তৈল জল সেবন করিতে আদেশ করিলেন। সকলে চলিয়া গেলে কেবল সাহেবানী গোয়ালিনী একপার্শ্বে কোন চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল। চিকিৎসাবিভাগের কার্য শেষ হইল, এখন শিক্ষাবিভাগে মনোনিবেশ হইল।

দত্তজমহাশয় আজ বেত্রপাণি না হইয়া ধুতুরা ফল হস্তে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। সর্বাঙ্গ গাত্রকণ্ডুতে পূর্ণ, তজ্জন্য একটি ধুতুরাফলের কণ্টকাগ্র-গুলি ঘর্ষিত করিয়া আপন লম্বা হস্ত ও পদদ্বয় সেই ফলে বিঘটিত করিতে-ছেন। প্রথমে জটাধারীর প্রতিই তাঁহার সুদৃষ্টি। আজ আমার সুপ্রভাত, কেননা আজই একবার দত্তমহাশয়ের মুখে প্রিয়বাক্য শুনিলাম। আজ পাঠশালায় দণ্ডাবিধির সব জ্বালা ভুলিয়া শীতল হইলাম—আজ দত্তজ এত

মিষ্টভাষী কেন? তিনি শুনিয়াছেন আমরা সত্বর তাঁহার শাসনাধীনত্ব হইতে মুক্ত হইব—আমরা কালেজে যাইব।

দত্তজ আজ মিষ্টভাবে (যত মিষ্ট তিনি হইতে পারেন) মধুরভাবে কহিলেন, "ওহে গঙ্গাধর ভায়া! তুমি কালেজে যাবে শুনিতেছি। নগরে থাকিবে, মধ্যে মধ্যে যেন পত্র লিখিলে উত্তর পাই, আমার জন্য একজোড়া চটিজুতা ও নস্যের ডিপা একটি পাঠাইবে। আর কি বলিব?" আমি কহিলাম, "মহাশয়, বাজারে বলে বেশ ছাচি বেত পাওয়া যায়! দেশীগুলা মহাশয়ের হস্তে অতি শীঘ্র শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়!" "ভায়া, আমায় পরিহাস করিতেছ! এই বেতের গুণ—" বলিয়া বেত গ্রহণ করিয়া দুই একবার হেলাইলেন। আমি অভ্যাসগুণে চমকিয়া স্থানান্তরে বসিলাম। "ভায়া, ভয় নাই,--আমি আর তোমায় মারিব না; এই বেতের গুণ সময়ান্তরে জানিবে। যদি জমিদার হও যেদিন গোমস্তার হিসাবে ভুল ধরিবে--যদি মহাজন হও যেদিন অধীনস্থ চৌধুরীর চুরি নিবারণে সক্ষম হইবে—যদি বিচারক হও যেদিন আমলা কি মামলাবাজের তঞ্চক বুঝিতে পারিবে, সেইদিন লাউসেন দত্তের নামও স্মরণ হবে, বেতও স্মরণ হবে;—ভায়া, এমন যে সুমিষ্ট ইক্ষুদণ্ড তা ঘানিতে না ঘুরালে রসও দেয় না, গুড়ও হয় না,—তেমনি বেত না খাইলে বুদ্ধি টস্‌টসে হয় না। এই যে "সমানি শির শিরসানি ঘনানি বিরলানিচ" মুক্তার ন্যায় তোমার অক্ষর, এই যে কড়ানে, শটকে, বুড়কে, আনা, মাসা, কাঠাকালি, বিঘাকালি কসিতে তুমি এক শুভংকর বিশেষ। এই যে রামায়ণ, মহাভারত, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, শিবরামের যুদ্ধ পাঠে এত সুস্বর হয়েছ, এ কেবল জানবে এই বেতের ভয়—এই বেতের গুণ।" বলিয়াই সম্মুখের পাটির উপর আবার দুই চারিবার সজোরে বেত্রাঘাত করিলেন ও কহিলেন, "আমার নাশের কথা ভুল না।" দত্তজমহাশয়ের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধে ভাবিলাম, যেরূপ জন্ম হইলেই মৃত্যু, শীল পড়িলেই জল, সেইরূপ পাঠশালায় প্রবেশ করিলেই বেতের পটপটী লাভ সুনিশ্চয়।

দত্তজমহাশয়ের দণ্ডবিধির অধীনে আসিয়া কোন ছাত্রই দণ্ড অতিক্রম করিতে পারেন না, তথাপি কৃতজ্ঞতার বিষয় এই গঙ্গাধর অপরের মত দণ্ডনীয় হইতেন না, তাঁহার পক্ষে কিছু যেন ক্ষমা ছিল, সেইজন্য এই বক্তৃতার শেষ হওয়ায় আমি দত্তজমহাশয়ের প্রতি একবারে ভক্তিশূন্য না হইয়া তাঁহাকে এখনও স্মরণ করিয়া থাকি ও সময় পাইলে সাধ্যমত তাঁহার উপকার করিতে ব্রতী হইয়া থাকি। অহো! গুরুভক্তি!

আমার চিন্তা শেষ না হইতেই সাহেবানী গোয়ালিনী কহিয়া উঠিল—"বেলা হল, আমার কথা শুনিবার কি আজ সরকার মহাশয়ের অবসর হবে? আমি চলিলাম।" বলিয়া নিকটস্থিত দুগ্ধপাত্র উঠাইল।

দত্তজমহাশয় কহিলেন, "শত কাজ পরে, তবু তোমার কার্য প্রথমে"—

সাহেবানী চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল "হুঃ এত ভাব হে! তবে কেন এতক্ষণ নিরর্থক বসে আছি?"

দত্তজ। যা হবার হইয়া গিয়াছে, এখন কি হুকুম?

সাহেবানী দত্তজার নিকটে আসিয়া বসিল ও নিম্নস্বরে কহিল, "শুনেছেন সুন্দরীকে সাহেবের কাছে লয়ে গেছে। তাই এলাম একবার—খড়ি পাত, গুণে বল, সব ভাল হবে ত?" দত্তজ মহাশয় গণক। একটি "হনুমান চরিতের" পুঁথি দপ্তর হইতে বাহির করিলেন—পাঠশালায় সব নিস্তব্ধ। খড়ি বাহির করিলেন—ভূমে একটি অংকপাত করিলেন ও কহিলেন, "ফল হাতে আছে?"

সাহে। তা ভুলি নাই।

গাঁট হইতে একটি হরিতকী বাহির করিল। লাউসেন কহিল, "সুপারি নাই?" আরও ভাল। একটি সুপারি অংক-গৃহে সংগে সংগে স্থাপিত হইল। পুস্তক হইতে একটি বচন ব্যাখ্যা করিলেন ও দত্তজ মহাশয়ের রসিকতার পরিচয় আরম্ভ হইল। "সুন্দরীর পিতার নাম কি?"

সাহেবানীর তো লজ্জা রাখিবার স্থানাভাব হইল। কহিল, "এত পরিচয় কেন?" আবার চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল, "বাপের সংবাদে কাজ কি—সে আমার গর্ভজাত কন্যা কি না?"

দত্তজ কহিল, "সেই প্রকারেই গণনা করি, যদি ভুল হয় তো জবাবদিহি তোমার?"

সাহেবানী। তা গর্ভে ধারণ করে অবধি জানা আছে! দারোগাকে দাও, দেওয়ানজীকে দাও গোমস্তাকে দাও, মণ্ডলকে দাও, টাকা কি তোমরা দিয়েছিলে? এখন পুরান কথায় কাজ নাই. যা বলি তা কর।

গণনা আরম্ভ হইল। "ভাল হবে কি মন্দ হবে? এই গণনা? এই প্রশ্ন?" বলিয়া আর একটি খড়ির দাগ দিলেন ও দত্তজ খড়ির তালটি লুফিতে লাগিলেন, কত কত বচন অস্ফুটস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভাল মন্দ" "মন্দের ভাল" "বড় মন্দ নয়" "মন্দও নয়" "ভালও নয়।" "দেওতো আবার এক জায়গায় হাত দেও। এ যে হনুমানেব ঘরে হাত দিলে, দেখি হনুমান কি করেন।"

সাহেবানী কহিল, "মশয় তুমি ভিন্ন—তুমি যা বলবে হনুমান তাই করবে—"

ইতিমধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় পাঠশালার বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত। এক মুহূর্ত জন্য সব কার্য বন্ধ হইল। একটি কম্বল আসন সত্বর বিস্তৃত হইল, তর্কালঙ্কার মহাশয় উপবেশন করিবামাত্র দত্তজ মহাশয় সাষ্টাংগে প্রণত হইলেন। তর্কালঙ্কার কহিয়া উঠিলেন, "লাউসেন, তুমি প্রকৃত ভক্ত কিন্তু তোমার অনধিকারচর্চা। জ্যোতিষচর্চা করিয়া তুমি কেবল কলির শূদ্রের পরিচয় দেও।"

দত্তজ কহিলেন, "এখন সে কথা যাহা হউক, মহাশয়ের আগমন সাহেবানীর শুভদায়ক হইবে সন্দেহ নাই। এখন আপনি খড়ি গ্রহণ করুন—এই অঙ্ক-গৃহও প্রস্তুত।"

তর্কা। লাউসেন, আবার তুমি ভুলিলে! তোমার অঙ্কে আমি গণনা করিব? একটা নূতন খড়ি নাই?

নূতন খড়ি সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল, তর্কালঙ্কার মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টদর্শনে ধীরভাবে নিযুক্ত—

তর্কা। "এই স্থানে কোন দ্রব্য রাখ।" সাহেবানী একটি হরিতকী বাহির করিল—তর্কালঙ্কার রুষ্ট হইয়া ফোকলা মুখে কহিলেন, "আমি ফল গ্রহণ করি না—ও গোঁপিনি, তুই আজ নূতন হ'লি, রজত মুদ্রা?"

দত্তজ মহাশয় কহিলেন, "ফলে হবে না; সিকি, আধুলি কিছু নাই?"

সাহেবানী একটি সিকি রাখিলেন—তর্কালঙ্কার মহাশয় কিঞ্চিৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "অস্মিন্ ব্যাপার এক কালেই মঙ্গলসূচক কদাচিৎ হয়। এক কলসি দুগ্ধে বিন্দুমাত্র লবণাক্তও অশুচির কারণ। সাহেবানী তোকে রিষ্টভঙ্গ জন্য একটা কার্য করা চাই। সে পাঁচ আনা পাঁচ সিকার কাজ নয়। কন্যার মঙ্গল চাস তো শুদ্ধ গব্য ঘৃত সংগ্রহ কর। একটি ভাল করে যাগ করা চাই, তোদের পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিস্।"

সাহে। কত খরচ হবে, না হয় পাঁচ টাকা?

সাহেবানীর এই কথা উচ্চারণ হওন সময়ে শীতু ক্ষেপা উপস্থিত। কহিল, "অধ্যাপক মহাশয়, বলি পাঁচ টাকা, আর নয়—সুন্দরীর শুভসাধন জন্য আমিই পাঁচা টাকা দিব।" পাগলের যেমন কথা তেমনি কাজ। সঙ্গে সঙ্গে থলি হইতে মুদ্রা পঞ্চ বাহির করিয়া তর্কালঙ্কারের সম্মুখে রাখিয়া দিল, কিন্তু তাহার বাক্য সাঙ্গ না হইতেই খঞ্জ ভীম গর্জন করিতে করিতে রঙ্গভূমে উপস্থিত—"ডেগ ক্ষেপা, তুই পাঁচ টাকা দিবি, আমার সুন্দরী।" ক্ষেপা কহিল, "আমার সুন্দরী।" অমনি "আমার" "আমার" যুদ্ধ-উত্তেজক বাণী উভয় পক্ষে উচ্চারিত হইতে লাগিল, ও পরক্ষণেই একটি ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র উপস্থিত হইল। শীতু দংষ্ট্রা নির্বাচনপূর্বক ভীমের প্রতি ধাবমান, ভীম দত্তজার বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান। যে যার আপন কার্যে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে বেগতিক দেখিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহেবানীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ক্ষেপার দত্ত পঞ্চ মুদ্রা হস্তে লইয়া মুহূর্ত মধ্যে অন্তর্ধান।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কাছারি গরম

ডিপুটি সাহেবের চশমা মেরামত হইয়া আসিয়াছে, মফঃস্বলে চশমা হারাইলে যে নয়নতারা হারা হইতে হয়, তাহা মৌলবি সাহেবের বিলক্ষণ

ধারণা হইয়াছে, সেইজন্য একের বদলে দুই সেট চশমা আনাইয়াছেন, যখন একটি যোড়া আঁখিম্বয়োপরি শোভমান হয়, তখন আর একটি যোড়া জেবে চলে। বিচারের দোষ চশমার উপর দিয়া যাইত, সাধারণে কহিত চশমার মধ্য দিয়া প্রকৃতির বিকৃতিই দৃশ্যমান হইয়া থাকে এজন্যই বিচারে ভুল হয়। চশমার অভাবে কাছারির কার্য বন্ধ ছিল; যাহা নিষ্পাদন হইয়াছে, তাহা কাণার হাতে প্রতিমা নির্মাণস্বরূপ হইয়াছে। তাহাতে ক্ষতি নাই, ঊর্ধতর কার্যক্ষেত্রে মৌলবি সাহেবের বিশেষ খোসনাম আছে ও তিনি সুদক্ষ কর্মচারী বলিয়া বিখ্যাত। যাহা হউক, আজ একবার চশমার প্রসাদে বিচারস্রোত উচ্ছ্বসিত হইবে।

একজন চৌকিদার এইমাত্র দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "হাকিমের ঘোড়ার পিটে জিন চড়িয়াছে।" সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র শান্তিপুরে হুলস্থুল পড়িল। তাম্বুর কানাদ কয়েক দিন হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঝড়ে বাদলে রজ্জু-গুলি শিথিল হইয়াছিল, হাকিমের শুভাগমন সংবাদে খুটাগ্রে মুদ্গরপ্রহার আরম্ভ হইল। দড়াস্ দড়াস্ শব্দ আরম্ভ হইল। শব্দে কত কত লোকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। ভীরু জনগণের বক্ষে যেন সেই মুদ্গর প্রহার হইতে লাগিল। কেহ কেহ কহিতেছেন, "আইন—আইনের সগৌরব দৃষ্টি করিব, আইনের প্রভাবে উচ্চ নীচ সমতলসার লাভ করিয়া।" কেহ কহিতেছেন, 'ভদ্রসমাজে সম্ভ্রমসোপান ভগ্ন হইবে।" শিবসহায় মনে করিতেছেন, আজ সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্বে তাঁহার কুলমান বুঝি অস্তমিত হইবে। শিবসহায় স্তব্ধভাবে ভাবিতেছেন, এই সময় দন্তহীন-ওষ্ঠোচ্চারিত "নচ দৈবাৎ পরং বলম্" একটি বচন শুনা গেল. এবং পরক্ষণেই প্রাতঃ-সলিলে ধৌতশিক্ষা-হিল্লোলিত তর্কালঙ্কার মহাশয় শিবসহায়ের সম্মুখে দর্শন দিলেন।

তর্কা। ব্যাপার কি? যাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তাহাদের বিপদ শুনিলেই একান্ত কাতর হইতে হয়। আমার যা শক্তি তাহা করি, শুনে কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি? ভোরে গাত্রোত্থান করে প্রথমে তোমার নিকট ত্রস্ত আসিলাম।

শিবসহায় দণ্ডবৎ হইলেন, ও কেবলমাত্র কহিলেন, "উপায়?"

তর্কালংকার কহিলেন, "মধুসূদন-নামোচ্চারণ—চণ্ডীপাঠ আজই আরম্ভ করা যাক্।"

শিবসহায় কহিলেন, "যা ইচ্ছা।"

তর্কা। এখানে হবার নয়—যবন প্রভৃতি অনেক অস্পৃশ্য লোকের আজ এই গ্রামে আগমন হইবে। মনে করেছি, সেই প্রান্তরে শান্তিনাথের মণ্ডপে যাইয়া শান্তিমন্ত্র পাঠ করিব।

শিবসহায় মস্তক হেলাইয়া সম্মতি দিলেন। তর্কালঙ্কার ভাণ্ডারিকে সঙ্গী করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

এ দিকে শিবসহায়ের বাটীর কিয়দ্দূর পূর্বে ক্ষুদ্র নদীর তটে একটি আম্রকাননে আজ নগর বসিয়া গিয়াছে। দূর হইতে বৃক্ষের কাল কাল সারি

সারি সমদূরবর্তী স্কন্ধগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহস্তম্ভ স্বরূপ দেখাইতেছে, আম্রশাখাগুলি পরস্পর সম্মিলিত, সকল বৃক্ষই যেন এক ছাঁচে প্রস্তুত, এক তুলিতেই অঙ্কিত। উদ্যানের প্রান্তরে বৃক্ষশাখা নির্বিরোধে বর্ধমান হইয়া তলস্থ শস্যক্ষেত্রে সংলগ্ন হইয়াছে। একভাগে দেশবিভাগের কর্মচারীর পট-গৃহের শুভ্র ছাওনি দৃশ্যমান। একটি যেন প্রকৃতির ছবির সঙ্গে মানব-নির্মিত ছবি মিলিয়া গিয়াছে। যেন কোন মন্ত্রবলে গৃহটি মুহূর্তমধ্যে উত্থিত হইয়াছে। এমন গৃহ দেখিতে পল্লীস্থ কোন্ বালকের বা বালকের পিতার কৌতুক না জন্মে? সাহেবের "কাপড়ের ঘর" দেখিতে অনেকেই দৌড়িয়াছে, যেখানে পথ কম পরিসর সেখানে কোন দাম্বাল বালক কোন বুড়িকে হুমড়ি করিয়া ফেলিয়া দৌড়িতেছে, বুড়িরা বালকের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করিতেছে, ও ছাওনি দর্শনের হাতে হাতে ফলদান করিতেছে। ক্রমে গ্রামের লোক বাগানের নিকটবর্তী হইয়া চতুষ্পার্শ্বে পর্যবেক্ষণ করিতেছে, কোন বৃক্ষতলে মোক্তারের দল বসিয়াছে, তাহাদের পাগড়ি দেখিয়াই কত কত ছেলে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। কারও পাগড়িতে একথান, কারও অর্ধথান লাগিয়াছে, কারও দুই তিন হস্ত প্রমাণ কাপড়ে যথেষ্ট হইয়াছে, কারও লাট্টুদার, কারও হাতে বান্ধা, কারো মুরেট্টা পাগড়ি মস্তকে শোভমান বা অশোভমান রহিয়াছে, কাহারও পাগড়ির পশ্চাদ্ভাগে রজতনিন্দিত শিক্কার শেষাগ্র চামরীর লাঙ্গুলাগ্র সম বিক্ষিপ্ত। প্রায় অনেকের পাগড়ি দুই একটি ছারপোকার ও ক্ষুদ্র কীটের বিচরণভূমি। তাহাদিগকে বেদখল করিতে কেহই সাহসী নহেন, কারণ সকলেই মনে মনে জানেন, ঐ স্থান বিচারালয়। সকলেই ন্যায় নিয়মের অধীন, ফলনা আইনের ফলনা ধারার ফলনা প্রকরণে "সি" চিহ্নিত তফসিলানু-সারে কীটদলের দখলের সত্ত্ব জন্মিয়াছে।

পাগড়ির নিম্নভাগে ভ্রূযুগল মধ্যে কোন মোক্তারের গোল রক্তচন্দনের ফোঁটা, কাহার যজ্ঞবিভূতির রেখা ঊর্ধগামী হইয়া শিরোভূষণে ঠেকিয়াছে। এই ফোঁটা সুনীত—সুধর্মের লক্ষণ মাত্র, অহোরাত্র দুশ্চিন্তা, জাল, ফেরেপ, দলিল কাটকুট, নূতন কথার সৃজনকৌশল, প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ঘটাইবার ঘটকা-লির সকল পাপ, সকল দোষ ঐ পূজার বলে, ঐ ফোঁটার মোহিনীগুণে—ধার্মিকতার সুপরিচয়ে পরিপাক হইয়া যায়, এইরূপ অনেকেরই বিশ্বাস। মোক্তার মহাশয়দের মধ্যে দুই একটি মুসলমান, সুসজ্জিত, ইহাদের কেহ এত বৃদ্ধ যে, পুরান দ্রব্যের পরিচয়স্থলে, পরিদর্শনগৃহে স্থাপিত হইবার যোগ্য। ইহার মধ্যে সয়েদ ফকিরদ্দিন মিয়াই সর্বপ্রধান, তাঁহার কত বয়স ঠিক কেহ কহিতে পারিত না। যাহার পিতামহের কাছে তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স্ক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পৌত্রকে কহেন, যে তিনি পঞ্চাশ বৎসর মাত্র অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার পাগড়িটি সকলের অপেক্ষায় স্থূল, শ্মশ্রু-দেশের শুভ্র কেশগুলি বয়োধর্মে প্রায় দশ আনা উঠিয়া গিয়াছে। প্রায় দন্ত-হীন, তথাপি বাক্যপটু; অনর্গল কথা কহিতেছেন, কখন বাঙ্গালা, কখন

হিন্দি কহিতেছেন, শত কথা কহিতে প্রায় পঞ্চবিংশতি বার "কর্‌কে কর্‌কে" কহিয়া থাকেন। তাঁহার গোঁধের মধ্যভাগ কেশহীন। একে দন্তহীনে গোঁফ, তাহাতে দুই পাশে লম্বমান শুভ্র কেশ, মধ্যদেশ একবারেই ক্ষুরচাঁচা। বড় মিয়া এই বয়সে সাতবার মাত্র বেগম পরিগ্রহ করিয়াছেন; কনিষ্ঠা চাচি অল্পবয়স্কা, এইরূপ গোঁফের পরিপকে বড় মিয়া চাচিরও মন রাখিয়াছেন, খোদাকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি অতি বলবৎ, আজ ১৪ বৎসর হইতে তাঁহাকে এইরূপ বক্তৃতা করিতে শুনা যায়। "আর এ জেন্দগানি মিছা। আমার বড় পো যে সাহেবের পানা পাকড়াইয়াছে, তাহাতে আর বালবাচ্ছার তক্‌লিফ থাকিবে না। আগামী পুষ মাহানায় মক্কা কুচ করিবই করিব, দরগায় দরগায় ফয়তা দিতে দিতে হজে পৌঁছিব, খোদা এক রুটি এক বদনা পানি দেয় বেহতর, না দেয় বেহতর।" যাহা হউক কার্যের অনুরোধে বা অর্থের লালসায় ফকিরদ্দি সাহেব সুকামনা চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই— কখন কখন সন্দেহ করেন, তাঁহার কামনা বহু-কালব্যাপী, তাহাতে হয় ত আমাদির প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়াছে, এজন্য এখনও মোক্তারি ত্যাগ করেন নাই। তিনি ঐ বাগিচার মধ্যেই ডেরা নির্মাণ করিয়াছেন, একটি স্থলে বৃক্ষতলে বিচালির বিছানার উপর সতরঞ্চি পাতিয়াছেন, সম্মুখে পিতলের গুড়গুড়ি, দুই একটি মহরর মুসবিদা করিতেছেন, তিনি "ছড়ের" জায়গায় "নাথি" "পথে মারপিট" পরিবর্তে "গৃহপ্রবেশ করিয়া মারপিট", "লাটির" স্থানে "সাংঘাতিক অস্ত্র তরবাল বা সড়কি" লিখিতে অনুমতি করিতেছেন। "অহে! তোমরা ছেলেমানুষ, মামলা কিসে সাজে, কিসে খফিফবাত সঙ্গীন হয়, তার সবক আবতক্ পাইয়াছ কি?" ক্রমে মোক্তার সাহেবের স্থানে ভিড় বাড়িল, পঞ্চ হস্তমাত্র তাঁহার বিছানার বিস্তার, কিন্তু তাহাই আশ্রয় করিয়া সাত হাত পর্যন্ত লোক বসিয়াছে—নূতন লোক আসিলেই স্থান হইতেছে, সকলে সরে সরে বসিতেছে, লোকসংখ্যা সহিত যেন বিছানা বাড়িয়া যাইতেছে। প্রকৃতার্থ অর্ধেক লোক খালি ভূমিতলে উপবিষ্ট। তাঁহার নিকট অনেক লোক আগত, কারণ তিনিই রঘুবীরের আমমোক্তার।

আর একদিকে রামাদিন সুকুলের বৈঠক, ইনিও একটি প্রসিদ্ধ প্রবীণ মোক্তার, মস্তক হইতে পাগড়ি নামাইয়া গাছের শাখায় রাখিয়াছেন, মস্তকটি বৃহৎ, মাথা হেলাইতেছেন, তামাক টানিতেছেন ও সাক্ষীগুলিকে কহিতেছেন, "ভয় করিও না, হাকিমের ধমকে ভুল না, এই এজাহারপ্রণালী, আমার কথাগুলি মনে রেখ, ও যা বলে' দিয়েছি বলো, তাহ'লেই শিবসহায়ের জয়।"

আম্রকাননের আর এক অংশে হায়দার বক্স চাপরাশী এজলাশ সাজাইয়াছেন। একটি পুরান কেম্পটেবেল, তাহার একটি ভগ্নপদ রজ্জু দিয়া বাঁধা। টেবেলের উপর কতকগুলি পুস্তক, কলমদান, দোয়াত ও ফারসি লিখিবার একটি ওয়াস্তির কলম সংস্থাপিত হইয়াছে। একটি হস্তহীন ভগ্নপ্রায় ছারপোকার আবাসস্থানস্বরূপ কেদারা টেবিলের সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে, সকলে

বিচারকের আগমন অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ক্ষুদ্র খালের পার হইতে একটি হাঁক শুনা গেল, অনেকগুলি চৌকিদার সেইদিকে দৌড়িল, আমি ঘাটের পার্শ্বে এক উপকূলে দাঁড়াইলাম, অপর কূলে দেখিলাম, অশ্বারোহী হাকিম সাহেব আসিতেছেন। দুইজন পদাতিক অশ্বের দুই পার্শ্বে খলিন-রজ্জু ধরিয়াছে, অশ্বটি তেজীয়ান্‌ তাহাতে জল পার হইতে হইবে। মৌলবি সাহেব খালের অপর কূল দেখিতেছেন, তবু তাঁহার ভাবনা অকূল, মনে মনে ভাবিতেছেন, "বালি না কাদা" ইচ্ছা, জলের দিকে দেখেও দেখিব না, তজ্জন্য চশমা খুলিলেন, পকেটে পুরিলেন; দুইজন চৌকিদার লাগাম [illegible], দুইজন সাহেবের দুই পদ জিনের উপর চাপিয়া রাখিল; মৌলবি সাহেব [illegible] অশ্ব জলে নামিল। একজন অগ্রে চলিতেছে, আড়কাটির [illegible] বোল বলিতেছে, "অল্প জল" "বালি সার।" সাহেবের সাহস বৃদ্ধি [illegible], তখন অশ্ব চাকিভোর জলে নামিয়াছে, লাঙ্গুলে জলস্পর্শ হওয়ায় [illegible] একবার দক্ষিণে বিক্ষেপ করিল, সঙ্গে সঙ্গে হ্রেষাধ্বনি [illegible] মৌলবি সাহেবের মনে হইল, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত আর ভাবিবার সময় কই [illegible] তীরের মত অশ্ব অপর কূলে আসিয়া উপস্থিত। মৌলবি সাহেব "[illegible] হা লাহু লেল্লা" উচ্চারণ করিয়া সুজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, ও [illegible] আমাকে কেন ধরেছিস্‌" করিয়া চৌকিদারগণকে তিরস্কার করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিচার ধর্ম

যাঁহারা বিচারপতি, তাঁহারা ধর্মাবতার আখ্যায়িত, তাঁহারা ন্যায়সাধন করিয়া থাকেন, কিম্বা ন্যায়সাধন করাই তাঁহাদের কার্য বলিয়া এত গৌরব। সেই গৌরব রক্ষা করিতে তাঁহারা সতত তৎপর, বিচারক [illegible] নিয়মের বাধ্য, প্রমাণের বাধ্য, আরো প্রমাণ প্রয়োগ অসম্পূর্ণ ও স্বার্থসম্ভূত মিথ্যা বর্ণনায় বিদূষিত হইলে, বিচারককে হতাশ হইতে হয়। মনে মনে জানিয়া শুনিয়াও দেশাবিধির অনুরোধে কাগজে কলমে প্রমাণাভাবে, তাঁহাকে নিজ অনুমানের বিপরীত কার্য করিতে হয়। ইহা এক মনোকষ্টের কারণ, তাহার পর আমাদের দেশে সমাজের এমনি স্বভাব, এমনি স্বার্থপরতা প্রবল, এমনিই আপনার স্বরূপ অপরকে দেখিতে তৎপর, যে নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য না হইলে কেবল বিচারককে ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই না। "পক্ষপাতী", "কাণপাতলা", "বন্ধুজনের অনুরোধ রক্ষাকাঙ্ক্ষী", শেষে "বোকা হাকিমটা", কহিয়া তাঁহার সকল শ্রমের, সকল কষ্টের, পুরস্কার দিয়া থাকি।

আজ শান্তিপুরে আমতলার এজলাসে বিচারকার্য নিষ্পত্তি হইতেছে। শুনা

যাইতেছে মৌলবি সাহেবের বিংশতিটি টুপি সংগে আসিয়াছে। সকলে কহি তেছে, যেমন কোন প্রশংসিত ব্যক্তি বিশ তোপ পায়, তেমনি এই হাকি সরকার হইতে বিশ টুপি বক্সিস্ পাইয়াছেন, এজন্য তিনি "বিশ টুপিদা হাকিম" বলিয়া খ্যাত। কিন্তু কাছারীর কার্য এক ঘণ্টা মাত্র আরম্ভ হইয়াছে ইহার মধ্যে দণ্ডে দণ্ডে আমরা কেবল তিনটি টুপি পরিবর্তন হইতে দেখি লাম। ঘাড়টি মধ্যে মধ্যে খুলিতেছেন, ও "টোপি লাও" কহিতেছেন। টুপি লইয়া তিনটি ভৃত্য আসিতেছে, দুইজন রেখা পরিবর্তন নিবারণাশয়ে কেশাগ্র উভয় কর্ণের নিকট ধরে একজন পুরান টুপিটি উঠাইয়া নূতন একটি মস্তকে পরাইয়া দেয়, এটি কলের কার্য! অনেক যত্ন করিয়াও মাথার মধ্যভাগ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, আভাসে বোধ হইল, যেন পার্শ্বদেশ অপেক্ষা মস্তকের মধ্যস্থলের কেশ খর্ব। যাহা হউক, মৌলবি সাহেবের টুপিতে যেরূপ সাধ, সরকারি কার্যেও সেইরূপ আস্থা, কলম খস্‌খস্ চলিতেছে দস্তখত করিতে বড় আমোদ, "আউর দেও" "আউর দেও" আদেশ করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে কহিতেছেন। যেমন মাল থাকুক না থাকুক, লোক চড়ুক না চড়ুক, রেলের গাড়ি নিয়মিত সময়ে চলিবেই চলিবে, তেমনি নির্ধারিত কাছারির সময় তাঁহার হাত থামিবার নহে, কাজ থাকিলেও চলিবে. না থাকিলে চালাইতে হইবে। অতি সামান্য সামান্য কার্যে এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল এক্ষণে মোকদ্দমা পেশের সময় উপস্থিত। হায়দার বক্স চাপরাসি চীৎকার শব্দে কহিল, "ফরিয়াদী রঘুবীর সিং হাজির হ্যায়।" অমনি কাননের চতুষ্পার্শ্ব হইতে জনস্রোত ছুটিল, সুকুল ঠাকুর মোক্তার মহাশয় লম্বমান টিকি এক হস্তে উঠাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর রাখিলেন, অন্য হস্তে তাহা পাগড়ি আচ্ছাদিত করিলেন। ফকিরদ্দী মিয়া শ্মশ্রু কেশসহ ঘন ঘন দুই তিনবার নাশাগ্রে উত্তোলন করিয়া আঁখিদ্বয় নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া সজ্জা সিজিল করিয়া লইলেন, পরে উভয় দলপতি এক একটি দরখাস্ত হস্তে যাত্রার আসরে বিন্দে দূতীর ন্যায় দলবলসহ বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রঘুবীরের সর্বাঙ্গ আজ আবার গোময়বিকীর্ণ ও চূর্ণ-হরিদ্রা-প্রলেপিত, অনেক কষ্টে বসিল: কিন্তু বাম উরুতের ব্যথায় ঋজু হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষম। তাহার কাতরোক্তিতে কানন কাতর হইল—তাহার চক্ষে দর দর অশ্রু পড়িল, কান্দিয়া কহিল, "হুজুরালি! আজ পর্যন্ত দরদ ভাল হয় নাই!" সে বসিয়া সাক্ষ্য দিতে অনুমতি পাইল; অমনি দুই তিনজন মুহুরি এজাহার লিখিতে বসিয়া গেল, মৌলবি সাহেব সকলের কথা শুনিতেছেন, সকলকেই প্রশ্ন করিতেছেন, সকলের উত্তর মুহুরিদিগকে সঠিক করিয়া লিখিতে কহিতেছেন কিন্তু মনের কথা মনই জানে, সাক্ষী-সংখ্যানুসারে মুহুরিগণ আপন "তহরিকের" মুদ্রা দেওয়ানজীর নিকট আমানত করিয়া আসিয়াছেন, যাহা লিখিত হইবে তাহাও জানিয়া আসিয়াছেন।

হাকিমের এক বিচারাসন ও আশেপাশে দশ বিচারাসন দেখিতেছি। দশ

ুখে বিচার নিষ্পত্তি হইতেছে, গাঁয়ের যাদু মণ্ডল কহিতেছে, হাকিম সিংহ-াশ, আর একজায়গায় সাগর আচার্য কহিতেছে, হাকিম ন্যায্য বিচারের জন্য আটুপাটু” করিতেছেন, যখন রঘুবীরের পক্ষ সাক্ষীকে ধমকাইতেছেন তখন ার শ্বশুর শঙ্করসিংহ কহিতেছে, হাকিমের ঐদিকে টান দেখছ—এ অন্যায়, । হয় জেলায় যাইয়া দরখাস্ত দিব। শিবসহায়ের ভৃত্য রামা কহিতেছে, যদিন শিবের জয় হইবে সেইদিন জানিব হাকিম সুবিচারক, এখন কি তোরা াল মন্দ বলচিস ? এইরূপ নিরপেক্ষ অভিপ্রায়ই ত বিচারপতিদের সুখ্যাতিব ভিত্তি !

এখন বিচারপতি স্বয়ং নাজির সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাদম্বিনীকে াজির আনিয়াছ ? লইয়া আইস।” নাজির কেবলমাত্র কহিলেন, "জোনাব' ুহূর্তমধ্যে মরালগামিনী ছদ্মবেশী সুন্দরী গোয়ালিনী কাদম্বিনীর বেশে চারকের সম্মুখগামিনী হইল। বিচারালয়ে একে স্ত্রীলোকের আগমন াহাতে সুন্দরী অনেকের অপরিচিত অজ্ঞাত, প্রকৃত সুন্দর যুবতী কামিনী, াই দৃশ্য দেখিতে কি দর্শককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয় ? কানন পরি-ুরিত হইল, চাপরাশী চৌকিদার সকলে চুপ্ চুপ্ করিয়া গোলযোগ ড়াইতেছে, হাতে লোক সরাইতেছে, তবুও অল্প সময় মধ্যে কাননে লোক-কুলে বায়ু প্রতিরোধ করিল—সুন্দরী আকাশে, পাতালে, সম্মুখে, না র্শ্বে দেখিবে ? সকল দিকে অপরিচিত জনের কটাক্ষাক্রান্ত ! প্রগল্ভতা ই, লজ্জার উদ্রেক হইয়াছে, জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর দিব এই ভাবিতেছে, ূর্বের শিক্ষা ভুলিয়া যাইতেছে।

মৌলবি সাহেব কহিয়া উঠিলেন, "তবে নাকি কাদম্বিনী ফৌত করিয়া-ল, এরা একবারে রাতকে দিন করিতে চায়, সকলে মনে করে যে আমি রোগার রিপোর্টে নির্ভর করিয়াই কার্য করি। নাজির !”

নাজির। হুজুর।

মৌল। বাবু শিবসহায় সিংহকে বোলাও।

নিমেষমধ্যে বৃদ্ধ থরথর-কলেবর স্থূলশরীর প্রচুর সুপক্ক গোঁফধারী বসহায় সিংহ উপস্থিত। বিচারপতি কহিলেন, “ইহাকে প্রতিজ্ঞা পাঠ াও।” মন্ত্র উচ্চারণকালে শিবসহায় আপনাকে একান্ত নিঃসহায় পাপপঙ্কে তেতোন্মুখ মূঢ় জ্ঞান করিলেন, চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন—পেশাদার সাক্ষী ধর্মভীত ভদ্রের এই প্রভেদ ! শিবসহায়ের কাতরতা দেখিয়া শত্রু মিত্র লেই কাতর হইল। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ এই আওরাত দম্বিনী নয় ?”

শিব। না।

বিচা। তোমার কন্যা নয় ?

শিব। কালী কালী ! না।

বিচারপতি ক্রুদ্ধ হইলেন ও কহিলেন, “তাহাতেই কহিয়াছিলাম এনারা

রাতকে দিন করিতে পারেন, ইহার উত্তর লিখিয়া পড়িয়া শুনাও, মিথ্যাবাদীর খানদান এককালে সিকস্ত হওয়া উচিত।”

সকলে ভয়ে থরথর, কি হুকুম হইবে কে কহিতে পারে, আরো লোক-সংখ্যা চতুষ্পার্শ্বে বাড়িতেছে, সকলে সমাগত, কেবল এই পুতুল খেলার যে জন প্রকৃত খেলী সে গজানন কোথায়? তিনি বিচারালয়ে আসিতে বড় কাতর, হলফ করিতে আরো কাতর। তিনি রঙ্গভূমিতে আসেন নাই, দূর হইতে কল টিপিতেছেন, ডোর ছাড়িতেছেন, টানিতেছেন, গ্রামের কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া আছেন, পলে পলে সকল সংবাদ পাইতেছেন।

পোস্টমাস্টার গাঙ্গুলি মহাশয়েরও এখানে দেখা নাই। মাজিস্ট্রেট ক্ষুদ্র বিচারপতি, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের ভৃত্য, তিনি কেবল নবাব গবর্ণর জান্দেরেলের অধীন। অধীনতম হাকিমের কাছারিতে গিয়া ন্যূনতা স্বীকার করা অপমান, অথচ ফলতঃ খবর সকল বিষয়ের রাখিতে হইবে, এজন্য দুটি ডাকের ধাওয়া কাছারিতে রিপোর্টার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিলক্ষণ নিন্দাবাদপটু ও ভদ্রের গ্লানি করা তাহার বিশেষ গৌরব। তিনি মহাতীর্থ জ্ঞানবাপীর ন্যায় সমলসলিলপূর্ণ।

সকল সাক্ষীর এজাহার লিখিত হইল। কাগজাৎ পাঠ হইল। হাকিম রায় লিখিতে বসিলেন। সকলে নীরব, এমন সময় মটুকধারী বনমালী পিতাম্বর সজ্জায় কোথা হইতে শীতু ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত ও গদ্গদ বচনে করযোড়ে কহিলেন, “আজ ধর্মাবতারের আবির্ভাব, শুনিয়াছিলাম আজ রাবণ আসিয়াছে, সীতাহরণ হইবে, তা ত নয়; এই আমার দরখাস্ত নিষ্করে দখল দেন আর এই সুন্দরীকে দান করুন প্রভু আমি ঘনেশ্যাম তাহার উপযুক্ত পাত্র।”—বলিয়া আপন গলদেশ হইতে মালা খুলিয়া সুন্দরীর গলায় অর্পণ করিল।

মৌলবি সাহেব ইহার ভয়ানক গোস্তাকি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। ইঙ্গিত মাত্র বদ্ধকর হইয়া সিংহাসনেচ্ছু শীতু ঠাকুর কারাবাসে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবলমাত্র কহিতে লাগিলেন, এতদিনে দশম দশা প্রাপ্ত হইলাম ও সঙ্গে সঙ্গে গান হাঁকিয়া দিলেন। এদিকে মৌলবি সাহেবের রায় লিখিতে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল, পশ্চিমাকাশে প্রবল ঝড় উঠিবার পূর্বে যেন উচ্চ তরুশ্রেণী স্থিরপত্রে দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ দর্শকমণ্ডল আদেশ প্রচার হইবার পূর্বে সুস্থির! এক্ষণে হাকিম কহিলেন, “শিবসহায় সিংহ, তুমি রঘুকে গুরুতর আঘাত করিয়াছ, সাংঘাতিক অস্ত্রসহকারে দাঙ্গা তোমার অনুমতিতেই হইয়াছে, তুমি কাদম্বিনীর মৃত্যুর মিথ্যাসংবাদ দিয়াছিলে ও সেই মিথ্যার পোষকে আজ আবার শপথ করিয়া প্রকাশ্য বিচারালয়ে মিথ্যা কথা কহিলে যে, আওরাত তোমার দক্‌তর নহে। এ সকল গুরুতর অপরাধ, আমার অভিমতে তোমার আরো উচ্চতর বিচারস্থলে দণ্ড বিধান হওয়া উচিত, অতএব তোমাকে

সসিহান স্পর্দ্ধ করিলাম।" একজন মোহরার কহিয়া উঠিল; "আপনি সাফায় সাক্ষীর নাম দেন।"

হুকুম প্রচার হইল। সকলে বিমর্ষ, সকলের কৌতুক, সকলের কাছারি দেখিবার উৎসাহ শেষ হইল; যে নিরাহারে আসিয়াছিল তার ক্ষুধা মনে পড়িল, আজ কৃষীদের পাক বন্ধ, ছাত্রদের পাঠ বন্ধ, গ্রামে ঘোর বিপদ কাল প্রাতে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কে আর কৃষীদের বীজধানের হলকর্ষণের সন্ধান লইবে, ছেলেদিগকে একত্র করিয়া পরীক্ষা করিবে, কুস্তিখেলা দেখিবে, লাড়ু বিতরণ করিবে, আজ গ্রামের মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। শিবসহায়কে দিন দিন কাছারিতে জামিন দিয়া হাজির থাকিতে আজ্ঞা হইল। একে একে পরে দলে দলে নিরিচ্ছুক পল্লীবাসীরা গৃহমুখে চলিল। এখন মৌলবি সাহেবের স্মরণ হইল যে, সরেজমিনে তদারকে আসিয়া তিনি এ পর্যন্ত দাঙ্গার স্থান দৃষ্ট করেন নাই। ঘোড়া চড়িয়া সেই জমি মাড়াইয়া যাইবেন, মনে করিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই অশ্ব প্রস্তুত হইল, তিনিও আরোহী হইলেন। ঘোড়া চালাইতে প্রস্তুতপ্রায় এমন সময় দেখিলেন একটি খঞ্জ দ্রুতগামী কয়েকটি পাঠশালার বালক সঙ্গে দূর হইতে সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে তাঁহার নিকট আসিতেছে, মৌলবি সাহেব কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলেন। খঞ্জ ভীম একটি সুচ্ছবি ইংরাজিলিখিত পত্রহস্তে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "স্যার, আমি শ্রীনগরের পাঠশালার প্রধান শিক্ষক, এটি হুজুরের (এড্রেস) অভিনন্দন পত্র, হুজুর যে শীতু দুষ্টকে শাসন করিয়াছেন, হাজতে দিয়াছেন তাহাতে কি কহিব। দেশ বিদেশের লোক সন্তুষ্ট; হুজুর, সম্মুখেই তার পরিচয় পাইয়াছেন, সে এক লম্পট বদমাইস লোক।"

এই বালক, দলের মধ্যে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। "জরক বরখ" জরি-বিভূষিত উজ্জ্বলবর্ণময় সজ্জাধারী নীলমণি এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন; খঞ্জ ভীমের কথা শেষ না হইতেই তিনি কহিয়া উঠিলেন, "আমি একটি বক্তৃতা করিব।"

মৌলবি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?"

"'I am is sir Babu Nilmani Chaudhury' আই এম ইজ্ স্যার্ বাবু নীলমণি চৌধুরী, 'Heir apparent Dewan Gajanana Chaudhuri your honor come an address. you are very happy.'"

কোন উত্তর না দিয়া মৌলবি সাহেব খঞ্জ ভীমের হস্ত হইতে পত্রখানি লইলেন ও তৎক্ষণাৎ জনৈক পদাতিককে কহিলেন, "শীতুকে ছাড়িয়া দাও, সে পাগল বোধ হইতেছে।" আদেশ দিবামাত্র সকলকে সেলাম করিয়া অশ্ব চালাই-লেন। খঞ্জ ভীম মনে করিলেন, হিতে বিপরীত, এড্রেসে শীতু খালাস পাইয়া গেল। এড্রেস-ব্যবসায়ী ভদ্রগণ অনেক সময় এইরূপ গোলে পড়েন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শুভ চণ্ডীপূজা

কর্তার ইচ্ছা কর্ম। আশুতোষবাবুর মতানুসারে গ্রামস্থ কয়েকটি ছাত্রের নগরে যাওয়াই স্থির হইল, গজানন অগত্যা নীলমণিকে কালেজে পাঠাইবার অভিমত করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় লম্বমান চিত্রবিচিত্র কোষ্ঠীপত্রের প্যাক খুলিয়া অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন। দিন, লগ্ন স্থির হইল—আগামী বুধবার প্রত্যূষে, বর্তমান কার্তিক মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে শুভদিন সর্বত্র প্রচার হইল, কেন শুভদিন? কারণ তর্কালঙ্কার মহাশয় গণিয়া বলিয়াছেন, ঐ দিবসই শুভ-যাত্রিক, যাহা কিছু রিষ্ট আছে, অর্ধপণ কপর্দক, অর্ধসের লবণ, অর্ধসের তৈল, একটি ক্ষুদ্র কাটারি ও একটি অঙ্গার-খারিবিধোত বস্ত্র রাহু গ্রহকে দান করিলেই তাহার অশুভ চিন্তা বন্ধ হইবে। গ্রহগণ এক্ষণ অপেক্ষা তখন অনেক নির্লোভী ছিলেন, অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট হইতেন। একে অনেকের নিকট পূজা পাইতেন তাহাতে দেশ দরিদ্র বলিয়া জানিতেন। এখন শুনিতে পান দেশে ধনবৃদ্ধি হইতেছে, অনেক প্রকার রাহুও আসিয়া একত্র হইয়াছে ও তাহাদের লোভও ভয়ানক বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্বে কড়িতেই অনেক কার্য লব্ধ হইত, কড়িতে বুড়োর বিয়ে হইত, কড়িতেই পাথর-দুধ মিলিত, কড়িতেই পরিণয় হইত। এখন স্বর্ণমুদ্রা, মেকেবের ঘড়ি ও গোরা কারিগরের নির্মিত সোণার পেটেন্ট চেন ভিন্ন কন্যাদায়গ্রস্তের বর ক্রয় করা দুষ্কর। তখন যে মুদ্রায় এক ভরি মকরধ্বজ পাওয়া যাইত, এখন সেই মূল্যে এক শিশি সোডা পাওয়া দুষ্কর। শুষ্কসময়ে তখন অর্ধ মুদ্রায় এক বিঘায় ফসল রক্ষা পাইত। এখন শোণভদ্র, মহানদী প্রভৃতি বান্ধিয়া কি দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইতেছে?

এখন হউক্ না হউক্ তখন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ব্যবস্থায় আমাদের গ্রহবৈগুণ্য খণ্ডন হইয়াছিল। কিন্তু যাহাদের অনেক অর্থ, তাহাদের গ্রহও ভারী—আমাদের গ্রহদেব অল্পদানেই প্রফুল্ল হইলেন, নীলমণির গ্রহের পূজার আড়ম্বর বেশী হইল। আবার অন্তঃপুর হইতে শুভ চণ্ডীপূজার আদেশ-পত্র বাহির হইল, এখন শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহলযাত্রা ঢাকিয়া গেল। গজাননের গৃহদেবী সিংহবাহিনীর মন্দির বেলওয়ারি সাজে সুসজ্জিত হইল, সম্মুখে একটি চন্দ্রাতপ উঠিল, চণ্ডীযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল—মঙ্গলবার প্রাতে গ্রামের কুলকামিনীগণ কবরীবন্ধন করিতে লাগিলেন। সোণার অলঙ্কারের বাক্স বাহির করিলেন, চেলীর ফুলদার শাটী পরিধান করিতে লাগিলেন, সুসজ্জিতা প্রতিমাপার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতীর ন্যায় সজ্জিতকলেবর মরালগামিনীগণ গজাননের চণ্ডীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন কোন যুবতী কেশবন্ধন করিতে সময় পান নাই, তাহাতে ক্ষতি নাই, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা প্রচুর মুক্তকেশীর বেশ কিছু মন্দ নহে; প্রাতঃসলিলস্নাত

চাঁচর অলকাগুচ্ছগুলি প্রাতঃসমীরণে মস্তকপার্শ্বে দুলিতেছে, এক একটি যুবতী স্তম্ভপার্শ্বে ঠেস দিয়া গণ্ডদেশ হস্তে রাখিয়া, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দেখিতেছেন, কি দেখিতেছেন? একটি গৌরাঙ্গী এলোকেশী কিশোরী ব্রাহ্মণকন্যা নীলাম্বরী পরিধানে মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গণে বসিয়াছেন ও এক হস্তে শীলাতলে ভর দিয়া অন্য হস্ত তুলিকাসহ দুগ্ধরেখাতে আলপনা আঁকিতেছেন। মধ্যদেশে একটি বড় শ্বেতপদ্ম, চারিপার্শ্বে গোল করিয়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প বা কলিকা, পাতা লতা ও আরও দূরে কয়েকটি খঞ্জ-হংসের আকার আঁকিলেন। কোন কামিনী কহিতেছেন, "এরূপ আমরা শিখিলাম না, এর পরে কে আলপনা দিবে?" একটি দোজবরের সোহাগী সুন্দরী কহিতেছেন, "ছাই! ও আবার কি কারিকুরি যে শিখতে হবে।" তাহার নাক চোক নড়াতে অনেকে ক্ষান্ত হইলেন—তাহার প্রখরতায় কেহ বা ভীত হইলেন, কিন্তু বন-ওলের উপর বাগা তেঁতুল আছে। বুড়সাহেবানী গোপিনী তাঁহার মুখে শ্বেত-পাউডর-ভস্ম-প্রলেপ দেখিয়া কহিয়া উঠিল, সেকালে আমরা পিটালির আলপনা দিতাম, এখন সুন্দরীরা পিটালির গুঁড় মুখে মেখে রং উজ্জ্বল করেন। এইত এলোকেশী দিদির রং, ইনি ত পাউডর মাখেন নাই, আলতা গুলে ঠোঁটে দেন নাই তবু কেন পদ্ম গোলাপ হেরে যায়? যাকে ভগবান রঙ্গ দিয়াছেন, তাকে কি রং মাখাতে হয়? এখন যুবতীরা সাবান আর পাউডর নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না আলপনা লিখতে শিখবে? অনেকের মুচকি মুচকি হাসি দেখিলাম, পাগলিনীর মত সাহেবানী কটা কথা কহিয়াই পলাইল। এদিকে আলপনা লেখা সাঙ্গ হ'ল, ঘটস্থাপনা হ'ল, পূর্ণ ঘটে আম্রশাখা দেওয়া হ'ল, তর্কালঙ্কার মহাশয় চশমা নাকে, পুঁথি ক্রোড়ে করিয়া উপস্থিত, একটি থামের পার্শ্বে আসনে বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝারি জল আসিল, নীলমণির গর্ভধারিণীর প্রতিরূপা গজাননের গৃহিণী সেই জলে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদপ্রক্ষালন করিয়া কেশদলে শ্রীচরণ মুছিয়া লইলেন। তর্কালঙ্কার পাঠক হইলেন, পুঁথি খুলিলেন, পুঁথিটি গৈরিক রঙ্গের বস্ত্রের উপর লেওয়ার-বন্ধ, তাহার উপর আবার প্রচুর চন্দন-ছিটা-বিকীর্ণ, সম্মান পুরসঙর তাহা সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিলেন, আবার উঠাইয়া লেওয়ার ও বস্ত্র খুলিলেন, পত্রমধ্য দিয়া একটি ছিদ্র পারাপার হইয়াছে, তন্মধ্য দিয়া একটি সূত্র চলিয়া গিয়াছে; পুস্তকটি বিস্তার করিয়া রাখিলেন, চশমাটি আবার নাসিকাগ্রে স্থাপিত হইল। যেরূপ মৌলবি সাহেবের চশমা স্বর্ণপাশে আবৃত ইহা সেরূপ নহে, কেবল আঁখিদ্বয়ের কাঁচ দুখানি বিশেষ বড়, পিতলের পরিধিবেষ্টিত, একটি ধনুকাকার তারে নাকের উপরিস্থিত, সেই তার হইতে একটি সূত্র ভ্রূযুগলের কপালের শিরোদেশের মধ্যদেশ হইয়া ব্রহ্ম-রন্ধ্রের শিক্কাতে আবদ্ধ। আচমন করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সকলই সাধ্যাতীত বোধ হইল। একে সংস্কৃত তাহাতে দন্তহীন স্বরে বৃদ্ধ-কণ্ঠের উচ্চারিত। এদিকে

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে ললাটাংশ সুন্দর সিন্দুর-বিন্দু-শোভাময় শুভ চণ্ডীর এয়োতী সুন্দরীশ্রেণী দণ্ডায়মান। বেদির নিকট প্রদীপ জ্বলিতেছে, ধূপ ধুনার গন্ধে প্রাঙ্গণ আমোদিত, চন্দনফুলে পুষ্পপাত্র পরিপূরিত। অবশেষে চণ্ডীদেবীর আসনের চতুষ্পার্শ্বে শুভ্র রাশিরাশি আতপ তণ্ডুলচূড় সুগোল সন্দেশমুণ্ডিতে শোভিত, উপকরণফলের ছটাও সুরম্য। আজন্ম কৃপণ গজাননের গৃহে অদ্য প্রচুর সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে; নীলমণি তাঁহার একান্ত স্নেহের পদার্থ, তাহার শুভসাধন জন্য কৃপণ হইলে নিজেরই অশুভ হইবার সম্ভাবনা। এই সুদৃশ্যস্থানে তর্কালঙ্কার মহাশয় পুস্তক পাঠ সময়ে মনে করিতেছেন যে এ মিষ্টান্ন সকল আমারই নির্বিরোধের ধন। সকলে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, অল্প সময় মধ্যে উপক্রমণিকা পরিচ্ছেদ অনর্গল পাঠে সমাপ্ত হইল।

ভৈরব ভৃত্য কহিয়া উঠিল, "হা, যার বিয়ে তার মনে নাই, নীলমণিবাবু কই?"

"এই ডে ডাট্টি" বলিয়া নীলমণি স্বয়ং গজানন চৌধুরী মহাশয়ের সমভি-ব্যাহারে আসিলেন। নীলমণি হরিদ্রারঙ্গের চেলির কাপড় পরিয়া উপস্থিত, দেখিতে অতি গৌরবর্ণ, কিন্তু চুলগুলি কুচির ন্যায় এক একটি পৃথক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কপালটি প্রায় তিন আঙ্গুল প্রশস্ত, নাকটি আর একটু খান্দা হইলেই পাঁচ অঙ্কের রেখার ন্যায় মুখভঙ্গি প্রকাশ পাইত, শ্বেতচন্দন-ফোঁটাতে প্রায় ক্ষুদ্র কপাল পরিপূরিত। শুভ চণ্ডীর নাম শুনিয়া সত্বর দণ্ডবৎ হইলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ঐ নৈবিড্ডের সন্দেশটি খাব?"

গজানন কহিলেন, "ক্ষেপা ছেলে, আবার প্রণাম কর!" নীলমণি আবার প্রণাম করিলেন। জটাধারী যাইয়া কাণে কাণে কহিলেন "স্থির হও পূজা শেষ হউক।" নীলমণি নিবারণ-স্রোতে বদ্ধ হইলেন। এখন তর্কালঙ্কার পৃথগাসনে ঘটপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, পূজা একদণ্ডে সমাপ্ত হইল। এলোকেশী দিদি চণ্ডীর কথা কহিবে, তাহার সঙ্গে বরণডালাহস্তে এয়োতীগণ চলিল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। পাগল শীতু নীলমণির নাম-সম্বলিত একটি আশীর্বাদসূচক গীত গাইতে গাইতে নাচিতে লাগিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় চণ্ডী পুস্তকের পরিশিষ্ট পাঠে আবার উপবিষ্ঠ। পৃথক প্রাঙ্গণে বাজনা বাজিতেছে, চারিদিকে গোলযোগ বৃদ্ধি হইতেছে, তর্কা-লঙ্কার মহাশয় অনন্যমনে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, নৈবেদ্যচূড় হইতে মণ্ডাগুলি ক্রমে ক্রমে বেমালুম অন্তর্হিত হইতেছে, বালকবৃন্দের ঘন ঘন আগমনে তর্কা-লঙ্কার মহাশয়ের সন্দেহ উত্তেজিত হইল, শেষে একবার দেখিলেন, নাচিতে নাচিতে একটি ক্ষুদ্র হস্তে একটি মণ্ডাচূড় উত্তোলিত হইল। যোগাসন ত্যাগ করিলে পাঠভ্রষ্ট হয়, প্রাঙ্গণে শিশুর আগমনে দুই হাত উঠাইয়া ভ্রু! ভ্রু! করিয়া তাড়াইয়া দেন, তাহাতে বালকেরা ভীত না হইয়া অবলীলাক্রমে মণ্ডা

উঠাইয়া প্রস্থান করে। অবশেষে অত্যন্ত বিভ্রাট দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় পাঠ সংক্ষিপ্ত করিয়া লইলেন। এদিকে শীতু খুড় স্তুতি করিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন যে—

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে।
খোলা কেটে বামুণ মরে॥
কোথা ছেলে কেবা বাপ।
কোথা এসে ছাড়ে হাঁপ॥
কার বা কন্যে কেবা বর।
বামুণ যবন একাঘর॥
সুন্দরী তোর কি বাহার।
যার কাছে তখনই তার॥
শাড়ী ছাড়ি ঘাগ্‌রী পর।
কৃষ্ণ না খোদারে ডর॥
যাব জেলার আদালতে।
জিত্‌ব বাজি পাঁপরেতে॥
প্রাপ্তি বৃত্তি, সুন্দরী।
বর মা বরদে গৃহে ফিরি॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ
শিকার খেল

আশুতোষবাবুর রমণা কাননের পশ্চিম ভাগে একটি চতুক্রোশব্যাপী "রাখা জঙ্গল" ছিল। সারি সারি শাল, মউল ও পিয়াল তরু-সুশোভিত, স্থানে স্থানে উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় রাঙ্গা মৃত্তিকাস্তূপ। কোথাও প্রকৃতি দেবী স্বয়ং মনোহর বেশে সজ্জিতা, কোথাও মানব চেষ্টায় বৃক্ষরাজিমণ্ডিত, আবার কোথাও ক্ষুদ্র নদী চাকচিক্যমান শ্বেত বালুকা-শয্যোপরি ঝিরঝির করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বড় নদীর দিকে ধাবমান। একটু উচ্চস্থানে দাঁড়াইলে এই প্রকৃতি ছবির সুললিত বিচিত্রতা বিশেষ প্রকাশ পায়, কোন দিকে থরে থরে রঙ্গভূমির সোপানস্বরূপ, নবীন উজ্জ্বল পত্রধারী নানাজাতীয় বন্য তরু দণ্ডায়মান। কোথাও মাধবী মালতী আলুথালু শাখাগ্র প্রাতঃসমীরণে দোদুল্যমান। একদিকে উচ্চতর নিবিড় বন, একদিকে ক্রমান্বয়ে নিম্ন সুদূর-বর্তী বালুকারাশিব্যাপ্ত বড় নদীর কূল, তাহার পরেই "রায় বাঁধ।" সেই বৃহৎ হ্রদের স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ বারিব্যাপ্তি নয়নকে আকৃষ্ট করিতেছে, দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। বৃহৎ খর্ব মরালদল, সেই জলে ভাসমান। কেহ শীলাতলশায়ী হইয়া একবারে সুষুপ্ত, কেহ এক পদে মাত্র ভর করিয়া সান্ত্বির

ন্যায় নিদ্রাবশে ঢুলিতেছে, তবু সজাগ। কেহ বধূসহ স্থির জলে সন্তরণ করিতেছে!! ডুবিতেছে ভাসিতেছে বিকচ নলিনের নবীনপত্র কচ্‌কচ্‌ করিয়া চর্বণ করিতেছে। পশ্চিম দিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখিলে নীলাভ ক্ষীণ রেখাস্বরূপ ক্ষুদ্র পর্বতশৃঙ্গ আকাশ প্রান্তে চিত্রিত রহিয়াছে বোধ হয়, কিন্তু সে রেখা এত দূরে যে একবার নয়নপথে আসে ত আবার তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, সে রেখা প্রকৃত কি আঁখিভ্রম তাহা অনভ্যাসী জনের স্থির করা দুষ্কর। এই রাখাবনে মোল ফলের সময় ক্বচিৎ ঋক্ষ ব্যাঘ্র, কখন কখন কৃষ্ণসার হরিণ-দল প্রত্যূষে বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় (রক্ষকেরা গল্প করে)। রাশি রাশি ফুলশয্যায় কিম্বা বারিসিক্ত জলাশয়-তটে বালুকার উপর পশুগণের পদচিহ্ন বা লাঙ্গল বিক্ষেপণের চিহ্ন সময়ে সময়ে দেখা যায়। যৌবনাবস্থায় আশুতোষবাবু সতত শিকারপ্রিয় ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, যে শীত-ঋতু সময়ে তিনি মাসত্রয় মৃগয়া ক্রীড়ায় মাংস সংগ্রহ করিয়া বনভোজনে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার উভয় পুত্র নরেন্দ্র ও অমরেন্দ্রবাবুকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় পরিপক্ক দেখিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। শস্ত্র-শিক্ষায় উভয়কে সমান নিপুণ করিয়াছিলেন, ধনুতে বাঁটুল সংযোজনায় তাঁহারা হিংস্র দাঁড়কাক, চিল, প্রভৃতি শিকারী পক্ষীসকল শিকার করিতেন, তীর বা বন্দুকের অপেক্ষা করিতেন না, এবং সময়ে সময়ে দুর্মদ পাঠানের শিক্ষার তলোয়ার হস্তে বনে বনে ঋক্ষ ব্যাঘ্রের লুক্কায়িত শয্যানুসন্ধানে ফিরিতেন। বঙ্গ-ভূমির দৌর্বল্যসাধিনী বায়ু বারি এ ক্ষত্রিয় বংশজাত যুবকগণকে শান্তিসুখ-সম্ভোগে এ পর্যন্ত শিথিলাঙ্গ করে নাই; এখনও তেজীয়ান রক্তস্রোতে তাঁহাদের শিরা-প্রণালী বলবৎ ছিল।

অদ্য ঊষা সময়ে জঙ্গলের একজন রক্ষক গদাধর রাখালের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। গদাধর কান্দিয়া অস্থির। তাহার ধলো বকনাকে বাঘে লইয়া "ডুবরি কুদের" পাশে কড় মড় করিয়া ভক্ষণ করিতেছে, কারণ সেইদিকেই রাত্রিশেষে ফেও ডাকিয়াছিল। সম্বাদ পাইবামাত্র বাজনা ও লোক একত্রিত করিয়া রঘুবীর ও পদাতিকদলকে "রাখায়" যাইতে আদেশ হইল। অমরেন্দ্র ও নরেন্দ্র কোমর বন্ধন করিয়া দুইটি তুর্কি ঘোড়ায় আরোহিত হইয়া জঙ্গলের দিকে ধাবমান হইলেন। স্বল্পকাল মধ্যে জঙ্গলের ভিতর একটি ভগ্ন দুর্গের তিন দিক শিকারীদলে বেষ্টিত হইল। বাজনা বাজিয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে হাকোয়াদের স্বর মিলিত হইয়া জঙ্গল ভেদ করিল, পশ্চাদ্ভাগ হইতে অমরেন্দ্র ও নরেন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয় ভগ্ন দুর্গের স্তূপের উপর অশ্বসহ আরোহণ করিলেন।

গঙ্গাধর কখনই তামাসা দেখিতে পেছপাও কি কাহার পশ্চাতে থাকিবার নহে—একটি ক্ষুদ্র শিকারীবেশে ক্ষুদ্র ঘোড়ায় বন্দুকহস্তে নরেন্দ্রবাবুর পশ্চাতেই উপস্থিত। প্রকৃত সাহসী পুরুষ সাহস দেখিলে কি বিরক্ত হয়! আমাকে দেখিয়া উভয় সহোদর কহিয়া উঠিলেন, "বাহবা গঙ্গু"। কিন্তু ব্যাঘ্র

শিকার যে কি বিপদ আমি তাহা জানিতাম না, আমি উৎসাহিত হইলাম, ঘোটক হইতে অবতরণ করিলাম. পাহাড়ীয় লম্বধারে যাইয়া দেখি, নীচে লম্বতলে একটি ক্ষুদ্র জলনালীপার্শ্বে চতুর্দিক জঙ্গলবেষ্টিত স্থানে হত গাভীটি সম্মুখে করিয়া ব্যাঘ্র ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছে। আমিই প্রথমে দেখিয়া, উভয় ভ্রাতাকে কহিলাম, সত্বর তাঁহারা উভয়ে আমার নিকটে আসি-লেন। রাইফেল হস্তে ধরিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই?" বাঘটি দেখিতে পাওয়া বড় সহজ ছিল না। তাহার চতুষ্পার্শ্ব লতাপাতায় আবৃত ছিল। আমি একটি ক্ষুদ্র কঙ্কর লইয়া সেইখানে ফেলিয়া দিলাম। কে জানিত বাঘ এমত ভয়ানক জন্তু! লোক, কোলাহল, অস্ত্র, শস্ত্র, তৃণবৎ জ্ঞান করে! কঙ্করটি তাহার গাত্রে স্পর্শ করিতে না করিতে একটি হুঙ্কার দিয়া উচ্চ লম্ফ ত্যাগ করিয়া বনদেহ কম্পিত করিল। কত শিকারীর হস্ত হইতে অস্ত্র পড়িয়া গেল, কত হাকোয়া বনে লুকাইল, কত কত পক্ষী কেকারবে বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িতে লাগিল। ব্যাঘ্র আবার একটি নিভৃত স্থানে লুকাইল। আমরা পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিয়ৎকাল পরেই দেখা গেল, শ্যাম পিয়ারি ও মতি গজ নামক দুইটি শিকারী-হস্তী-পৃষ্ঠে শিকারীরা ব্যাঘ্রের গুপ্ত গুহা অনুসন্ধানে আসিতেছে। একজন মাহুতের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়িল। আমরা ইঙ্গিত করিয়া দিলাম। অনিচ্ছাপূর্বক শনৈঃ শনৈঃ হস্তি-দ্বয় সেই দিকে চালিত হইল। হস্তী দুই একপদ অগ্রসর হয় আবার কি এক ভয়ানক ঘ্রাণ পাইয়াই হউক, বা অন্য কারণবশতঃই হউক ফুৎকার করিয়া হেলিতে দুলিতে আরোহীদলকে প্রায় ফেলিয়া প্রস্থান করিবার চেষ্টা করে: কিন্তু ঘন ঘন অঙ্কুশাঘাতে প্রত্যাগত হইয়া নির্দিষ্ট ডুবরীতলে আনীত হয়। একবার হস্তিদ্বয় উভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি গোপনীয় গুহা হইতে ব্যাঘ্র পুনর্বার গর্জনপূর্বক লম্ফপ্রদান করিয়া একবারে ক্ষুদ্রতর করীটির শুণ্ড সজোরে টানিল, হস্তীর বাছা অমনি কর পাতিলেন, শিকারীরা আশেপাশে পড়িয়া গেল, মাহুতপুত্র বৃহৎ হস্তিকর্ণপাশে লুকাইল। এমন সময়ে অমরেন্দ্র বাহাদুরের বন্দুক হইতে একটি গুলি ব্যাঘ্রের কর্ণমূলে লাগিল, এই সময় নরেন্দ্র বীর আর একটি গুলি প্রয়োগ করিলেন।

"বাঘ মরিয়াছে" "বাঘ মরিয়াছে" বলিয়া চতুর্দিকে শব্দ হইল। ব্যাঘ্রটি মৃতপ্রায় পতিত হইল, কিঞ্চিৎ দূর হইতে অমরেন্দ্রবাবু আর একটি গুলি করিলেন; তাহাতেই যেন মৃত জন্তু জীবন প্রাপ্ত হইয়া লম্ফ ত্যাগ করিয়া একবারে ধূম-রেখা অনুসরণ করিয়া পাহাড়ির লম্বভাগ অতিক্রম করিয়া অমরবাবুর উরুদেশে মরণ কামড় দিয়া তাঁহাকে ভূমিশায়ী করিল। পরক্ষণেই আবার উভয়ে ঘূর্ণিত হইয়া গড়েন পথে ঘরঘরিত হইলেন, কি হইত কে বলিতে পারে। ভাগ্যক্রমে একটি মহীরুহের প্রকাণ্ড কাণ্ড উভয়ের গতি প্রতিরোধ করিল। "হায়! কি হইল!" চারিদিকে কেবল এই শব্দ হইতে লাগিল।

বীরপুরুষের হতাশ নাই; পড়িবার সময় অমরবাবু ব্যাঘ্রের গলার উপর পড়িয়াছিলেন, অমনি পৃষ্ঠদেশ হইতে বৃহৎ ছুরিকা টানিয়া এক প্রহারেই তলদেশ হইতে ব্যাঘ্রের গলদেশের অর্ধভাগ পার করিয়া দিলেন, যাহা কিছু বাকি ছিল, রঘুবীর কোথায় হইতে দ্রুত উঠিয়া শেষ করিল। একটি পেশোয়ারি ফারসি বয়েত-অঙ্কিত কিরীচফলক আমূল পর্যন্ত ব্যাঘ্রের পার্শ্বদেশে প্রবিষ্ট করিয়া বাহির্গত করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাপদের নাড়ী ভুঁড়ী সমস্ত বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাঘ্র এখন নিস্পন্দ, মৃত শবমাত্র!

আমি এখন উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিলাম ও একটি ক্ষুদ্র ছড়ি হস্তে লইয়া মৃত ব্যাঘ্রকে টুক টুক করিয়া কয়েকটি বার প্রহার করিলাম। বাটীতে যাইয়া গল্প করিতে পারিব, যে আমিও ব্যাঘ্র মারিয়াছি। পাঠক আমার কথা শুনিয়া হাসিতেছ? তোমরা কি গল্পচ্ছলে দিল্লী জয় কর না? বাঘ মার না?

আমার বীরত্ব দেখিয়া অমরেন্দ্র আপনার ব্যথা ভুলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। তাঁহার জখম তাদৃশ গুরুতর হয় নাই তথাপি রক্ত অনর্গল পড়িতেছিল। সত্বর আহত স্থান বন্ধন করা হইল। প্রায় পঞ্চক্রোশ পথ যাইতে হইবে। আর বিলম্ব করা হইবে না, কাহার কথা না শুনিয়া আবার অশ্বারোহী হইলেন। মৃত ব্যাঘ্র একটি হস্তীপৃষ্ঠে উত্তোলিত হইল ও একজন অশ্বারোহীকে অগ্রে শিকারের সম্বাদ দিবার জন্য কর্তা মহাশয়ের নিকট ত্বরিত প্রেরণ করিলেন। রঘুবীরকে একখান পাগড়ি ও রজত বলয় একযোড়া পুরস্কার দিবার হুকুম হইল। আমাদের অশ্বশ্রেণী শ্রীনগরাভিমুখে ধাবিত হইল।

তিন ক্রোশ আসিয়া রমণা পার হওয়া গেল। জলে জঙ্গলে যেদিকে ঋজু পথ সেইদিকেই অশ্ব চালিত হইতেছে। ঘর্মে অশ্ব স্নাত, সেই ঘর্মে তাপ উঠিতেছে। অশ্বমুখে লৌহখলিনে ফেণামণ্ডিত। লোহিত বর্ণ নাসারন্ধ্র বিস্তার করিয়া অশ্ব দল দৌড়িতেছে। সকলের কৌতুকের বিষয় এই যে আমিও আমার ঘোড়ায় বৃহৎ অশ্ব সুনিপুণ আরোহীদের সহিত সমধাবমান হইয়াছি। এখন শান্তিপুর ও শ্রীনগরের মধ্য প্রান্তরে যে ক্ষুদ্র নদী বেগবতী তাহারই কূলে কূলে আমরা যাইতেছিলাম; ছায়াহীন বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র মধ্য দিয়া পথ। সূর্য্য প্রখর হইয়া উঠিতেছে, বোধ হইল যেন অমরেন্দ্রনাথের ব্যথা বৃদ্ধি হইতেছে, অমরবাবুর মুখশ্রী কিঞ্চিৎ মলিন বোধ হইতেছে, তিনি আহত শরীরে ক্লান্তি বোধ করিতেছেন, অমরেন্দ্র কহিলেন, "সম্মুখে ঐ নদীর তটে কুটীরটি কার?" এক অশ্বারোহী পুরুষ কহিল, "তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আবাসভূমি।"

অম। আমি তাই ভাবিয়াছিলাম। শ্রীনগর এখান হইতে কত দূর?

সওয়ার। প্রায় দুই ক্রোশ।

অমরবাবু কহিলেন, "আমি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমে একবার আরাম করি। তোমরা সকলে যাও, অপর কোন যান লইয়া আইস।"

সকলে শ্রীনগরাভিমুখে চলিল। কেবল একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যসহিত অমরেন্দ্রনাথ তর্কালঙ্কারের গৃহমুখে চলিলেন, গঙ্গাধরও ক্লান্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রোজনামচায় নূতন সম্বাদের দিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি। ভাবিলাম সঙ্গে যাই, দুই এক নূতন বিষয় দেখিব। নূতন কথা শুনিবই শুনিব।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট"

সামাজিক ঘটনাসূত্রের পাকজাল খুলিতে কোন শাস্ত্রীই আজ পর্যন্ত সক্ষম নহেন; বাহ্য জগতের বাণিজ্য ব্যবসায়ের দুই একটি সামান্য ঘটনার উদাহরণ দিয়াই ইদানীন্তন সমাজশাস্ত্রপ্রবর্তক মহাত্মারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু সামাজিক ঘটনার দীর্ঘ সূত্র আজ পর্যন্ত মানব-পরিমিতির সাধ্যাতীত। কি হইতে কি হয়! পাশক্রীড়া হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। নৃশংস মৃগয়া-পরিশিষ্টে স্বর্গীয় নির্মল প্রণয়ের উৎপত্তি! মৃগয়ার শেষেই পুরূরবা ঊর্বশী লাভ করেন—দুষ্মন্ত নিষ্কলঙ্ক শকুন্তলার প্রণয়পাশে বদ্ধ হন—আজ আবার শিকার খেলান্তে অমরেন্দ্রনাথ কাদম্বিনীর সরল কটাক্ষকলে চিরবদ্ধ হইলেন, তাহাতেই আবার শান্তিপুরে শান্তির ভিত্তি পত্তন হইল।

বাঘ মারিয়া আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমাভিমুখে আসিয়া তাঁহার অটবীনিকট পেঁৗছিলাম। স্থানটি রম্য। উত্তর পার্শ্বে নদী; অপর তিন দিকে বিস্তৃত হরিতময় শস্যক্ষেত্র। পূর্বদিকে প্রথমতঃ একটি চতুষ্পাঠী, তাহার পশ্চিমে নারীগণের প্রাচীরবেষ্টিত আবাসস্থান; তাহার পশ্চিমে একটি বৃহৎ অটবী, আম্র, পনসের অনেকগুলি সুন্দর তরু; একপার্শ্বে কতকগুলি কদলিবৃক্ষ ও নিত্যপূজোপকরণ পুষ্পপ্রদায়ী জবা, করবী, মল্লিকা, শিফালিকা, বেল, চামেলি, বেলা, যুঁই বৃক্ষ। উদ্যানের প্রান্তরে ঈশান কোণে এক ধারে নদীকূলে একটি বৃহচ্ছায়াশালী মালতীলতা-বেষ্টিত পুরাতন বটবৃক্ষ। সেই বটবৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখাতলে একটি বেদি, ফুল, ফল, সুগন্ধ চন্দন প্রভৃতি উপচারে সুশোভিত। বেদির কিঞ্চিৎ দূরে একটি বৃদ্ধ মালতীতলে, নীলাম্বর-পরিধানা সদ্য-স্নাত মুক্তকেশী একটি নবকিশোরী পদ্মমুখী এক হস্তে পুষ্পপাত্র ও অন্য হস্তে একটি আকর্ষণী ধরিয়া সুগোল কাঞ্চন আভাময় বাহু উত্তোলন করিয়া পুষ্পশাখা টানিতেছেন। এই ছবিটি সর্বাগ্রে অমরেন্দ্রনাথের নয়নপথে পড়িল। তিনি কি ভাবিতেছিলেন বলিতে পারি না—আমার বোধ হইল, যেন হিমালয়ে জাহ্নবীতটে পতিপ্রাপ্তি কামনায় ভগবতী

পুষ্পচয়ন করিতেন, এই কুলকামিনীও সেইরূপ কোন নিগূঢ় কামনায় এখানে পূজার আয়োজন করিতেছেন।

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পবিত্র গৃহ, এখানেই আরাম করা যাউক।"

গৃহ হইতে তর্কালঙ্কার মহাশয় এই বাক্য শুনিয়াই কহিলেন, "অহো! ভাগ্য! কে অমরেন্দ্রনাথ! আসুন আসুন, মুখশ্রী একবারে পরিম্লান দেখিতেছি কেন?" এই কথা কহিতে কহিতে একটি বংশছিলকানির্মিত কপাট খুলিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় শশব্যস্ত; অনেকে বলেন, ব্রাহ্মণেরা লোভী আর দক্ষিণাপ্রিয়, কিন্তু অতিথিসৎকারে, অন্নদানে কখন কাতর নহেন। বিশেষ অমরেন্দ্র তাঁহার গোষ্ঠিপালক; এই উদ্যান, এই ব্রহ্মোত্তর বৃত্তি তাঁহারই পিতা আশুতোষবাবুর দত্ত। অমরেন্দ্রবাবুকে কিসে আপ্যায়িত করিবেন, এই ভাবিয়াই তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যস্ত, বেদির নিকট জলপাত্র ছিল, তাহা স্বয়ং লইয়া অমরেন্দ্রের মুখে সিঞ্চন করিলেন; পরক্ষণেই দুই তিনটি চতুষ্পাঠীর ছাত্র ধরিয়া একটি ক্ষুদ্র খাট আনিয়া বটতলে সংস্থাপিত করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিয়া উঠিলেন, "কাদম্বিনী, মা! জলমানয়. তুমি একান্ত বালিকা লজ্জা কি মা?"

ক্ষুদ্র ঘটকক্ষে কাদম্বিনী নদীতীরে ধীরে ধীরে গমন করিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ এখন শয্যাশায়ী, নদীর দিকেই তাঁহার দৃষ্টি। মুক্তকেশীর মরালগমন সন্দর্শনে তাঁহার নয়ন তৃপ্ত হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন দেখিতে দেখিতে ব্যথার অর্ধেক লাঘব হইল। শীতল বটচ্ছায়াতে হউক, বা শ্যামা স্ত্রী সন্দর্শনে হউক, বা ক্লান্তিবশতই হউক, স্বল্প কাল মধ্যেই অমরেন্দ্র নিদ্রিত হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল পরে—চিকিৎসক লাউসেন দত্ত শ্রীনগর হইতে উপস্থিত হইলেন, তিনি অতি যত্নে আহত স্থান দেখিলেন, ও প্রক্ষালিত করিয়া বন্ধন করিলেন। দুই একবার মস্তক হেলাইলেন, মনে করিলেন, আঘাত নিতান্ত সহজ নহে, পুনর্বার বাঘের বিষ নামাইবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, ঝাড়িলেন, ফুকিলেন, ধুলা ছড়াইলেন, আবার কহিলেন, বাবুর নিদ্রা ইচ্ছা থাকে কিঞ্চিৎকাল এখানে আরাম করুন।

সকলেই উদ্যান হইতে বাহিরে আসিল, তর্কালঙ্কার অনতিদূরে বেদিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারই অনুমত্যানুসারে কাদম্বিনী তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎকাল পরেই অমরেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভঙ্গ হইলে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে তালবৃন্ত-হস্তে মুক্তকেশী দণ্ডায়মানা। এ মিলন অরুণ ঊষার মিলন!

"নিত্য নব, নিত্য হাসে, হাসায় জগতে"

অমরেন্দ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, "ধর, আমি বসিব।" মুক্তকেশী যেন মনের কোন অনিবার্য ভাবোদ্রেকে অমরেন্দ্রের ব্যথায় একান্ত ব্যথিত হইয়া

করাবলম্বনে তাঁহাকে বসিতে সহায়তা করিলেন, করস্পর্শসুখলাভে অমরেন্দ্রনাথ তেজীয়ান্ হইলেন, ব্যাঘ্রকে ধন্যবাদ দিলেন। আহত স্থান যেন এককালে ব্যথাচ্যুত হইয়াছে বোধ হইল।

এদিকে সন্তানের বিপদসংবাদে আশুতোষবাবু একান্ত অস্থির হইয়া স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রামে আসিলেন, কিন্তু তিনি অধ্যাপক মহাশয়ের ভদ্রাসন বা উদ্যানে প্রবেশ করিলেন না। যখন এই সকল ভূমি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে দান করিয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ভবিষ্যতে কেহ কখন সেই সীমামধ্যে পদার্পণ করিলে পতিত হইতে হইবে, কাজেই অন্য স্থানে একটি নিম্নবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তর্কালঙ্কারের ব্রহ্মস্ববৃত্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়া বড় কষ্ট পাইলেন, শেষে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সত্বর অমরেন্দ্রনাথকে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন।

তাঁহার আগমনবার্তা শুনিবামাত্র তর্কালঙ্কার মহাশয় নিকট আসিয়া কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, সামান্য ব্যথা হইয়াছে মাত্র, সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হইবে।"

আশুতোবাবু কহিলেন, "সে মহাশয়ের আশীর্বাদ—এখন আর একটি অনিষ্ট দেখিতেছি। আপনি স্মরণ করিয়া দেন নাই, যে এ স্থান আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ; অমরেন্দ্রকে কেন আপনার অধিকারের মধ্যে যাইতে অনুমতি দিলেন?"

তর্কালঙ্কারের দন্তহীন পার্টিযুগলে, জিহ্বাগ্রে, নির্মল ওষ্ঠদেশে হাসি রাখিতে স্থানাভাব, একটি বচন পাঠ করিলেন ও কহিলেন, "ইহার আর দ্বিগুণ স্থান দান করিলেই তো প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে।" আপাততঃ আশুতোষবাবু কোন উত্তর দিলেন না।

এদিকে অমরেন্দ্রনাথ শয্যা ত্যাগ করিয়া শিবিকাতে উঠিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আবার মনে মনে এ চিরস্মরণীয় স্থান ত্যাগ করিতেও অনিচ্ছুক; কাতরভাবে বলিলেন, "এই ব্যথার স্থানটি আর একবার ধুইয়া ভাল করিয়া বান্ধিয়া লইলে ভাল হয়, কে বান্ধিবে? গঙ্গু তুমি পারিবে? তোমার নিতান্ত কোমল হাত।"

আমি কহিলাম, "এই মুক্তকেশীদিদির হাত আরও কোমল, দিদি দাও তো।"

উভয়ের মনের মত কথা হইল বলিয়া বোধ হইল। মুক্তকেশীর সুকুমার হস্ত দ্বারা আহতস্থান ধৌত হইল। বস্ত্র বন্ধন সমাধা হইলে অমরেন্দ্র ভাবিলেন, আর ব্যথা নাই, বসিলেন, দাঁড়াইলেন, দুই এক পদ চলিলেন: আবার কহিলেন, "কেমন বন্ধন? খুলে গেল।"

আমি কহিলাম, "মুক্তকেশীদিদি, আপনার বন্ধনে ফস্কা গিরো! আবার বেন্ধে দাও।"

এবার অমরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান, মুক্তকেশী পদতলে উপবিষ্ট; কোমল হস্তযুগলে পাদস্পর্শ করিয়া শুভ্র বস্ত্রাংশ বন্ধন করিতেছেন। বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রশেখরের পদপার্শ্বে মোহিনীমূর্তিধারিণী উমাসুন্দরী মর্ত্যে অবতীর্ণা। এমন শ্রীমান শ্রীমতীর এক স্থানে মিলন বিরল। এখন বন্ধন শেষ হইল, মনেও মন বাঁধা পড়িল, অমরেন্দ্রনাথ পাল্কিতে শুইলেন, তর্কালঙ্কার আশীর্বাদ করিলেন, ও ভ্রূ উত্তোলন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

"ধেনুবৎস প্রযুক্তা বৃষ, গজ, তুরগা, দক্ষিণে তপ্ত বহ্নি।
দিব্য স্ত্রী, পূর্ণ কুম্ভ, দ্বিজ নৃপ গণিকা পুষ্পমালা পতাকা।
সদ্যো মাংস ঘৃতৌ বা, দধি রজত কাঞ্চন শুক্ল ধান্য;
দৃষ্টা স্পৃস্তা পঠিত্বা মানসে গ্রন্থিকামঃ।"

সকলে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় আশুতোষবাবুর নিকট আগত হইলেন; সকলেই উৎসাহিত কেবল দেখিলাম, মুক্তকেশী নিমেষশূন্যলোচনে অমরেন্দ্রনাথের দিকে যেন কিঞ্চিৎ হতাশ বদনে চাহিতেছেন।

আমি কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া ভাবিলাম, এ মুক্তকেশী কে? তর্কালঙ্কার মহাশয় কহেন, তাঁহার শিষ্যকন্যা। আমি ইহাকে আর কোথাও দেখিয়াছি। সেই গজাননের চণ্ডীর মন্দিরে ইনিই না আলপনা দিতেছিলেন? না আর কোথাও দেখিয়া থাকিব, আভাসমাত্র স্মরণ হইল, ইনিই বোধ হয় ছদ্মবেশী কুলকামিনী সেই কাদম্বিনী, দাঙ্গার সময়ে ইহাকেই না বাবু শিবসহায় সিংহের অট্টালিকায় দেখি! বিসর্জনের দিন এই রত্ন হারাইয়াই অমরেন্দ্রনাথ কি অস্থির হইয়াছিলেন?

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ
পরামর্শ

শিবসহায় সিংহ উচ্চ আদালতে অর্পিত হইয়াছেন, এই কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইল। সকলেই দুঃখিত, কারণ শিবসহায়ের সহৃদয়তা ও সরলতায় সকলে মুগ্ধ ছিলেন। কেবল গজাননের ও রঘুবীরের আনন্দের সীমা নাই: একে শত্রুদমন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে আর একটি নিগূঢ় অভিসন্ধি সাধনের বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত। শিবসহায় নগরে গিয়াছেন, তাঁহার গৃহে কয়েকটি অবলা মহিলা মাত্র আছেন, কিন্তু তাঁহার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যের ভাণ্ডার। গজানন ভাবিতেছেন, ডাকাতি করিলে কি হয়? রঘুবীর মনে করিতেছেন, একবার হুকুম পাইবার অপেক্ষা। আজ শুক্লাষ্টমী, জ্যোৎস্না প্রায় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দীপ্তিমান থাকিবে, তারপর অন্ধকার, অন্ধকারই তো ডাকাতের সহায়; অন্ধকারে কার্য অনায়াসে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

গোলাবাটীতে একটি মঞ্চে আজ গজানন সন্ধ্যার পর বসিয়াছেন। বাহিরে কেহ আসিলে "দেওয়ানজী বাটীতে নাই" শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে। সব নিস্তব্ধ, প্রদীপ জ্বলিতেছে না, কেবল গোয়ালঘরের মধ্যে "গুজগুজ" বাক্য ও "হুঁকার ভুড়িভুড়ি" শব্দ হইতেছে।

গজানন কহিলেন, "রঘুবীর, আমার কতকগুলি টাকা বৃথা অপচয় হইল, এই স্ত্রীলোকের অনুরোধে—একটি ছেলেখেলা বলিলেই হইল—কি না শুভ-চণ্ডী পূজায় শত টাকা ব্যয় হইয়া গেল!"

রঘু। এক যাত্রাওয়ালাই তো শ'খানেক টাকা লয়ে গেল, ম'শয়।

গজা। তুমি সব খবর রাখ, ভৃত্যের দরদ না থাকিলে প্রভুর কখন কি ভাল হয়? সে যা হবার হয়ে গেল, আবার বাবাজিকে—কি করি, দেশের রাজা আশুতোষের কথা ঠেলিতে পারি না—দূরদেশে পাঠাইতে হইবে।

রঘু। প্রায় পনর, বিশ ত্রিশ ক্রোশ। সেও তো আর এক শয়ের ধাক্কা।

গজা। এ সকল আঞ্জাম কিসে হয়, ঘরের টাকা ভেংগে বাহিরের কাজ করা কর্তব্য নয়। বাজে আদায়ের উপর দিয়ে গেলেই ভাল হয়।

রঘু। আপনি একবার মহলে শুভাগমন করুন, এবার ধান আবাদ বেশ, প্রজারা সাঅন্ন, একটি চাঁদার যোগাড় করুন।

এই বলিয়া রঘুবীর একবার চতুষ্পার্শ্ব দেখিল, আবার উঠিয়া প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে গৃহের ফটক পর্যন্ত দৌড়িয়া দেখিয়া গেল ও আবার আরম্ভ করিল "কেহ কোথায় নাই।"

গজা। ওদিকে কেহ কোথাও নাই।

রঘু। জাল ফেলা যাক্।

গজা। পাছে মাছি লাগে।

রঘু। এ কি "নড়িস চড়িস পাড়িস্ না", তেমন শিকারী কি আমি?

গজানন কহিলেন, সেরূপ শিকারীকে কি আমি শিকার করিতে বলি। যদি এদেশে তোমার মত পালওয়ান, তোমার মত খেলী, তোমার মত বীর আর একটি থাকিত তাহাকেও এ বৈঠকে আনাইতাম। কিন্তু এদেশে আর দ্বিতীয় নাই, ক্রমে আমরাই দেখিতেছি সকল লোপ হইতেছে। তোমার পিতামহ দলবল সহ এই গ্রাম হইতে মারহাট্টা অশ্বারোহীদিগকে তাড়িত করে, কত প্রজার প্রাণ, কত লোকের মান সেই পঞ্চম সর্দার হইতে রক্ষা পায়। তার গর্জনে ভূকম্প হ'ত, এখানে হাঁক দিলে সেই দূরে নদীর জল কাঁপিয়া উঠিত, নারিকেলপত্র শিহরিয়া উঠিত, সে বীরদর্প আর কোথায়! যা কিছু আছে তা রঘুবীরেই আছে, ওই গেলেই সব গেল, গেলরে রঘু গেল।

রঘু। যে আইন কানন, আর থাকে!

খুঁটির পাশে একটি বালস্বর কহিয়া উঠিল, "কেন টাকবে না? জেটা, আমি বীর হব।"

গজানন চমৎকৃত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "এ কে! বাবা নীলমণি, তুমি এখানে কেমন কোরে এলে?"

নীল। তোমার দপ্তরের কাগজে কালি ঢেলে দিয়ে লুকিয়ে আছি। মশায় বেট হাটে করে ডোরে এসেছিল ও ঐ গরুর জিন পালানের ভিতর লুকিয়ে ছিলাম।

গজা। ক্ষেপা ছেলে, কাগজ কলম দপ্তর কার? গুরুমহাশয় জানে না? সব তোমার, কালি পড়েছে বই ত নয়।

রঘু কহিল, কালি পড়া ভাল লক্ষণ।

গজানন কহিলেন, বাবু, আমাদের কথা ত শুনিস নাই, শুনে থাক তো কাহাকেও বল না।

নীল। আমি ছেলেমানুষ, কি বুঝি।

গজা। বুঝ না বুঝ কাহাকেও বল না। এখন হরি সেকরাকে জাতা দোকান লয়ে এখানে আনাতে হবে যে, সঙ্গে সঙ্গে মাল পার করা চাই, গলান চাই।

রঘু কহিল, সে দুই ফুকেই সব ফুকে দিবে—আমি এখন সাজসরঞ্জম করি।

গজানন কহিলেন, রঘু, আজ শিবসহায়ের গোমস্তা এসেছিল, মোকদ্দমার খরচের জন্য দুটি হাজার টাকা রাঙ্গা ঠাকুরুণকে বলে কয়ে কর্জ দেওয়াইয়াছি। ঠাকুরাণী নোট দিতেছিলেন, আমি রোক্ টাকাটি এই সন্ধ্যার পূর্বাহ্নে দেওয়াইয়াছি। সে শিবসহায়ের বাহিরের সিন্ধুকেই থাকিবে, দেখিস মাল যেন হস্তগত হয়। আমার পাল্কিবাহক প্রস্তুত, আমি এই রাত্রেই মহলে বেরোব, সকল তোমার জিম্মা।

রঘুবীর প্রণাম করিয়া কালীমায়িকে স্মরণ করিয়া গোলাবাটী হইতে বাহির হইলেন।

নীলমণি কহিল, "বাবা কিসের কথা হ'তেছিল?"

গজানন কহিলেন, তুমি সহরে যাবে, নূতন অলঙ্কার হবে তাই হরি সোণার আসবে—

নীল। আর যে সব কথা কহিতেছিলে?

গজা। সে সব শুনে তোমার কি আবশ্যক, তুমি ছেলেমানুষ।

নীল। আমি এই বড় হইছি, তুমি যে বলেছিলে চৌদ্দ বটরের।

কথা কহিতে কহিতে হরি সোণার উপস্থিত। তলব হওয়াতেই সে অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছে, সোণা রূপা গলাইবার সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া প্রস্তুত হইয়া এক ঘরে গোপনে বসিয়া রহিল। এদিকে গজানন তেল মশালের হুকুম দিলেন, লোকে জানিল, তিনি রাত্রেই মহলে গমন করিবেন, কিন্তু গজাননের মনের কথা এক মনই জানে, আর রঘুবীর জানে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ
চাঁদ ডুবিল

শুক্লাষ্টমীর চাঁদ! নিজের আলোকে জগৎ শুদ্ধ আলোকময় করিয়াছেন। দূরে উচ্চ নারিকেল খর্জ্জুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রাশির মন্দ বায়ুচালনে কম্পিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোত পত্রপুঞ্জে হীরকখণ্ডের ন্যায় মহীর কুন্তলে জ্বলিতেছে, শিশিরবিন্দুসমূহ বিচ্ছিন্ন মুক্তাহারের স্বরূপ বসুমতীর উরসে দীপ্যমান। আরও নিকটে আশুতোষবাবুর প্রতিষ্ঠিত নিস্তারিণীর উচ্চ শুভ্র মন্দিরচূড়ে সুবর্ণ চক্র চক্‌চক্‌ করিতেছে ও একটি যন্ত্র কৌশলে সামান্য বায়ুর তেজে থরথরিত হইয়া যেন রত্নকণা নিক্ষেপ করিতেছে। মন্দিরসম্মুখে থরে থরে সোপানসেতুর চরণে সুন্দর সরসী আরসিস্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলের ছবি বক্ষে ধরিয়া ঢলঢল করিতেছে, জল-কিনারায় প্রস্ফুটিত কুমুদিনীনিচয় সুধাকরের স্বর্গীয় অমল কিরণ ভোগ করিতেছে। সুমধুর চন্দ্রকিরণ সুন্দর হরিত দূর্বাদলময় নিম্নগামী-সরসীকূল-কোমল-শয্যাশায়ী।

এ দিকে আশুতোষবাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকার পশ্চিমভাগ সেই আলোকে ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে, এবং সেই পশ্চিম ধারে উচ্চ কক্ষে একটি বারেন্দায় সুকোমল শয্যায় অমরেন্দ্রবাবু শয়ন করিয়া প্রকৃতির এই ছবিখানি মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন। প্রায় সব নিস্তব্ধ, প্রহরী একা শশী জাগিতেছেন, আবার এক একবার ফিণে ফিণে শুভ্র মেঘের চাদরে কলানিধির মুখ ঢাকিতেছে, মেঘ উড়িয়া গেলে হাসিতেছেন, জগৎকে হাসাইতেছেন। অমরেন্দ্রবাবুর হৃদয়াকাশও এইরূপ মধ্যে মধ্যে চিন্তামেঘে আবৃত হইতেছে আবার তৎক্ষণাৎ আশার আলোকে হাসিতেছে। "তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমে যে সুকুমারী আমার কাতরতায় এত কাতর হইয়াছিলেন, তিনি কে? এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও বা কেন লজ্জা হয়? তাঁহাকে কি এ জন্মে আর দেখিব না", এই-রূপ ভাবিতেছেন, আবার চিন্তা করিতেছেন যে, "আমার আহত স্থান তো প্রায় ব্যথাশূন্য হইয়াছে, আর দুই একদিন পরেই অশ্বারোহী হইব,—আবার সেই আশ্রমের দিকে গমন করায় দোষ কি?" এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বারেন্দার পার্শ্বে একটি দ্বার নড়িয়া উঠিল ও পরক্ষণেই দেখিলেন তাঁহার পিতৃব্যপত্নী সমদুঃখশালিনী কোমলমুখী রাঙ্গা ঠাকুরাণী একটি তাল-বৃন্তহস্তে সমাগতা।

রাঙ্গা। কি বাবা, ব্যথায় নিদ্রা আসিতেছে না, রাত্রিও প্রায় দুই প্রহর, আমি বসব?—এই বলিয়াই উপবেশন করিলেন। তালবৃন্ত স্বয়ং হেলাইতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, "বাবা তোমার শিকারের গল্প কর, কেমন করে বাঘ মারিলে?"

অমরেন্দ্র অতি যত্নে সে সমস্ত কথা বর্ণন করিয়া আশ্রমে বিশ্রামের বার্তা

কহিতে কহিতে বলিলেন, "সে কন্যাটি কে? কত যত্নে আহত স্থান ধুইয়া কাতরতা ও স্নেহ মূর্তিমতী!"

রাঙ্গা ঠাকুরাণী কহিলেন, "সেটি কে তুমি জান না, বাবা সেই কন্যা বৌ হ'লে কেমন হয়?"

এখন ঝিলমিলির পার্শ্বে পশ্চিম আকাশের চাঁদ হেলিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোকে রাঙ্গা ঠাকুরাণী দেখিলেন, যে অমরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গী তাঁহার কথামাত্রেই প্রফুল্ল, ও অমরেন্দ্র কহিলেন, "হবার হয় তো তাতে ক্ষতি কি।" কথা উচ্চারিত হইবামাত্র আবার অমরেন্দ্র লজ্জায় গলিত হইলেন। নাসাগ্রে ভ্রূযুগলোপরে শ্বেত সলিলবিন্দু চন্দ্রকিরণে পদ্মকেশরে শিশিরবিন্দুসম উজ্জ্বলরূপে দেখা দিল আবার কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—"খুড়িমা, সে কে? তুমি তো ঐ আশ্রমের নিকটবর্তী শান্তিপুর গ্রামের ঝিয়ারি!"

রাঙ্গা ঠাকুরাণী প্রফুল্লবদনে কহিলেন, "তুমি জান না আমার পিতৃগৃহের নিকটবর্তী সেই মহাদেবপ্রসাদ—নাম করিতে নাই—"

অম। কে, শিবসহায়?

রাঙ্গা। হাঁ। যাহাকে "পশ্চিমে বাবু" কহে, ঐ বালিকা সেই বাবুরই কন্যা, বাল্যকাল অবধি উহাকে কোলে কাঁকে লইয়া মানুষ করিয়াছি, সে আমার নিতান্ত স্নেহের পাত্রী, উহার নামটি কাদম্বিনী। উহার যতখানি রূপ দেখেছ বাবা, উহার গুণ তার চতুর্গুণ; বাবুর এক মেয়ে, ঐ সর্বস্ব, প্রাণতুল্য প্রিয়!

অমরেন্দ্র কহিলেন, "উহার সোদর আর কেহ নাই?"

রাঙ্গা ঠাকুরাণী আবার আরম্ভ করিলেন, "কালীপূজা করে ঐ একটি কন্যা হয়েছিল, কিন্তু যেমন রূপগুণসম্পন্ন তেমনি হতভাগী; তোমাদের সঙ্গে তো ৪।৫ বৎসর জায়গীরের মোকদ্দমায় ঐ বাবু নিসম্বল হন, তারপর সে ঝঞ্ঝাট না শেষ হইতেই মেয়েটির মাতৃবিয়োগ হইল—ওদের ঘরে আবার সেই পশ্চিম থেকে বর এনে বিবাহ দেওয়া প্রথা আছে, এই সব নানা কারণে মেয়েটি অত বড় হয়ে পড়েছে, তার উপর আবার এখনকার বিপদ শুন নাই?"

অমরেন্দ্র কহিয়া উঠিলেন, "তবে ঐ সেই কন্যা যার মিথ্যা মরণসম্বাদ দিয়াছিল?"

"বাবা সেই ঐ—ঐ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য ওদের অধিষ্ঠাতা কি না—তাই গুরু ওকে লুকিয়ে রেখেছে, তা তুমি দেখেছ? আজ রাত্রে কিন্তু তাকে ঘরে লয়ে গেছে—ওদের বাটীতে আজ সত্যনারায়ণের পূজা—পূজা হয়ে গেলে মোকদ্দমা চালাইতে কাল লোক যাবে—এই ভোরেই যাবে।"

অমরেন্দ্র ব্যগ্রচিত্তে কহিলেন, "আপনি এ সকল কথা কেমন করে জানিলেন?"

রাঙ্গা ঠাকুরাণী কহিলেন, "তোমায় সব কথা ভেঙ্গে বলবো, আজ সন্ধ্যার পূর্বে ওদের লোক এসেছিল, দেওয়ানজী থেকে ওদের দুই হাজার টাকা আমি

কর্জ দিলাম। কি করি দায়গ্রস্ত, পরের বিপদ শুনিলে কি স্থির থাকা যায়! আবার আমার বুড়ো বাপের সঙ্গে ঐ বাবুর বড় সম্ভাব ছিল; তাঁহাকে সাহায্য করে কি মন্দ কাজ করেছি?"

অমরেন্দ্র কহিলেন, "পরোপকারই আপনার চিরব্রত, আপনার মতই আপনার কাজ, আমি কি সুখী হইলাম বলিতে পারি না!" কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "তবে কাদম্বিনীর কোথায় বিবাহ হবে?" মনে মনে ভাবিলেন, আমরাও তো ক্ষত্রিয়। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু মুদিলেন, রাঙ্গা ঠাকুরাণী মনে করিলেন রাত্রিবৃদ্ধি হইতেছে। এইজন্য তিনি ত্বরায় আপন মহলে চলিলেন। এ দিকে চন্দ্রঠাকুর অস্তশয্যাশায়ী। কাল মেঘ ধীরে ধীরে তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিতেছে, দিঙ্মণ্ডল আঁধার হইতেছে, অমরেন্দ্রের নয়ন সেই দূর পশ্চিম গগনে নিপাতিত। এই দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধির ক্ষীণরেখা নয়নান্তরিত হইল, যেন বিশাল জাহ্নবীবক্ষে একটি দীপ টলমল করিয়া ডুবিয়া গেল, এই সময়েই একটি "বম্‌কালী" শব্দ দূর হইতে অমরেন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি বোমের শব্দ হইল ও কপাটার্গল ভাঙ্গিবার জন্য ডক ডক কর্ণভেদী শব্দ ঘন ঘন দূর হইতে আসিতে লাগিল। অমরেন্দ্রবাবু ভাবিতেছেন এ কি বিজাতীয় রব! বিকট হুঙ্কার! নরক ঘোষিল, ভূত নাচিল, দেশে আবার কি মারহাট্টা আসিল। বহির্দেশ হইতে একটি শান্ত্রী কহিয়া উঠিল "মানুষের বিপদ যখন হয় এমনই হয়! কালিন্দী সায়েরের পাহাড়ে চড়িয়া দেখিলাম আলো দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, উত্তরে ডাকাতি হইতেছে, ওদিকে আর লক্ষ্মীমন্ত লোক কে আছে, তর্কালঙ্কারের আলোচাল, কাঁচকলা চুরি করিতে কি আর ডাকাত আসিবে? না! এ পশ্চিমে বাবুদের বাড়িতে ডাকাতি। ব্যাটারা খালি ঘর পেয়েছে কি না!"

কথা শুনিবামাত্র অমরেন্দ্রবাবু কহিলেন, "আমার আবার ঘোড়া সাজাইতে বল।" তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল পাছে তাঁহার কাদম্বিনীর কোন বিপদ ঘটে, এমন চিন্তাকালে প্রণয়িনীর বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইলে সাহসী স্বজন কি স্থির থাকিতে পারে? সে উন্মত্ততায় আর কোন জ্ঞান থাকে? শয্যা হইতে ত্বরিত উত্থিত, দণ্ডায়মান। সজ্জাগৃহে যাইয়া নিমেষমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ রণবেশ লইয়া বহির্দেশে আসিলেন। পদের ব্যথা কি আর থাকে, কেহ কিঞ্চিন্মাত্র কাতরতা দেখিল না, স্বয়ং অশ্বশালার সান্নিধ্যে যাইয়া আপন প্রিয় বিশ্বাসী বাহনোপরি আরূঢ় হইয়া ডাকাতি দেখিব বলিয়া শান্তিপুরের দিকে ধাবিত হইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ
ডাকাতি

কেহ জাগ্রত হইতে না হইতেই অমরেন্দ্রনাথ অদৃশ্য হইলেন। এখন চারিদিকে ডাকাতির গোল উঠিয়াছে, এইমাত্র, জ্যোৎস্না অস্তমিত হইয়াছে, জগৎ শুদ্ধ তমোময়, সেই তমোরাশি ভেদ করিয়া এক একটি বিজাতীয় শব্দ শুনা যাইতেছে, "নিলে রে" "গেল রে" "মেলে রে" প্রভৃতি বাক্যগুলির মধ্যে মধ্যে হুঙ্কারমিশ্রিত ঘন ঘন শব্দ শুনা যাইতেছে। শ্রীনগর গ্রামবাসীরা সকলেই উঠিয়াছে, দরিদ্রজন আসিয়া পথে দাঁড়াইয়াছে, ধনীগণ আপন আপন কপাটে দৃঢ় অর্গল বন্ধ করিয়া ছাদে উঠিয়া এক একটি বন্দুক ছাড়িতেছেন। কেহ কহিতেছেন, "এই পথ দিয়া দুই জন লাঠিয়াল সড়কি হস্তে দৌড়িয়া গেল।" কেহ কহিতেছেন, "আজ সন্ধ্যাবেলা ভয়ানক দেখিয়াছিলাম।" দাসীরা বলাবলি করিতেছে, "আজ ঘাটের নিকট শিবমন্দিরের পার্শ্বে দুই জন পাগড়ীওয়ালা দেখিয়াছিলাম, তারাই হবে।" আর একটি বৃদ্ধা কহিতেছে. "চুপ কর তাদের নামে আর কাজ নাই।" আমাদের ভোলাসিং দ্বারবানের এমন সময় দেখা নাই; সেই কহিত, "যব শবশুরা আওয়ে ত ভোলা ভাগে।" সেই কথা সপ্রমাণ জন্য সে কোন নিবিড় বৃক্ষশাখায় গা-আড়াল দিয়াছে। ফলতঃ ডাকাতি যে কোন্ গ্রামে কোথায় হইতেছে, এ পর্যন্ত তাহার নিশ্চয় সংবাদ আইসে নাই। গঙ্গাধর জাগ্রত হইবামাত্র শুনিলেন যে, গ্রামের বার-ইয়ারিতলায় তাম্বুলিদের ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে, বারইয়ারিতলা আমাদের বাটীর নিকট. ডাকাতি দেখিতে হইবে বলিয়া মল্লবেশে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি. এমন সময়ে বুড়ি দাই মা কান্দিয়া জড়াইয়া ধরিল, ফলতঃ তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। অমরেন্দ্রনাথ ঐ বিষয়ের গল্পচ্ছলে বারম্বার যাহা কহিয়া-ছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি।

যে সময় গ্রামে গোলযোগ হইতেছে, বাবুদের ফটকে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল ও তারপর পাহারাদার ঘন ঘন ঘড়িতে মুদ্গর প্রহারে যেন নিশার বক্ষে কতকগুলি নিষ্ঠুর আঘাত করিল, তাহাতে গোলে গোল মিশাইল। বোধ হইল, যেন ডাকাতগণ আরো নিকটে আসিতেছে। সেই ঘড়ি বাজাই-বার সময় অমরেন্দ্রনাথ শ্রীনগর ও শান্তিপুর-মধ্যবর্তী নদীকূলে অশ্বপৃষ্ঠে উপনীত হইয়াছেন। নদীর জল অনেক মরিয়া গিয়াছে, তথাপি গভীর, পারা-পার এখনও নৌকাতেই হইয়া থাকে। কিন্তু নৌকা, নাবিক সংগ্রহ করিবার সময় নাই, তিনি অপর কূলে দূরে দেখিতেছেন, মশালশ্রেণী দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, "মার" "কাট" "ধর ধর" বাক্য সহিত কোমলকণ্ঠনিঃসৃত শব্দ ও ক্রন্দনরোল উঠিয়াছে, অবলাগণ ঘন ঘন আশ্রয় চাহিতেছে; কিন্তু কোথায় আশ্রয় পাইবে? দুই পদ অগ্রসর হয় এমন সাধ্য, এমন সাহস কার আছে? অমরেন্দ্রনাথ আরও ব্যগ্র হইলেন। তাহার পর মনে হইল, যেন তাঁহার

কাদম্বিনী কোন নৃশংস দুর্বৃত্তের হস্তে পতিত হইয়াছেন, যেন তাহারই কাতরোক্তি শুনিতেছেন, বিলম্ব করিবার সময় নাই, অশ্বের রজ্জু ছাড়িয়া দিলেন, অশ্ব জলতরঙ্গে ঝাঁপ দিল। নদীজল বিলোড়িত হইল, গভীর নিশানীরে যে নক্ষত্রপুঞ্জের ছবি জ্বলিতেছিল তাহা হেলিয়া দুলিয়া ছিন্নভিন্ন হইল, ঘোটকের স্ফীত নাসাগ্র হইতে উভয় পার্শ্ব হইতে দুইটি স্থূল ঊর্মি-রেখা ক্রমান্বয়ে বিভাগ হইয়া পশ্চাদ্বর্তী নদীকূলে লম্বতলে প্রতিঘাত হইল। তীরবেগে নদী পার হইয়া ঘোটকটি প্রথমে হ্রেষারব করিল, পরে ঘন ঘন গাত্র কাঁপাইয়া জলকণাসমূহ ঝাড়িয়া ফেলিল; আবার কর্ণদ্বয় পতঙ্গাকৃতি করিয়া বেগে দৌড়িল। শান্তিপুর গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় গোপাল চৌকিদার আপনাপনি বলিতেছে, "হায়! কি হইল, আমি থাকিতে এই গ্রামে এই ঘরে এমন অত্যাচার! লোকে চিরকাল নিমকহারাম বলবে? কি বলিব ঘুমাইয়া ছিলাম, হস্তপদ বান্ধিয়া খাটিয়া ঢাকা দিয়া দস্যুরা চলিয়া গিয়াছে, দেখি একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারি কি না। পারি না। অতিদৃঢ় বন্ধন, জোর দিতে বাগ পাইতেছি না; কেহ কি এসময় এ বন্ধন মুক্ত করে না?" অমরেন্দ্রনাথ কাতরোক্তি শুনিবামাত্র গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি ছুরিকাতে তাহার বন্ধনগুলি কর্ত্তন করিলেন, ঘোড়াটি সেইখানেই রাখিতে কহিলেন, ও স্বয়ং পদব্রজে সিংহবাবুদের গৃহাভিমুখে গেলেন। প্রথমতঃ বাটীর পশ্চিম পার্শ্বে উপনীত হইলেন; এখানে ডাকাতের ঘাটি বসিয়াছে, এক একটি মশাল উত্তোলন করিয়া তাহার চারিপার্শ্বে চারিটি করিয়া চোয়াড় চতুর্ম্মুখ একস্থানে সংলগ্ন করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছে, চতুস্পার্শ্বে সমভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। কয়েক জন ভোতা তরবাল বা তরবালাকৃতি তালশাখাহস্তে লম্ফ দিয়া ডাকাতের খেল খেলিতেছে, হুঙ্কার ছাড়িতেছে। কিন্তু ছাদে চিলা গৃহের পার্শ্বে কারনিসে অমরেন্দ্রনাথ কি দেখিলেন? তলভূমির মশালের আলো প্রায় সে উচ্চ স্থান স্পর্শ করে নাই, কেবল আভাসমাত্র লাগিয়াছে, তাহাতে দেখিতেছেন, যেন মেঘমালার ছায়াবাজির পুতুল শূন্যে আকাশপথে হেলিতেছে। কারনিসে পদস্থাপিত একটি মূর্ত্তির ছায়ামাত্র দেখিলেন, সেই আকাশপুত্তলিকার কর্ণে যেন কি উজ্জ্বল অলঙ্কার দোদুল্যমান রহিয়াছে। সে উচ্চ প্রাসাদ হইতে ছবিটি যেন পড়ি পড়ি করি-তেছে। অমরেন্দ্র ব্যগ্রচিত্তে ভাবিলেন, "কি হবে? এ কে? আমারই কাদম্বিনী না?" অমরেন্দ্রনাথ মাথার উপর দিয়া দুই হস্ত হইতে দুইটি বন্দুক ছুড়িলেন, শব্দের পর চক্ষু চাহিতে কাহার অবসর না হইতেই ঘাটি পার হইয়া দেউড়ি প্রবেশ করিলেন। বাটীর মধ্যে গিয়া দেখেন সকল দ্বারই মুক্ত, কিন্তু প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে দুই চারি জন অস্ত্রধারী পুরুষ রহিয়াছে। পশ্চাতে দেখেন গোপাল চৌকিদার আসিতেছে, সেই পথ দেখাইয়া চলিল, ডাকাইতেরা নির্ভয়। বাহির হইতে কোন আক্রমণের আশঙ্কা নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিল, ইনি গৃহবাসী কোন লোক প্রস্থান করিতেছেন। অমরেন্দ্র-

নাথ সত্বর প্রাসাদের উপর যেখানে আকাশে সেই ছবি দেখিয়াছিলেন, সেই-খানেই উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন একটি সাক্ষাৎ কালমূর্তি গদাহস্তে ছাদের উপর দণ্ডায়মান, তাহার ভয়েই অবলা কাদম্বিনী কারনিসের উপর বসিয়া আছেন, ডাকাইত কহিতেছে, "এই দিকে আইস, না হলে তোমার নাকের ঐ বড় মুক্তাটি ছিঁড়িয়া লইব।" কুমারী কহিতেছেন, "তুই জানিস আমি তোর দেবী সাক্ষাৎ কালী, আমাকে ছুঁইবার জন্য হাত বাড়াইবি কি এই অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ঐ ত্রিশ হস্ত নীচে পোস্তার উপরে ঝাঁপ দিব।" ভাগ্যক্রমে অমরেন্দ্রনাথ এই সময়েই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক হস্তে পিস্তলের উল্টা দিক দিয়া কাল পুরুষের মস্তকে বজ্রপ্রহারে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া অপর হস্তে সুন্দরীর হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। ডাকাতের হস্তদ্বয় হইতে গদকা ও মশাল স্খলিত হইয়া পড়িল। কাদম্বিনী তাঁহার উদ্ধারকর্তাকে—অবলাবান্ধবকে—চিনিয়াছেন, আর ভয় নাই। কারনিস হইতে প্রাসাদে নীত হইলেন—কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই অমরেন্দ্রনাথের কোলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। নীচ লোকের নিকট আপন শস্ত্রনিপুণতা প্রদর্শন করা অমরেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল না, তাঁহার কাদম্বিনীর উদ্ধার করার একমাত্র উদ্দেশ্য, কাদম্বিনীকে ক্রোড়ে লইয়া গোপালের দর্শিতমত গুপ্ত পথে বাটীর বহির্দেশে জলাশয়ের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। এখন ডাকাতেরা জানে না, যে তাহাদের সর্দার ছাদে মৃতপ্রায় শয্যাশায়ী হইয়াছে। তাহারা লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যস্ত। এদিকে কাদম্বিনীর অধরে জলসেচন করায় তাহার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় তাঁহাকে লইয়া গ্রামের বাহিরে আসিলেন। গোপাল চৌকিদারকে কটু দিব্বি দিয়া কহিলেন, "আমি ইহাকে তর্কালঙ্কারের আশ্রমে লইয়া যাই, তুমি কোনমতে অন্য কাহার নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করিও না।"

অমরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ পরে আশ্রমের নিকটবর্তী স্থানে উপনীত হইয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন, "ঐ তর্কালঙ্কারগৃহে যাও, কহিও গুরুদেবই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। গোপাল চৌকিদার অনেক সাহায্য করিয়াছে, দেখ যেন কোনমতে আমার নাম প্রসঙ্গে প্রকাশ না পায়।"

কাদম্বিনী আশ্রমকাননে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার গগন ভেদ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট মনে আপনার প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া প্রিয় ঘোটককে চালিত করিলেন। তাহার অস্ত্রসকল শোণিত স্পর্শ করে নাই—তরবাল কোষমধ্যেই রহিয়াছে, মনে করিতেছেন, "লোকের কি ভ্রম, ডাকাত মারিতে কি বীরত্ব দরকার করে? তাহারা নৃশংস বিশ্বাসঘাতকী লোক, প্রকৃত সাহসী জনকে তাহারা যমস্বরূপ দেখে।" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন একটি শ্মশ্রুধারী অশ্বারোহী পুরুষ দলবলে শান্তিপুরাভিমুখে যাইতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ একটি জঙ্গলবেষ্টিত বটবৃক্ষপার্শ্বে স্থিরভাবে লুক্কায়িত রহিলেন। তাহাদের কথায় জানিলেন, দারোগা সাহেব ডাকাত ধরিতে যাইতেছেন। কিয়ৎকাল পরেই পার্টনির নাম ধরিয়া হাঁক পড়িল।

কারণ পাটনি না আসিলে পুলিসের বীরগণের নদীপার হইবার উপায় কি? অমরেন্দ্র এই ভাবিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে চলিতেছেন, এমন সময় আবার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, তিনি জানিতে পারিলেন যে, আবার ঘরে আসিলেন, আবার রোগীর বেশে শয্যাশায়ী হইতে হইবে।

ঊ ন ত্রিং শ প রি চ্ছে দ
দারোগার চালাকি

বীরপুরুষ দারোগার নদীপার হইতে একঘণ্টা মাত্র দেরি হইল। তিনি ওজোগুণশালী কর্ম্মণ্য কর্মচারী, অপর লোক হইলে হয় ত পার হইতে প্রভাতের তারা এখানেই উদয় হইত। পাঠক হাসিবেন না, এইরূপ চালাকিতে গোলাম রহমান "ভেরি গুড" অর্থাৎ প্রথম বর্গভুক্ত হইয়াছেন—ঢাল ব্রিচ পুরস্কার পাইয়াছেন, কবে ফৌজদার হইয়া পড়িবেন। আবার লোকে বলাবলি করে আসচে দরবারে "খাঁ বাহাদুর" উপাধিও পাইবেন। যাহা হউক দারোগা সাহেব ওকু-স্থলে পেঁৗছিবার পূর্বেই "জাল গুড়াইয়া" ডাকাতগণ "চম্পট" দিয়াছে—গোপাল চৌকিদার আবার হাত পায়ে দড়ি বান্ধাইয়া কাঁদিতেছে, বান্ধা লোককে মারা বড় সহজ, দারোগা সাহেব স্বয়ং গোপালকে দুই একটি প্রহার করিলেন—গোপাল কহিল, "ক্ষমা করুন, মাল, চোর সব হস্তগত করিব। এই যে বান্ধা দেখিতেছেন এ কৌশলের কর্ম, আমি খাটিয়াতে ঘুমাইতেছিলাম, প্রথমে দস্যুগণ বান্ধিয়া গিয়াছিল, পুনরায় এই পথে পলাইবার সময়ও আমাকে বান্ধা দেখিয়া গিয়াছে, মধ্যে যে আমি তাহাদের সর্দারকে ছাদের উপর খুন করে রেখে এসেছি তা কেহ জানে না—এই 'বমাল' দেখুন" —এই কথা বলিয়াই গোপাল একটি বহুমূল্য অলঙ্কার দেখাইল—তার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনমুক্ত হইল। এখনও নিশাকাশ কিঞ্চিৎ ঘোর রহিয়াছে, অমনি দারোগা দলবলসহ বাবু শিবসহায় সিংহের গৃহাভিমুখে চলিলেন, দুইজন বিশ্বস্ত পদাতিক সহিত দারোগা সাহেব গৃহের সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিলেন। গৃহের আকারটি ভয়ানক। সকল কপাটই খোলা, "খাই খাই" করিতেছে। গৃহবাসিগণ অপরগৃহে আশ্রয় লইয়াছে। দারোগার আগমন সম্বাদে এক একজন হস্তপদভগ্ন বা অর্ধদাহিত অঙ্গ ভৃত্য আসিয়া ক্রন্দন করিল; কারও পৃষ্ঠে খোঁচের দাগ, কারও মস্তক-ত্বক্ ভোতা তলবারে কর্ষিত—বাহিরের মালখানার ভাণ্ডারির সর্বাপেক্ষা দুর্দশা, তাহার নিকট হইতে কুঞ্জিকা লইবার জন্য স্থানে স্থানে মশালাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, কারণ রাঙ্গা ঠাকুরাণীর প্রদত্ত দুই সহস্র টাকার থলিটি তাহারই জিম্মায় ছিল। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে অর্ধদগ্ধ মশাল, টাঁটি, তৈলভাণ্ড, তাল-শাখা-নির্মিত শ্বেত চূর্ণলেপিত তরবাল প্রভৃতি স্থানে স্থানে পতিত, বহির্দ্বারে কপাটে কয়েকটি টাঙ্গির

প্রহারমাত্র দৃষ্ট হইল। বৃদ্ধ রামা ভৃত্য কহিল, "আমি সত্যনারায়ণের পূজান্তে শিরণি বণ্টন করিয়া তামাক খাইতেছি আর বেটারা হঠাৎ আসিয়া পড়িল। কপাট ভালরূপে বন্ধ করিতে পারি নাই; একটিমাত্র খিল দিয়াছিলাম. ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ দেখিয়া ঐ পূজার দালানের বড় সিঁড়ির নীচে ফুকরে হামা দিয়া লুকাইয়াছিলাম।"

দারোগা কহিলেন. "তুমি অবশ্যই দুই চারজন ডাকাইতকে চিনেছ।"

রাম কহিল. "তা বড় বলিতে পারি না।"

দারোগা মনে মনে ভাবিলেন, না বলিলে কেন হবে! দুই চারজনকে না চিনিলে এমন বড় মোকদ্দমা প্রমাণ হয়? এই কথার পর দারোগাসাহেব, দুইজন বিশ্বস্ত পদাতিক ও গোপাল চৌকিদার সঙ্গে প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন; তথায় দেখিলেন, এক কালমূর্তি ভীষণকায় দস্যু মৃতপ্রায় হইয়া প্রাসাদে পড়িয়া রহিয়াছে। সর্বাঙ্গে তৈল মর্দিত, রক্তপ্লাবনে কেশদল ভিজিয়া অঙ্গে কয়েকটি রেখা হইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ছাদে পড়িয়াছে; এক ক্ষুদ্র বস্ত্র দস্যুর শ্বশ্রু কর্ণদ্বয় হইয়া মুণ্ডচূড়ে আবদ্ধ—কপাল, চক্ষু, নাসিকার যে ভাগ বস্ত্রের বাহিরে রহিয়াছে তাহা কালিতে লেপিত ও সেই প্রলেপের উপর বৃহৎ বৃহৎ চূণের ফোঁটা। ঊষা উপস্থিত, কিন্তু গগন এখনও ঘোর রহিয়াছে, দস্যু নয়ন বন্ধ করিয়া রহিয়াছে. অনেক চেষ্টাতেও কোন উত্তর দিল না। সে আর কথা কহিবে না, লজ্জায় মুখ দেখাইবে না, তাহার ধাতু ক্ষীণ হইয়াছে, ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষা জন্য প্রেরণ করা আবশ্যক বোধ হইল। দারোগা তাহারই উদ্যোগের জন্য একজন পদাতিককে সত্বর নিম্নে পাঠাইলেন, পরে গোপাল চৌকিদারকে লইয়া দস্যুর অঙ্গান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য মধ্যে ডাকাতের কোমরে কুঞ্চিত বস্ত্রে মোহরের একটি থলি, কয়েকটি রত্নখচিত অঙ্গুরী একটিতে স্বয়ং শিবসহায় সিংহের নাম সন তারিখ মুদ্রিত, আর একটি থলিতে কতকগুলি জড়ওয়া অলঙ্কার বাহির হইল।

দারোগা কহিলেন, "মার দিয়া—ডাকাইতও ধরিলাম, মালও বাহির হইল" —গোপাল কহিল, "আমারও নেকনামি হইতে পারে—"

দারোগা কহিলেন, "আমার হ'লেই তোর; তোরও পুরস্কার না হবে কি?"

রামা কহিল, "এ ত মালের চতুর্থাংশও নয়, এক বাহিরের সিন্ধুক হইতেই নগদ দুটি হাজার টাকা গেছে—কাল সন্ধ্যার পরেই তা আমদানি হয়েছিল।"

দারোগা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোমাদের ঐ সব বাহুল্য কথা—মোকদ্দমা মিছা সঙ্গিন করা কি ভাল, টাকা ছিল? টাকা ছিল? তুই দেখেছিলি? বল দেখি—"

দারোগা সাহেবের ভঙ্গি দেখিয়াই রামা কহিল, "দেখি নাই, শুনিয়াছিলাম—" তবে শুনা—সে কথায় কাজ নাই, এখন ত্বরায় লাস চালান করা চাই —কয়েকটি চৌকিদার দ্বারা দস্যুকে প্রাসাদ হইতে বাহির বাটীতে আনয়ন

করা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গ মায়না হইয়া শুরথালের কাগজ প্রস্তুত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটি চালান দ্বারা বাঁশের খাটুলির উপর অচিহ্নিত পুরুষের লাস বাহিত হইল।

গ্রাম হইতে কিয়দ্দূর যাইয়া প্রাতঃসমীরণে দস্যুর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা হইল—গোঁঙ্গা স্বরে কহিল, "তোদের চিনি রে—জল দে।" একজন চৌকিদার কহিল, "সর্মন্ধিকে ভূতে পেয়েছে আমার কাছেও ঔষধ আছে, এই কুড়ালের এক প্রহারেই মাথাটি ভাঙ্গিয়া দিব।"

রঘুবীর এই ছদ্মবেশী দস্যু, আর কেহ নহে—ভয় পাইল না, কেবল ভাবিল মাতঙ্গের বিপদে পতঙ্গের এইরূপ উল্লাস। তৃষ্ণায় প্রাণাবশেষ, তবু পরশুর প্রহারভয়ে মুখ বন্ধ করিয়া শাস্তিভোগ করিতে লাগিল।

এদিকে দারোগা সাহেব অনেক জাঁকজমক করিয়া তদারকে প্রবৃত্ত। মালের অর্ধেক মোহর ও অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, শতকরা ৫০ টাকার মূল্যের দ্রব্য উদ্ধার হইলেই পুলিসের কৃতকার্যতার উত্তম পরিচয় দেওয়া হয়—ছোট সাহেব বড় সাহেব সকলেই সন্তুষ্ট থাকেন; অতএব সেই পরিমাণেই দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। অপহৃত ব্যক্তির কিছু ক্ষতি হইবে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজ লাভের ও নিজ কার্যদক্ষতার কি ত্রুটি হইবে? ফলতঃ আর চারি পাঁচজন আসামী ও সাক্ষী চাই—দুই একজন একরারী হইলে কেমন হয়? তাইদ আনন্দরাম বাঁড়ুয্যে হাসিয়া কহিয়া উঠিলেন, "তবে ত সোণায় সোহাগা মহাশয়" কিন্তু এ সকল তদ্বির জন্য প্রতিপত্তিশালী দেওয়ানজী গজানন চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্য আবশ্যক।

পাঠক একবার গজাননের গোশালার প্রাঙ্গণকোণে নয়ন নিক্ষেপ কর। তথায় গজানন রাত্রিশেষে যা কিছু মাল পাইয়াছেন উড়াইতে পুড়াইতে ফুঁকিতে ব্যস্ত। টাকার তোড়া দুইটি নিজ ধনাগারে বন্ধ করিয়াছেন, কেবল বাহককে দুই হাতে দুই ফাঁকা মুষ্টিতে কয়েকটি টাকা উড়াইয়া পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়াছেন, জানিতেছেন, রঘুবীর এখন কিয়দ্দিবসের জন্য স্থানান্তরে "গাঢাকা" দিয়াছে—দারোগা সাহেবের লোক আসিয়া তাঁহার ফটকে বসিয়াছে, খবর পাইলেন। গজানন কহিলেন, গরজ পড়িলে অনেক লোক তল্লাস করে —সংবাদ পাঠাইলেন যে তাঁহার হাতে অনেক কর্ম, সব শেষ করে কল্য প্রাতে দারোগা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। দেওয়ানজী বুঝিয়াছেন যে, "যেমন তিনি সর্প হইয়া কাটিয়াছেন, ওঝা হইয়া আবার বিষ ঝাড়িবেন।"

আবার দারোগার নিকট গজাননের আসিবার বিলম্ব সম্বাদ পৌঁছিবামাত্র গোলাম রহমান ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার চক্ষু স্বভাবতঃ আরক্তবর্ণ আরও দুই পোঁচ রাঙ্গা হইল। দাড়ি আঁচড়াইতে লাগিলেন। এবং কহিলেন এই পল্লী ত এখন শ্রীনগর জমিদারীর অন্তর্গত? দেওয়ানজী এ ঘটনার কোন সম্বাদ দেন নাই, কুন্দে বাঁক সারিব—বাঁড়ুয্যে আনন্দরামকে হুকুমনামা লিখিয়া গজাননের কৈফিয়ত তলব করিতে অনুমতি দিলেন। এই অকু গোপন করি-

বার চেষ্টার জন্য জমিদারের নামে কেননা পৃথক অভিযোগ করা যাইবে? সঙ্গে সঙ্গে একজন পদাতিক আবার গজাননের নিকট হুকুমনামা লইয়া দৌড়িল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ
বিদেশ যাত্রা

এদিকে আমাদের নগরে যাত্রা করিবার দিন উপস্থিত। নীলমণি মায়াতে মুগ্ধ—"কানকাটা" "ফটকা" "ছবলা" "বাঘা" "বেঁড়ে" "আহ্লাদে"—তাহার একপাল প্রিয় কুক্কুর রহিয়াছে; আবার ছবলা, পরুপা, মুখিব, গলাফুল ও গ্রহবাজ এক "খাপান" কবুতর ভিন্ন ভিন্ন কাবুতে পালিত হইত; যখন কপোতদল প্রাতে উড়িত ও তণ্ডুল বিতরণ হইত তখন নীলমণিবাবু দ্বিতীয় লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের তুল্য হু হু আ—আহা শব্দে উন্মত্ত হইতেন, তাঁহার বড়ই আমোদ হইত। কেমন করিয়া এই সকল প্রিয় পালিত জীব ছাড়িয়া যাইবেন এই চিন্তায় চঞ্চল হইয়াছেন, এমন সময় গোলাবাটীর দ্বারে পঁটে বাগদি আসিয়া উপস্থিত হইল। নীলমণিবাবুর দিকে চাহিয়াই পঁটে কহিল, "ইহার চিন্তা কি. এই চারমাস বাদে বাবুজীর বিবাহ হইবে, বর সাজিয়া আসিবেন. এ দাস আপনার সকল সামগ্রী রক্ষা করিবে. এক মুঠ টাকা দিয়া যাবেন. খুব চাল ছোলা খাওয়াইয়া পায়রা কুক্কুর মোটা করে রাখিব।"

নীলমণি কহিল. "তাকার অভাব কি? বাবার যে চোরা কুঠারিতে তাকা থাকে সব দেখিছি. তুই চাবি আনতে পারিস?"

পঁটে কহিল. "আমার জ্যেঠা রঘুবীরের অনেক চাবি আছে।"

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পঁটে একগোছা চাবি আনিল। নীলমণি বস্ত্র মধ্যে ঢাকিলেন—অন্দরে মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়া কহিলেন. "মা! আগামী কল্য প্রাতে আমরা যাইব।"

গৃহিণী কহিলেন. "ষাট! যাই বলিতে নাই বাছা, কাল আসবে!"

নীলমণি এ আসা যাওয়ার প্রভেদ কিছু বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু সেদিকে এখন সুবুদ্ধি চালনা করিবার অবসর নাই। কহিলেন, "মা, বাবা ডারগার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন, আমরা ছাদে যাইয়া পায়রাগুলি গুণিয়া পঁটের জিম্বা করিয়া আসি, কুঁজি দাও।"

নীলমণি সোহাগের ধন. তাহার ইচ্ছা অন্যথা হইবার নহে, কুঁজি লইয়া পঁটের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের উপর দ্বিতীয় তলে যাইলেন। গজাননের ধনাগার একটি ক্ষুদ্র কুঠারী, তাঁহার শয়নঘরে প্রথমতঃ প্রবেশ করিতে হইবেক। সেই ঘরের মধ্যে ছাদের সোপানতলে আর একটি ক্ষুদ্র দৃঢ়দ্বার বিশিষ্ট ডবল তালা বন্ধ, লোহার পাত হুড়কা, অর্গল, লোহার গোল মেক সংলগ্ন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার,

এটি ঘরের ভিতর ঘর! এখানে দস্যু চোরের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই, কিন্তু ঘরের চোর হইলে কোন্ দ্বার ভেদ না হইতে পারে? যে রিং সহিত কুঁজিগুলি নীলমণি আপন মাতার নিকট হইতে আনিলেন, তাহার মধ্যে গজাননের শয়নগৃহদ্বার খুলিবার সুবিধা হইল। সেই দ্বার খুলিয়াই চাবির উপর চাবি প্রবেশ করাইয়া ধনাগারের তালা খুলিবার চেষ্টা হইল। কিঞ্চিৎকাল মধ্যেই নীলমণি ও পুঁটে উভয়ে ঘর্মাসিক্ত হইলেন। নীলমণি সকল দিকে সুবুদ্ধি, দক্ষিণে হেলাইতে বামে কুঞ্জিকা হেলাইয়া ক্লান্ত হইলেন; বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন, "পুঁটে টুই ডেখ।" যতই হউক পুঁটে চোরের গোষ্ঠী, পেঁচ বুঝিত, তাহার কুঁজিতেই একটি চাবি খুলিল, আবার চেষ্টাতে কস্তাকস্তিতে কিঞ্চিৎকাল মধ্যে আর একটি তালাও খুলিল। এখন নীলমণি পুঁটের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "টুই খুব বাহাডুর।" এই সন্তুষ্টি ঈশ্বরদত্ত, অদ্য হউক কল্য হউক না হয় দুইদিন বাদেই হউক "চোরের ধন বাটপাড়ে" পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাইবে।

তালা খুলিল, বাহির হইতে ভিতরের অর্গল এক পেঁচেই খুলিল। কুঠারীর মধ্যে—নরকাকাশ ঘোর অন্ধকার—অন্ধকারে পাপকার্যে অর্জিত পাপের কোষের উপযুক্ত স্থানে গজাননের বহুধন স্থাপিত হইয়াছে। এই আলোকবর্জিত স্থানে নীলমণি প্রবেশ মানসে দ্বারমধ্যে মস্তক সমর্পণ করিলেন। করিবামাত্র চিক্ চিক্ শব্দ শুনিলেন, অমনি ত্রাসে বাহিরে আসিলেন, "এর ভিটর কিরে?"

পুঁটে কহিল, "চামচিকা।"

নীলমণি কহিল, "ওরে! চর্ম চটি।"

পুঁটে আবার কহিল, "আমিই ভিতরে যাই।"

নীলমণি কহিলেন, "হাট বাড়া, ডেক, কিসে হাত পড়ে।"

কুঠারীর অন্তর স্থান তোড়ায় তোড়ায় আবদ্ধ, হস্ত প্রক্ষেপ করিবামাত্র একটিতে হাত লাগিল। পুঁটে বাহিরে আনিয়া মুখের বন্ধনরজ্জু কর্তন করিল। এটি শিবসিংহের গৃহ হইতে অপহৃত দুই সহস্র মুদ্রার থলি। দুইজনে চারি মুঠা ভরিয়া যত পারিল টাকা বাহির করিয়া একটি বস্ত্রাংশে বান্ধিলে, পুটলিটি বড় হইল, কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। পুঁটে কহিল, "বেশ বুদ্ধি আছে", কুঠারীর কপাটটি শীঘ্র বন্ধ করিয়া কহিল, "আমি গৃহের পশ্চাতে ময়দানে যাইয়া দাঁড়াই. আপনি এই জানালার রেলমধ্য দিয়া তোড়াটি ফেলিয়া দিন।" কহিয়াই পুঁটে প্রস্থান করিল।

নীলমণি পুটলি নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন, পুঁটেকে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া নীলমণির মাতা ভীতা হইলেন। মনে করিলেন, তাঁহার নীলমণি একা সন্ধ্যাবেলা ছাদে রহিয়াছে। "নীলমণি নীলমণি" জপোচ্চারণ করিতে করিতে উপরতলে উপস্থিত। নীলমণি চমকিত হইয়া বারান্দায় আসিলেন ও কহিলেন, "পায়রা ধরিতে ঘামে ভাসিয়াছি এই বাতাসে বারান্দায় এখন বসি।"

পরদিন প্রাতে আমাদের যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত। তর্কালঙ্কার মহাশয় আশীর্বাদী পুষ্প লইয়া উপস্থিত; মাথায় ফুল দিয়া তিনি অপর স্থানে চলিয়া গেলেন। মাতা সস্নেহবদনে আমার মস্তকোপরি আপন সুকোমল হস্তে ধরিয়া আপনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া সেই দেবীর হস্তেই আমার শুভাশুভ চিরদিনের জন্য অর্পণ করিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার নয়ন অশ্রুতে বিসিক্ত হইল। গঙ্গাধর বড় নিষ্ঠুর, নগরে যাইবে, জ্ঞানলাভ করিবে, নূতন নূতন দেশ ও কত প্রকার মনোহারী দ্রব্য দেখিবার আশয়ে আহ্লাদিত। এখনও নির্বোধ—এখনও এখনও অজ্ঞান অন্ধ জানে না যে, যে ধন আজ ত্যজিয়া যাইতেছে তাহার স্বরূপ গুরুতর নিস্বার্থ স্বর্গীয় পদার্থ জগতে আর কোথাও পাইবার নাই! সেই ধন সুপবিত্র চিরানন্দদায়ী মাতৃস্নেহ। সেই ধন হারাইলে তত্তুল্য বস্তু এই পৃথিবীতে আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই ধন না হারাইলেও তাহার প্রকৃত মর্ম কেহ জানে না, যাহারা হারাইয়াছে তাহারাই জানিয়াছে। মাতার কাতরতা দেখিয়াই আমার সব উৎসাহ শেষ হইল। মন কান্দিল, আঁখিতে কেহ জল দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ; কিন্তু অন্তঃকরণ একান্ত অস্থির হইল। সেই অস্থির মনে গৃহ ত্যজিয়া গ্রামের বহির্দেশে আসিলাম। দেখিলাম, একটি পুষ্করিণীর তটে প্রিয় অনুচরগণ নগেন্দ্র, গোপাল, প্রিয়তমা ভগিনী প্রফুল্লতাহীন বদনে আমার দিকে চাহিতেছেন, কাঁদিতেছেন। প্রফুল্ল আমার প্রিয় হরিণশাবকটিকে ধরিয়া কহিতেছে, "দাদা এটি থাকে না, তোমার সঙ্গে যাইতে চায়।" আমার সব উৎসাহ নিঃশেষ হইল। এই দুইটি নির্মলা প্রীতির পদার্থ দেখিয়া অশ্রুধারা বহিল। দাই মা একবার চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল, উভয়ে উভয়ের দিকে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অনেক দূর আসিয়া দূরাকাশ উভয়কে উভয় হইতে প্রভেদ করিল।

গ্রামান্তরে আসিয়া দেখিলাম, নীলমণির পাল্কী নদীতটে উপস্থিত। একটি বেঁড়ে কুক্কুর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে ও পাল্কির ছাদে একটি পিঞ্জরে কতকগুলি গোলা পায়রা আনিয়াছেন। মনে করিলাম বিদ্যাভ্যাসের বিলক্ষণ সরঞ্জাম হইয়াছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরিভ্রমণ

নদী পার হইয়া কিয়দ্দূর আসিতেই নভোমণ্ডল ঘন ঘোরে আবৃত দেখা গেল। তাহার সঙ্গে ঝড় উঠিল। সঙ্গিগণ কহিলেন, দেবতা দুর্য্যোগ করিবে, সন্ধ্যা উপস্থিত, সম্মুখে ঐ পল্লীতেই অদ্য রাত্রে অবস্থান উচিত। তথায় পঁহুছিবামাত্র দেখিলাম সে পল্লীটি অতি ক্ষুদ্র, বহুজনের থাকিবার

স্থানাভাব। আমি কহিলাম, এখনো বেলা আছে, সম্মুখে ঐ বড় গ্রামে চল। সঙ্গীরা কহিল বেলা নাই, পথিমধ্যেই রাত্রি উপস্থিত হইবে, তাহাদের ভ্রম আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়া দিলাম। কৃষিগণের অনুচ্চমঞ্চে ঝিঙ্গা-কলিকা এ পর্যন্ত মুদ্রিত রহিয়াছে, সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইলে অবশ্যই কোমল জরদরঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগুলি এতক্ষণ প্রস্ফুটিত হইত, সকলে আমার কথা গ্রহণ করিলেন, বিস্তৃত ময়দান হইয়া আমরা শান্তিপুর গ্রামে পঁহুছিলাম। রাঙ্গা-ঠাকুরাণীর পিতৃগৃহে আজি থাকা উচিত বোধ হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সম্মুখের দ্বার দৃঢ় অর্গলবদ্ধ, গৃহবাটী সব নিস্তব্ধ, "পালানে ঘর" যেন কেহ কোথাও নাই; বাটীর অলিগলি আমি সব জানিতাম, পশ্চাৎ ভাগে একটি গুপ্ত দ্বার হইয়া অন্তঃপুরে গেলাম, সকলে কহিয়া উঠিলেন, "এ কি! বাছা, আজ এ গ্রামে আসিতে হয়? এখানে থানাদার দেড়ে দারোগা আসিয়াছে।" অন্দর হইতে বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, সদর দ্বার বন্ধ—গ্রামের অধিকাংশ প্রজা স্থানে স্থানে নীরবে বসিয়া রহিয়াছে—আমাকে দেখিয়াই কেহ কেহ চমকিত হইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া কহিলাম, "আমি দারোগা সাহেবের লোক, তোমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছি।" দুই চারিজন কুটীরে প্রবেশ করিলেন। একটি বৃদ্ধ আমাকে চিনিয়া কহিলেন, "বটে ভাই, তুমিও কালে এইরূপ দোর্দণ্ড হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের কি বিপদ উপস্থিত—কি অপরাধে গ্রামস্থ এত লোক অবরোধে আবদ্ধ?

বৃদ্ধ কাণে কাণে কহিলেন, "শুন নাই? গ্রামে ডাকাতি হইয়াছে—দারোগা আসিয়াছে, আজ তিনদিন আমরা প্রায় অনাহারে যাপন করিতেছি।"

আমি কহিলাম, দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাকে এত ভয় কেন?

বৃদ্ধ কহিলেন, "এটি যথার্থই ডাকাবুক ছেলে, দারোগার কাছে যাইবার আবশ্যক? দাদা, রাত্রে গোপনে এখানে নিদ্রা যাও; প্রত্যুষে প্রস্থান করিবে, এমন অসময়েও এ গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়?"

এই সময় বাহিরের কপাটে একটি ধাক্কা পড়িল—ভীরু প্রজাকুল সংকুচিত হইয়া কুটীরে লুকাইল—কাহার এতদূর সাহস হইল না স্থির থাকেন। দাঁড়াইতে পলাইতেও সাহস চাই। কেহ কেহ পদ সংকোচ করিয়া দুইটি জানুমধ্যে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিলেন। আর ভয় কি?

এদিকে দ্বারে আঘাত আরো বাড়িল, কেহ উত্তর দেন না—আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, কহিলাম, "কে রে?"

একজন দাম্ভিক স্বরে কহিল, "কে রে!" "আমি তোমার রে? এবার রে দেখিয়ে দিব। কেওয়াড়ি খোল তব দেখা জাগা।"

"আমি কহিলাম, "উঃ আবার হিন্দি চালান"—পুরুষ তখন আরো ক্রোধে কপাটে পদাঘাত করিলেন ও কহিলেন, "খুলবে ত খুল না হয় ভাঙ্গিয়া ফেলি।"

আমি কহিলাম, "জোর ত ভারি।" এখন ত গর্জ্জনের শেষ রহিল না—এ দিকে বৃদ্ধ আমার হাতে ধরিয়া বিনয় করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, আর বাড়াইও না—যে ব্যক্তি বাহিরে গর্জন করিতেছিলেন আমি জানিতাম। আমি কহিয়া উঠিলাম "ও কুমুরুদ্দি চাচা, আমায় চিনিতে পার না—কি চাই বল সব হাজির।"

কুমুরুদ্দি কহিলেন, "চারি সের দুধ ও আট বোঝা কাঠ।"

আমি কহিলাম, "এই? আচ্ছা দেওয়া যাচ্চে।"

বৃদ্ধ প্রজাবর্গকে কহিলেন তাঁহারা খিড়কি দিয়া দৌড়িলেন, তাঁহারা গোপনেই বদান্যতার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন।

আমি এখন কপাট খুলিলাম। আমাকে দেখিয়াই কুমুরুদ্দি কহিলেন, "বাবু আপনি এসেছেন? তাই বলি বুড় চাচার সঙ্গে কে মসকরা করে।"

কুমুরুদ্দিকে নিজকার্য্য সাধন জন্য রাখিয়া আমি দারোগার এজলাস দেখিতে চলিলাম—এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে আকাশ ঘোর—এই অন্ধকারেই দারোগা সাহেবের এজলাস গরম হয়। কিন্তু সে এজলাস কিরূপে বর্ণন করিব? হে বাগবাণি! তোমার কৃপায় মহৎ কবিগণ হোমর, ডেন্‌টি, মিল্টন, মধুসূদন প্রভৃতি নরক বর্ণন করিয়াছেন, পবিত্র আর্য্যকুলসম্ভূত জটাধারীর প্রতি কৃপা কেন না করিবে, আমি অনেক স্থান দেখিয়াছি, বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু এখানে আসিয়া কেন মোহে অভিভূত হইতেছি, হতাশে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। ইহার কারণ আছে—ইহা মিথ্যাচক্রের ও দারুণ নির্দয় নিষ্ঠুরতার রঙ্গভূমি। দারোগাসাহেবের আবাসগৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিক হইতে আর্তনাদ শ্রবণকুহর বিদীর্ণ করিতে লাগিল—দৃষ্টি আরো ভয়ানক—এককোণে চারিটি লোকের পদযুগল উল্টাইয়া তাহাদের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সমর্পিত হইয়াছে, কাহার পৃষ্ঠে হাত মুড়িয়া কড় কড় করিয়া বান্ধা হইয়াছে ও সেই বন্ধনসন্ধিস্থানে সমসের খাঁ বরকন্দাজের বৃহৎ চর্ম্মপাদুকাদ্বয় চট্ চট্ শব্দে পড়িতেছে, কেহ এক হস্তে ও এক পায়ে রজ্জুবন্ধনে উচ্চ ধরণায় আলম্বিত, কেহ চীৎকার করিয়া কহিতেছে, আমার হাত ভাঙ্গিয়া গেল বাপরে! কাহারও নখ ও অঙ্গুলির মধ্যভাগ খর্জ্জুর-পত্রের কণ্টকবিদ্ধ হইতেছে, তথা হইতে রক্ত টস টস করিয়া পড়িতেছে। কোথাও দুই জন দাড়িতে দাড়িতে বান্ধা হইয়া লঙ্কামরিচের নস্যঘ্রাণে হাঁচিতেছে ও উভয়ের মস্তকে মস্তকে যেন কোন কলকৌশলে ঠক ঠক ঠেকাঠেকি হইতেছে।

লজ্জার বিষয় কি কহিব! স্ত্রীলোকদের কি লাঞ্ছনা! তাহারা নিরাশ্রয় দরিদ্র লোক! যাহারা অনেক গোলযোগ অনেক অর্থ ব্যয় করিতে পারে তাহাদেরই আপিল আছে। কিন্তু ইহাদের আপিল ঈশ্বরের নিকট ভিন্ন আর কোথায়! কিন্তু এই প্রাঙ্গণ ইন্দ্রিয়-কেলির ক্ষুদ্র অভিনয়স্থল! যেমন একদিকে নিষ্ঠুরতা অশ্লীলতা আবার আর একদিকে হঠাৎ দেখিলে দাতব্যের

রঙ্গভূমি বলিয়া বোধ হয়। তিন চারিটি শীর্ণ জ্যোতিহীন দরিদ্র নীচজাতীয় লোক আজ নূতন বস্ত্র পরিয়া প্রচুর আহারসামগ্রী অন্ন মৎস্য দধি ও দুগ্ধ মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছে। ইহারা কে? শুনিলাম একরারী আসামী. ইহাদের গৃহদ্বার, চালচুল ও জোৎজমি বাস্তুভূমি কিছুমাত্র নাই, বিবাহ হয় নাই; কিন্তু এইবার ভাগ্যোদয় হইবে। ইহারা ডাকাইতের মুটে বা তল্পিদার হইয়া আসিয়াছিল, কহিবে, দারোগাকে ডাকাত ধরিয়া আহত করিতে দেখিয়াছে তাহাও উচ্চ বিচারস্থলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে; তাহা হইলেই সরকারের তরফ সাক্ষী হইবে, খালাস পাইবে; আর খালাস পাইলেই চৌকিদারী চাকরাণ পাইবে, চৌকিদারী কর্ম্ম পাইবে ও তাহা হইলে দেওয়ানজী সাধু বাগদিনীর মত কন্যার সহিত তাহাদের বিবাহ দিয়া দিবেন, তাহারা সন্তান-সন্ততি লইয়া শ্রীমন্ত পুরুষ হইবে। দেওয়ানজী তাহাদিগকে এই সকল ভাবি সৌভাগ্যের প্রলোভ দিয়াছেন; বুঝাইয়াছেন, তাহারাও ভাল বুঝিয়াছে, যে একটু মিথ্যা বলিয়া যদি কপালে এত সুখ হয় তবে আর কাঁথা বগলে কি আবশ্যক?

রাত্রিকালে এই এজলাস দর্শন করিয়া প্রভাতে পুনরায় যাত্রা করা গেল। কিয়দ্দূরে না যাইতেই ডাকবাবু চাটুয্যে মহাশয়ের দূত আসিয়া ঘেরিল। কোম্পানি বাহাদুরের হুকুম, তিনি আমাদের চারিজন বেহারা লইবেন, পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধহেতু বেহারা পাঠাইবার জন্য তাঁহার প্রতি হুকুম আসিয়াছে, কারণ এ চারিজন বেহারা না হইলে লড়াই ফতে হইবার নহে। অনেকক্ষণ উভয়দলে বিবাদ, প্রায় দাঙ্গা উপস্থিত। নীলমণির অনেক টাকা, তিনি মুদ্রাদ্বয় দিয়া রফা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি দূতের সর্দ্দারের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, এই তোমার নাম লিখিলাম; মেজেস্টর সাহেবের কাছে লিখি, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম লইয়া খস্ খস্ করিয়া ইংরেজি টানিতে লাগিলাম, দূত ইংরেজি লেখা দেখিয়াই ভয় পাইয়াছে। কহিল, বক্সিস চাই না, টাকা ফেলিয়াই ডাকঘরে সম্বাদ দিতে দৌড়িল, আমরাও এদিকে শিবিকা উঠাইয়া দিলাম।

আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। এতক্ষণ প্রান্তরে কোথাও শস্যক্ষেত্রের বাঁধ হইয়া কোথাও নদীর কূলে উচ্চ সেতু হইয়া আমাদের দলবল চলিতেছে। নদীর জল অনেক দূর—চরসমূহে কোথাও কেশে, কুশ, উলু, বেণার শুভ্রদল বাতাসে হেলিতেছে, ঘুরিতেছে, তরঙ্গমালার স্বরূপ পুচ্ছবিস্তার উন্নত বিনত হইতেছে। দূরে জলের সহিত মিশিয়া প্রকৃতি জলবিস্তার বলিয়াই এইরূপ ভ্রম জন্মাইতেছে যে বিখ্যাত কোন তন্তুবায় চূড়দাস ভায়া সঙ্গে থাকিলে সাঁতার কাটিতে অবশ্যই সে বনে লম্বমান হইতেন। যাহা হউক এদেশে "বান্ধা রাস্তা" নাই, তথাপি আমাদের গমনের এখনও অসুবিধা নাই।

কয়েকটি প্রান্তর অতিক্রম করা গেল। আকাশে, হিমাগমের শুভ্র রাশি রাশি কার্পাসপিঞ্জিত মেষাকৃতি মেঘমালা; নিম্নে, বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রের

মধ্যে মধ্যে এক একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষ কিম্বা কোন স্থানে পদ্মকুসুমে শোভিত জলাশয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিবার নাই।

এই বিস্তৃতক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র খালের ঘাটে উপস্থিত হওয়া গেল; এইটি জেলার এক রাজমণ্ডলের (পরগণার) শেষ সীমা—এইটি পার হইলেই সদর রাজবিভাগ। খালটি অতিক্রম করিয়া একটি বৃহৎ মৃত্তিকা-নির্মিত সেতু দৃষ্টি হইল, কেহ কহিয়া উঠিল, "ওরে এই নয়া সড়ক।" কিন্তু সড়কে কেহ উঠিল না, তাহার পার্শ্বতলে তলেই সকলে চলিল। আমি ভাবিলাম পথ থাকিতে বিপথে কেন গমন? কিন্তু বাহকেরা তাহা ভাবিল না, সেতুর পদতল হইয়াই আঁকিয়া বাঁকিয়া কাদা, কাঁটা, জল ভাঙ্গিয়া হুছোট খাইয়া কথা কহিতে কহিতে কিয়দ্দূরে একটি জনপদে বিশ্রামস্থলে সকলে উপনীত হইলাম। এই চটিটি একটি বৃহৎ ক্রোশাধিক দীর্ঘ দীর্ঘিকাতটে সংবেশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রবেশস্থলে দৃঢ় ফলকপার্শ্বে আদাহিন্দি বচনপ্রয়োগী পিয়াদাদ্বয় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা নিকটস্থ হইবামাত্র কহিল, "ওই! সরকারি মাশুল দিয়া যাও।"

একজন কহিল, "কিসের মাশুল?"

"কিসের মাশুল মজাটা দেখাব, নূতন সড়ক দিয়া এলে না, ঢোল জারি আছে জান না।"

ঢোল জারিকে ধন্যবাদ দিয়া, তাহার কীর্তিকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা চটিতে প্রবেশ করিলাম। সকলে চলিল। আমি একটি সাথীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন যে, এই নন্দনপুরের থানা—খালের এই পারে চাঁদা সংগ্রহ হইয়া থাকে, সকলকে শুল্ক দিতে হয়, সেই টাকাতেই ঐ সেতু নির্মাণ হইয়াছে। এই সেতুপথনির্মাতা বিশ্বকর্মার মহাকীর্তি, শুল্ক বা শীতকালে চলিলে পথিকের পদ পরিষ্কার থাকে। বর্ষাকালে গমন করিলে কর্দমে নিমগ্ন হইয়া মরণের মাত্র আশঙ্কা থাকে। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐরূপ কর্দমে মরায় এই ময়দানের নাম বামনমারী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এদিকে আর একটি কীর্তি দেখা গেল। ঐ ক্রোশাধিক বিস্তৃত দীর্ঘিকা, সকলে উহাকে "অসুর খাদ" বলে—শত শত বৎসর উহার একই ভাব, একই আকার রহিয়াছে, জলের হ্রাস বৃদ্ধি বড় কেহ দেখে নাই, চতুঃসীমায় দশখানি গ্রামের সহস্র সহস্র খান ধান্যভূমি এই জলে কর্ষণ হইয়া থাকে, প্রচুর মৎস্য জন্মে—ইহাও আশুতোষবাবুর জমিদারীর অন্তর্গত, ইহা তাঁহার প্রজাদের বিশেষ সম্পত্তি—এই দীর্ঘিকা পল্লীস্থ, দেশস্থ, পথস্থ সহস্র সহস্র লোকের জীবনস্বরূপ। দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বের মৃত্তিকারাশি পাহাড়ের স্বরূপ উচ্চ, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে এক একটি পুরাতন শাল্মলী বা তেঁতুল বৃক্ষ দণ্ডায়মান, একটি তেঁতুল-তলে পুরাতন ইষ্টকরাশি। সকলে কহে, যে অসুর এই দীর্ঘিকা খনন করে, ঐ স্থানে তাহার গৃহ ছিল, এখন তিনি পীর হইয়া-

ছেন, কারণ হস্তপদাবিচ্ছিন্ন কতকগুলি মৃণ্ময় হস্তী সেইস্থানে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দেশে এরূপ অসুরের আর জন্ম নাই।

এই দীর্ঘিকাতটেই আমরা বিশ্রাম করিলাম। বিপণিশ্রেণীর সম্মুখে পঁহুছিবামাত্র একটি বৃদ্ধা তাম্বুলিনী যেন কত কালের পরিচিত জনের ন্যায় আমার পিতামহঠাকুরের নাতি বলিয়া নিকটে আসিয়া আমাকে ও কতকগুলি অন্য বালককে কত আদরসহ গৃহে লইয়া গেল। বুড়ি হাসে আর বলে, "এই —গঙ্গাধর 'মেজেষ্টর' এই নীলমণি দেওয়ানজীর আদরের পুত্র—না জানি বাবাজির মায়ের প্রাণটা আজ কত ধড়পড় করিতেছে।" সেই গৃহ কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাদের গৃহ হইল। বৃদ্ধার নাতি নাতিনী সকল শিশুরা আমাদের সঙ্গী হইল, বৃদ্ধার একটি গৌরাঙ্গী বন্ধ্যা বধূ গাভীদোহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুগ্ধ আনিয়া দিল। এক সন্তান বড়শি লইয়া মৎস্য আহরণে দীঘীর দিকে দৌড়িল। একটি ছেলে পিয়ারাবৃক্ষে আরোহণ করিল, আর একটি শশাবনে আঁকশীহস্তে প্রবেশ করিল। আহারান্তে মহাদেবীর মা আমাদের তিনপুরুষের গল্প আরম্ভ করিল—কখন পিতামহ মহাশয় তাহার ঘরের দুগ্ধ ভাল বলিয়াছিলেন, কখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তার হাতের ভাজা মুড়ি বড় "লুণখর" বড় মিষ্ট কহিয়াছিলেন, কখন দেওয়ানজী তাহার গাছের আমড়া অতি মধুরাম্ল বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; এই সব অভ্যস্ত ছড়ার ন্যায় কহিল। আবার কাহার কাছে কয় গণ্ডা কড়ি বা কাপড় পুরস্কার পাইয়াছিল তাহা কহিতেও ত্রুটি করিল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট ও আমার সঙ্গী বালকদের নিকট ও নীলমণিবাবুর নিকট কি কি সামগ্রী পাইবার হকদার তাহাও অগ্রে গাহিয়া রাখিল।

কথা শেষ হইলে ভৈরব কহিয়া উঠিল, "তামুলী মাসির পনর আনা মিথ্যা।"

তামুলী মাসি তাহার পিতাকে অভিসম্পাত দিয়া উত্তর দিল, দোকানে দ্রব্য লইয়া মূল্য না দিয়া প্রস্থান করা অপেক্ষা এ গল্প ভাল।

ভৈরব। যদি করব গল্প, তবে কেন হয় অল্প!

আমি ভাবিতেছি তাম্বুলিনির গল্প কতক্ষণ পথের শেষ হইবে। যাত্রা করিতে ব্যস্ত হইয়াছি, মহাদেবীর মা কহিল, এত ত্বরা করিবার আবশ্যক কি? এই ঘাট পার হইলেই পাদরি সাহেবের গির্জার চূড়া দেখা যাইবে। তাহার সুপরামর্শে আমরা কর্ণপাত করিলাম না, বিলম্ব করিলে রাত্রি হইবে বুঝিয়া তাহার প্রাপ্য বস্ত্র দিয়া যাত্রা করিলাম। এখন পথনির্মাতার গৌরব ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল—নূতন মাটিতে এক হস্ত পরিমাণ গভীর কর্দম। যেখানে মাটি নাই এক বুক জল, কোথাও জল এড়াইবার জন্য কণ্টকবনপরিপূর্ণ উচ্চ জাঙ্গাল দিয়া যাইতে হয়, কোথাও আবার শিবিকাবাহকগণের মস্তকোপরি উত্থিত হইয়া জলা উত্তীর্ণ হইতে হয়—কোথাও ক্ষুদ্র খাল। যে খালের সেতুর উপর এখন পথিক প্রথম শ্রেণীর শকটে কোমল শয্যাশায়ী হইয়া

নিদ্রাবস্থায় বাষ্পীয়যানে বাহিত হন। সেকালে তাহার উপর কোন বদান্য জনের সাহায্যে একটি বড় শুষ্ক অশ্বত্থ বৃক্ষশাখা প্রপাত হইয়া শাঁকোর কার্য করিত। এখানে শিবিকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষশাখায় ভদ্র পথিকজনকে আরোহণ করিতে হইত, গুঁড়ি পার হইয়া ক্ষুদ্র শাখা অবলম্বন করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইতে হইত। আবার কোথাও যেখানে বাদসাহী সড়কের পাকা পুলের দুই পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকারাশি বন্যার স্রোতে বাহিত হইয়াছে, সেস্থানে গ্রাম্য ডোঙ্গাতে চারিজন করিয়া পরপারে যাইতে হইত, ঐ নৌযানে চড়িয়া প্রাণ যথার্থই হাতে রাখিতে হইত। যান টলমল করিলেও আরোহিগণকে স্থির হইয়া থাকিতে হইবেক এই পণ করিতে হইত। এইরূপ একটি খাল পার হইতে হইতেই আমাদের এক বিপদ উপস্থিত, নীলমণির প্রিয় কপোত-পিঞ্জর খসিয়া জলে পড়িল আর ভাসিয়া গেল। নগরে উহা অপেক্ষা ভাল পায়রা পাওয়া যায়, কহিয়া তাহাকে সকলে সান্ত্বনাবাক্যে স্থির করিলাম।

দ্বা ত্রিং শ ৎ প রি চ্ছে দ

রেলওয়ে স্টেশন

যে দুর্গম পথে আমরা ভ্রমণ করিতেছিলাম তথা হইতে এক্ষণে কিয়দ্দূরে ক্ষেত্রমধ্যে একটি সুন্দর সেতুগ্রন্থিত অতি ঋজু পথ দেখিতে পাওয়া যায়, দূর হইতে সেতুটির বড় শোভা, শত শত উন্নত খিলানের সুগোল পরিধি-সূত্র আকাশপটে অঙ্কিত বোধ হইতেছে, সেই খিলানের গর্ভ দিয়া অপর দিকে বহুদূরে শ্বেতাকাশ শস্যক্ষেত্রে সম্মিলিত, আবার সেতুপার্শ্বে সুগঠিত স্তম্ভোপরি তাড়িতবার্তাবাহী তার লম্বমান—যেন ভূমণ্ডলের যজ্ঞোপবীত সুশোভিত। বাস্তবিক পাশ্চাত্য পথের দুরবস্থার সহিত এই পথের সৌন্দর্য ও সুবিধা আলোচনা করিয়া দেখিলে অনুভব হয়, যেন স্বর্গারোহণের পথ।

স্বর্গারোহণের পথ অতি দুর্গম। পথে বিপদ থাকুক বা না থাকুক, দ্বারটি দুষমনের বাস। যমদূতের হাত অতিক্রম করিতে পারিলে সেই পথের পথিক হইতে পারা যায়, আবার শুনা যায় সেই দ্বারে সেই দূতগণের সাহায্যার্থ ভয়ানক কাল নেপালী কুকুর বিদ্যমান; যমালয়ের নিয়মানুসারে সকলকে দংষ্ট্রা বিস্তারপূর্বক ভয় প্রদর্শন করাই তাহার প্রধান কার্য, উদরপূরণের প্রধান উপায়। এই যমদ্বারের প্রতিরূপ মর্ত্যে রেইলওয়ে স্টেশন ঘর। ইতি-পূর্বে এই পথে চলিতে চলিতে যে সেতু দেখিতে পাই তাহার পাশে সত্বর একটি শুভ্র প্রাসাদ নয়নপথে পড়ে। এটি একটি গাড়ি থামিবার স্থান "স্টেশন ঘর"। তথায় পঁহুছিয়া দেখিলাম, সে স্থানটি অতি সুন্দর, স্বল্প-কাল মধ্যে সুরম্য কাননশোভিত মানববাসোপযোগী অট্টালিকাপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু গৃহটি সুন্দর হইলেও যমালয়, যমদূতের অধিকার, চারিদিকে কেবল

কাল চাপকান, কম্বলের কোটসজ্জিত, প্রস্তরকয়লাচূর্ণ প্রলেপিত, মস্তক তৈলসিক্ত, দুষমনমুখশ্রী, দূত-ভূত ইতস্ততঃ ভ্রমিতে দেখা যায়। যেখানে কেবল অসভ্য ক্ষেত্রজীবের বাক্য শুনা যাইত এখন সেইখানে সুসজ্জিত সুসভ্য নানা লোক পাদচালনা করিতেছে। কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল বিনিময়ে বিপণিশ্রেণী-নির্মিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র-খালের জল বিনিময়ে ডজন ডজন সোডাওয়াটরের অগ্নি অস্ত্ররূপ কার্ক ছুটিতেছে। জঙ্গলজাত পারিকুল সেকুল পরিবর্তে রম্ভা, আম্র, বেদানা, আতার ও এলাইচদানার ছড়াছড়ি। যেখানে ভাণ্ডহস্তে করিয়া কাঙ্গালি শিশু, ছিন্নবস্ত্র দরিদ্র দিগম্বরীগণ ক্ষেত্র হইতে শস্য খুঁটিত, যেখানে চটের থলিতে ধান্য সংগ্রহ হইত, এখন সেখানে সুরঙ্গীণ রেশমি ছাতা, কারপেট ও চাকচিক্য বার্ণিস লেদার নির্মিত ব্যাগ, প্রকৃতার্থে হাতে হাতে ঠেকিতেছে, বিবাদ লাগাইতেছে।

"স্টেশন" গৃহের দ্বারে পঁহুছিবার পরেই ক্রমে ভিড় বাড়িল; তিলক-ধারী উড়ের দল, শমশ্রুধারী নেড়ের পাল, শ্রাদ্ধ-দানের কলসীহস্ত ব্যতিব্যস্ত তর্কভূষণ, জাহাজের সারেঙ্গ মিয়া মাজন, পাত্রপূর্ণ সন্দেশহস্ত কুঞ্জর মা চাকরাণী, তার পাশে স্থূলকায় অবগুণ্ঠনবতী রাম ঘোষের গৃহিণী; পাদরি, ফিরিঙ্গি, মলঙ্গি, ব্যাপারী, মহাজন সকলেই এক সংকীর্ণ রেলবেষ্টিত পান্থ-গামী। পাগড়ি পড়িতেছে, ছাতা হস্তান্তর হইতেছে, সন্দেশের হাঁড়ি ভাঙ্গিল, ক্রন্দনের রোল উঠিল, "গেলাম" "গেলাম" "ধাঁ ধাঁ" চড় চাপড়ের শব্দ শুনা গেল; তার মধ্যে কর্কশকণ্ঠোচ্চারিত চীৎকারবাক্য "বে-টিকিটওয়ালা বাহার যা" বলিবৃন্দ কর্ণভেদ করিতে লাগিল। এই তৃতীয় শ্রেণীস্থ পথিকদলের টিকিট বিক্রয়স্থল।

অপর শ্রেণীর টিকিটক্রয়ের গবাক্ষের নিকট আর এক শোভা বিস্তার হইয়াছে। সেই কক্ষসংলগ্ন একটি সুচারু কামরা রসময় কোমল মুখশ্রীতে সুশোভিত। তন্মধ্যে একটি ধনাঢ্য যুবা ও তৎ পার্শ্ববর্তী একটি চঞ্চলনয়না স্বর্ণালঙ্কারাবৃতা কৃশাঙ্গী কামিনী যাদৃশ সুন্দর ততোধিক সুন্দর দেখাইবার কামনায় ওষ্ঠে, গণ্ডে গোলাপী আলতারাগে রঞ্জিত করিয়া সদ্যস্নাত মুক্ত কেশ-গুলি দুই পার্শ্বে ফিনফিনে বস্ত্রমধ্যে আলম্বিত করিয়াছে। এদিকে গাড়ি আসিবার দেরি নাই, কারণ গাড়িবারান্দায় ঘণ্টা বাজিয়াছে; সুদূরে শুভ্র মাস্তুলের একটি হাত খট করিয়া নামিয়াছে, টিকিটবাবুও কট কট করিয়া টিকিট কাটিতেছেন, ব্যঙ্গ করিতেছেন, দন্ত দেখাইতেছেন, গালি পাড়িতেছেন, মধ্যে মধ্যে বড় চাপড়ও তুলিতেছেন, আবার উচ্চ শ্রেণীস্থ জেন্টলম্যান অর্থাৎ বিলাতি সাহেব মানুষ দেখিলে বিনীতভাবে করযোড়ে "লিটল ওয়েট সার টিকিট গিব" কহিয়া নম্রতারাশির পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার চালাকি, ভঙ্গি-রঙ্গ, প্রভুশালিত্ব দেখিয়া মনে করিলাম, টিকিট ক্রয় করা বড় বিভ্রাট, এখানে মানী লোকের মান থাকা দুষ্কর। আবার যেমন দ্বারী তেমনি তাহার আজ্ঞা-বাহী শান্তিরক্ষক। টিকিটবাবুর ইঙ্গিতমাত্র দরিদ্র পথিকজনের অংশ মর্দন,

কর্ণমলন প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর, আবার কাহার প্রতি বিশেষ সানুকূল দেখিলাম, প্রায় শত পদের বাহিরে একটি স্তম্ভপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। টিকিটবাবুর মুখশ্রী এখন বিলক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ঘোর শ্যামবর্ণ, মুখে আঁখির কণিকা হইতে সৃক্কণী পর্যন্ত নিবিড় শ্মশ্রুকেশভূষিত মুখশ্রী, কেশপেটি প্রচুর তৈলসিক্ত, মস্তকে ঘেসও রঙ্গের টুপি, সামনে তিনটি জরির অক্ষরবিনির্মিত, টেবলের উপরিভাগে মাস্টারবাবুর বক্ষঃস্থল পর্যন্ত দেখা যাইতেছে, কাল আলপাখার চাপকানে, নীলসুতের সেলাই দেদীপ্যমান, সর্বোপরি সাদা বোতামটি ঘর হইতে খসিয়া উল্টাইয়া পড়িয়াছে ও গলার নীচে সুপক্ক জামের আভা বাহির করিয়াছে। তাঁহারে আমি দেখিয়াই চিনিলাম দুষমন চেহারা—আমার সঙ্গী ভৈরব কহিয়া উঠিল, এই ত আমাদের গ্রামের স্কুলের ভীম মাস্টার।

টিকিটবাবু এক একটি লোকের প্রতি আবার দয়াবান; কাহাকে খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ও "কম কম ফেন্সিং গলে কম" "রেলজম্পে কম" বলিয়া ইংরাজিতে আহ্বান করিতেছেন; একটি ভদ্র পথিক আমার নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন. "দেখিতেছেন কি? জাতে কর্মকার, যেমন লোহার মত চেহারা তেমনি লৌহনির্মিত অন্তঃকরণ; এদেশে উহার নাম লোহার কার্তিক, আইরণ অক্‌টোবর রাষ্ট হইয়াছে। কোথায় স্কুলমাস্টার ছিলেন, কিন্তু মাস্টারবাবু বলিলে ক্ষিপ্তপ্রায় রাগান্ধ হন, প্রহার করিতে দৌড়িয়া যান।"

আমি কহিলাম, বিলক্ষণ চিনি, আমাদের শিক্ষক ছিলেন। এদিকে পুলিসম্যান কঙ্করতেয়ারি দন্ত কিচিমিচি করিয়া পাটিযুগলে দশ সালের খদির তাম্বুলের পাটকেল রঙ্গের গাঢ় প্রলেপ প্রদর্শন করিতেছেন; সেই দন্তের অনতি উপরে গোঁফের দল, হস্তিশিরে স্থূল কেশস্বরূপ দণ্ডায়মান; মস্তকে পীতাম্বরজড়িত উষ্ণীষ, অঙ্গে কাল কম্বলের কোট, হাতে দণ্ড, ঠিক দণ্ডধর। তাহাকে সান্ত্বনা করিবার এই উপায় দেখিলাম। পান খাইবার জন্য দুটি পয়সা তাহার হস্তে অর্পণ করিলে বিনা কষ্টে টিকিট পাওয়া যায়। ভৈরব সর্দার অগ্রসর হইয়া তাহাই দিল ও আমাদের প্রত্যেক জনের কত ভাড়া লাগিবে জিজ্ঞাসা করায়, তের আনা করিয়া কহিল।

ভৈরব কহিল, "এক আনা কমিবে না?"

পাহারাদার কহিল. "বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা কর।"

বড় বাবু কহিলেন, "বারেন্দায় টেবল রহিয়াছে পড়িতে চক্ষু নাই।"

ভৈরব অগ্রসর হইয়া বাবুকে চিনিল ও সুস্বরে গাইয়া উঠিল, "চূড়া ছেড়ে এবার পাগড়ি বান্ধা—এত সেই আমাদের মাস্টারমশয়! টিকিট দেনত।" একে মাস্টার তাতে মশয়, বাবু পর্যন্ত বলিল না, সম্বোধন শুনিয়া টিকিটবাবু মনে করিলেন যেন তাঁহার অঙ্গে অগ্নিরাশি বিকীর্ণ হইল, যে লৌহযন্ত্রে টিকিটে কট কট করিয়া চিহ্ন দিতেছিলেন, দুই হস্তে উঠাইয়া ভৈরবের

মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; ভাগ্যক্রমে তাহা কাষ্ঠাসনে দৃঢ় আবদ্ধ ছিল।

আমি ত্বরায় বিবাদস্থলে গমন করিলাম ও কহিলাম, "বড় বাবুজী, ভৈরব চাষা আপনার মর্ম্ম কি জানে, অনুগ্রহ করিয়া টিকিট দেন।" যেন খঞ্জ ভীমকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই, এইরূপ ব্যবহার করা গেল। টিকিট লওয়া সাঙ্গ হইলে "খোঁড়া ভাল আছ।" বলিয়াই আবার ভৈরব প্রস্থান করিল। টিকিটবাবু জানিতেন যে, স্কুলমাস্টার অপেক্ষা সহকারী এস্টেশন মাস্টারের পদ অনেক মানশালী। হুকুমে ট্রেণ টচ করে, ট্রেণ স্ট্যার্ট করে, গাড়ি থামে, গাড়ি ফিরে, গাড়ি চলে। হুকুমে রাজা মহারাজেরও গতি বন্ধ হইয়া যায়। এখন জানেন না, যে আবার ঘন ঘন হাতকড়িও পরিতে হয়।

যাহা হউক আমরা এখন সকলে টিকিট ক্রয় করিলাম। ভৈরব ইত্যবসরে হারাইয়াছে শুনা গেল, দূরে যাইয়া তামাক টানিতেছে, গাড়ি আগতপ্রায়, ত্বরায় আসিতে আদেশ করায় ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "পয়সা দিয়াছি ডাকিবে না?" যাহা হউক সকলে একত্র হইয়া গাড়িবারান্দায় দণ্ডায়মান হইতেই শকটশ্রেণী দূরে দেখা গেল। ভৈরব তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া, অগ্নিরাশি ধূমপুঞ্জ দেখিয়াই পলাইল ও কহিল, "এ বড় আপদ, আমি চারি ক্রোশ পথ পায়ে শেষ করিব।"

সম্প্রতি রেলগাড়ির কথা যাক, পূর্ব্বকালিক পথের কষ্ট বর্ণন করিতে করিতে এই কথা পড়িয়াছিল। আমরা কয়েক দণ্ডের মধ্যে নগরের নিকটস্থ হইলাম। ক্রমে নগরের শত শত অট্টালিকাশ্রেণী, কত শত ধ্বজামন্দিরচূড়া, শত শত অর্ণবপোতের পটদণ্ড যেন পত্রশাখাবিরহিত শালজঙ্গল গোধূলির গগন ভেদ করিয়া নয়নপথে আসিল। ক্রমে আমাদের ভ্রমণ শেষ হইল। আমরা নাগরিক স্টেশনে উপনীত হইলাম।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ
নগর পরিদর্শন

যাহারা রঙ্গ ময়লা হইবার ভয়ে সূর্য্যালোক ত্যাগ করেন, শ্লেষ্মার ভয়ে বায়ুসেবনে বা চন্দ্রকিরণ সন্দর্শনে ভয় পান, যাহারা কোমল চরণ কঠিন হইবার আশঙ্কায় পদচালনা ত্যাগ করিয়া চরণ মাথায় রাখিতে চাহেন, যাহারা ক্ষুধার ভয়ে বা খাদ্যখরচাশঙ্কায় পরিশ্রমবিরত, যাহার অন্তঃকরণের ক্ষুদ্রাধার বশতঃ তাবৎ পৃথিবীর জনপদে প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে অশক্ত,—তাহারা যে যার কোঠর বাসের স্বচ্ছন্দতা ভোগ করুন, যাহারা সংকীর্ণ স্থানে থাকেন তাহাদের হৃদয়কোরকও সংকীর্ণ; তাহারা পরিভ্রমণের আমোদ, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রীদর্শনসুখ, ও বৃহৎ বৃহৎ সুপারিষ্কার অবারিত বায়ুপূর্ণ অট্টালিকাবাসের মনোবিস্তারকারিণী প্রবৃত্তি বা আনন্দসম্ভোগ করা দূরে থাকুক—অনুভব

করিতেও অক্ষম; তাহারা যে যার পিঞ্জরে কল কল করুন। গঙ্গাধর আজ (ভৈরব) ভৃত্যকে লইয়াই নগর ও তাহার প্রধান জ্যোতি ভাতি বিচারালয় পরিদর্শনে বাহির হইলেন।

তাবৎ নগরই একটি বৃহৎ উদ্যান বোধ হইল, কাননশোভিত মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ সুরম্য হর্ম্যশ্রেণী-বিরাজিত, স্থানে স্থানে বৃক্ষশ্রেণী, কুসুমোদ্যান, জলপ্রণালী ও সুন্দর পথ। মধ্যে মধ্যে পদপার্শ্বে মহজ্জনের প্রস্তরপ্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ দূরে একটি পোতমালাপরিপূর্ণ স্রোতস্বতী। একটি কলের বাষ্পীয় তরণী দেখিয়া ভৈরব কহিল, যাহারা এইরূপ অচলকে সচল করিয়াছে তাহারাই দেবতা। ঐ দেখুন এক একটি "নীল কোট—" গোরাখালাসী যেন যথার্থ অসুর-অবতার! তার পাশে আবার আমাদের গাধাবোট দেখুন, নয়খালির বা নাটোরের মাঁজি দেখুন, ময়ূরের কাছে পেঁচা, দেবতার পাশে ভূত!—

রাজপথপার্শ্বে একটি উচ্চ পাথরের মূর্তির মস্তকে কাক বসিয়াছে, ভৈরব দেখিয়া কহিল, এ কোন অপরাধী হইবেক, কি দোষ করিয়াছিল যে এত শাস্তি? অনাবৃত মস্তক—তাপ-জল সমান ভোগ করে—চিল, কাক পর্যন্ত যা খুসি করিতেছে?

আমি কহিলাম, এ একটি মহাত্মা—অনেকের দুঃখ মোচন করিয়াছেন।

ভৈরব কহিল, উত্তম প্রতিফল পাইতেছে! আবার নিকটস্থ একটি গৃহমধ্যে ঐরূপ আর একটি বৃহৎ সুপরিষ্কার শ্বেতমূর্তি দেখিয়া ভৈরব বড় সন্তুষ্ট, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, যেমন মন্দির তেমনি দেবশ্রী, ইনি কোন্ ঠাকুর?

আমি কহিলাম, ইনিও অনেক লোকের উপকারী।

ভৈরব কহিলেন, ইনি ধনী লোকসমস্তের উপকার করিয়া থাকিবেন, তাই মাথার আশ্রয় পাইয়াছেন, আর বাহিরে যাঁহার মাথার আবরণ নাই, তিনি দরিদ্রদুঃখীর ভাল করিয়া থাকিবেন। দর্শকদলের মধ্যে কোন ব্যক্তি কহিলেন, এইরূপই সকল নগরে দেখা যায়, রাজধানীতে ইহার নজির আছে, যে লাটসাহেব দশশালা বন্দোবস্ত করেন তাঁহার মূর্তি সুরম্য মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, আর যে মহাত্মা দরিদ্রদুঃখী বিধবাদের সহমরণ উঠাইয়া জীবন্ত জ্বালায় সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার মূর্তি অনাবৃত স্থানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র ও শ্রাবণ মাসের মুষলধারে বৃষ্টিতে কর্মভোগ করেন, বজ্রাঘাত লাভ হইলেও হইতে পারে।

এই কথাটি শেষ না হইতেই একটি ঘড়িওয়ালা ঢং ঢং করিয়া ঘড়ি বাজাইল। দর্শক কহিলেন, কাছারি যাইবার বেলা হইল ও কহিতে কহিতে কাছারির পথে চলিলেন, পথপানে আমিও চলিলাম, চারিদিক হইতে অশ্বশকট দৌড়িতেছে, পালকিবাহক "হিনূনাড়া" বলিয়া আসিতেছে, পদব্রজেও শামলা পাগড়িভূষিত কুর্তি-নবিশ শাল রুমাল হইতে ছেঁড়া চাপকান ও ছিন্ন-গামছা-

ধারী রঙ্গবরঙ্গের লোক সসব্যস্ত। একই মুখে দৌড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একটি কদমবাজ ঘোড়া চলিতেছে। নদীর দিক হইতেও ক্ষুদ্রতরী ক্ষুদ্র পালভরে আসিয়া কাছারির ঘাটে উপনীত হইতেছে, সকলই ব্যস্ত যেন একটি সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। একটি প্রশস্ত পথগামী হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে কাছারি গৃহের সুবিস্তার উচ্চ সোপানশ্রেণীতে উপনীত। সোপানশ্রেণী বটচ্ছায়াবৃত বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূরে একটি প্রকান্ড পাকুড়বৃক্ষতলে ইষ্টকনির্মিত গাজি-পীরের আস্তানা, সকলে সেলাম করিয়া শিরণি মনন করিয়া বিচারালয়ে প্রবেশ করিতেছে—পীরসাহেব উকিল সরকারের অপেক্ষা সুবুদ্ধি, দূদিক্ রাখেন, শিতু ক্ষেপার অপেক্ষা উভয়দলের আত্মীয়—দুদিকে গান—যার জয় তারই শুভাকাঙ্ক্ষী, তারই ফি পান, তারই জয়কীর্তি করেন, সেই তাঁর দরগায় ফয়তা দিয়া যায়।

বিচারালয় মধ্যে প্রধানকক্ষে যাইয়া ভক্তিভাব উদয় হইল। কক্ষটি সুবিস্তার, তাহাতে দুই একটি পূর্বতন বিচারকের স্মরণচিহ্নস্বরূপ প্রতিমূর্তি যেন সজীব, শোভমান—একপার্শ্বে বিচারকের উচ্চাসন, ক্রমান্বয়ে থরে থরে কার্যা-কারী, উকিল, মোক্তার, সাক্ষী, বাদী, প্রতিবাদী, দর্শকদলের রেলবেষ্টিত কাষ্ঠাসন, বিচারাসনের সম্মুখে নীলরঞ্জিত পরদা দোদুল্যমান, সর্কাল পরিষ্কার, দেখিলে বোধ হয় ইহাই বিচারমন্দির আর মফস্বলের খোড় মুন্সফি আদালত ইহার কাছে গো-খানামাত্র। আমরা স্থিরভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইলাম, পার্শ্বের একটি কামরা হইতেই বিচারক বাহাদুর বহির্গত হইয়া আসন পরি-গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেবমূর্তি, স্বচ্ছ সরলভাব কোমল শতদলের ন্যায় মুখশ্রী; মস্তক, ভ্রূ, কর্ণদ্বয়পার্শ্বে কেশদল তুষারবিনিন্দিত শুভ্র; গলাবান্ধা, কোট, নিম্নস্থ ওয়েস্টকোট, পেন্টেলুন, পদাবরণ সকলই শুভ্র; প্রকৃত শ্বেতাঙ্গ যেন শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত শ্বেতাবতার, সুগম্ভীর মনুসন্তান অথচ হাস্যময় ওষ্ঠদ্বয়—যতদূর বুদ্ধি ততদূর সুবিচার করিতে একান্ত স্বেচ্ছা।

ভৈরব কহিয়া উঠিল, "এই কি জজ লসুল?" অমনি পশ্চাৎ হইতে একটি বুড় চাপরাসী তাহার ঘাড় ও অংশভাগ দলন করিয়া দশপদ পশ্চাতে রাখিয়া আসিল। সাহেবের আবির্ভাবমাত্র একবার সকলে নতশির, সেলামে সেলাম। তাঁহার সম্মুখে কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে দেওয়ান রামকানাই মুন্সী লাঢ়ঢুদার পাগড়ী শিরে ও বৃহৎ ঘেরদার জামাজোড়া-সজ্জিত হইয়া বিরাজ-মান—ফিট গৌরবর্ণ, সুগোল মুখ, গৌরাঙ্গদাস বড় গোসাঞের মত শ্মশ্রুহীন, গোঁফহীন; জামার বন্ধ গুচ্ছ দক্ষিণ পার্শ্বে স্থানে স্থানে হিল্লোলিত। দেওয়ানজীর পোশাকের কেতা দেখিলে বর্তমানকালে কোটধারী বেরিস্টার সাহেব অনেকে বুড় জাম্বুবান বলিয়া হাস্য করিতে পারেন, পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্বেও একটি ইংলন্ড হইতে নবাগত যুবা সাহেব তাহাকে দেখিয়া "এই কি হিন্দু বিধবা" বলিয়া কৌতুক প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু পোশাকের দোষে তাঁহার বুদ্ধি দূষিত ছিল না। সুযোগ্য সদাশয় পুরুষ, কর্তৃপক্ষগণ তাহার

তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে পারদর্শিতায় একান্ত বশীভূত। সকলে জানিতেন তিনিই কলকাঠি, নামে না হন, কাযে তিনিই জজ।

সাহেব বাহাদুর আসন গ্রহণ করিলে প্রথমেই দেওয়ানজী কহিলেন, আজ দাওরার দিন স্থির ছিল, কিন্তু মোকদ্দমা চলিবার নহে।

সাহেব বড় খুসি হইয়া হাস্যবদনে কহিলেন, মোকদ্দমা না চলিলে ত সকলের আরাম।

একটি মোক্তার কহিলেন, "আমাদের কিসে দিনপাত হয় ?"

দেওয়ানজী ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "নিতান্ত গোস্তাক কি বল, কি কও, কেবল হুজুরের শিরদার্দ্দ মাত্র লাভ।"

সাহেবের সিংহাসনপার্শ্বে একটি পুষ্ট পিচনির্ম্মিত যষ্টি ছিল, এক হস্তে ধরিলেন অপর হস্তে অংগুলি নির্দেশ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "হরমজাডা বাহির যাও"—দেওয়ানজীর প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মোকদ্দমা অদ্য প্রস্তুত না থাকিবার কারণ কি ?"

দেওয়ানজী কহিলেন, "দুইটি মোকদ্দমা বাবু আশুতোষ রায় মহাশয়ের জমিদারী হইতে আসিয়াছে, একটি দাংগা একটি ডাকাতি। এক মোকদ্দমার বাদী দ্বিতীয় মোকদ্দমার প্রতিবাদী—ডাকাতি মোকদ্দমার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘটনাস্থলে মস্তকে আহত হয়, সেই আঘাতে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, এক্ষণে জবাব দিতে অক্ষম, সুতরাং উভয় মোকদ্দমাতেই বিচারের দিন পরিবর্তন করিতে হইবেক।"

সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা হুকুম লিখও।"

দেওয়ানজী কহিলেন, "আজ অপর কোন জরুরি কার্য্য নাই।"

এই সময়ে যে মোক্তারটি গোস্তাকির জন্য বহিস্কৃত হইয়াছিল, এজলাস কক্ষের একটি দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে দেওয়ানজীর প্রতি মিনতিভাবে দেখিতেছেন। দেওয়ানজী দৃষ্টি করিবামাত্র সম্ভাষণ করিলেন, "আরে ওখান হতে কি বল, কিছু কি শুনা যায়, নিকটে এস, আমি তোমার কথা শুনি, বুঝি, শ্রীহুজুরের বুঝায়, তবে ত কাজ চলে।"

হুজুরালি আপন আসন হইতে হেলিয়া মোক্তার প্রতি দেখিলেন ও হস্তোত্তলন করিয়া আহ্বান করিলেন, "আও, আও বাবা, আও।"

জজ। তোমার হস্তে ঐ ছাবার কাগজ কি ?

দেও। এ গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা গেজেট, আজ কয়েকটি নূতন উপদেশ প্রকাশ হইয়াছে—

জজ। কি ?

প্রথমতঃ "কোন সহরে কুকুর হত্যা করিয়া আনিলে একজন কভেনেন্‌টেড্ অর্থাৎ চিহ্নিত আসিস্‌টাণ্ট সাহেবের স্বচক্ষে তাহার কাণ কর্ত্তন করিয়া হন্তারক ডমকে পুরস্কার দিতে হইবেক।"

জজ সাহেব কহিলেন, সেরেস্তাদার একথা নূতন নহে, পুরাণ সার্কিউলার-

বিধিমাত্র আমার বেশ স্মরণ আছে, পুরাতন সময়ে এই কার্য্য আমার জিম্বা ছিল, আমাকে সকলে "কাণকাটা আসিস্‌টাণ্ট" কহিত।

দেও। ধর্মাবতার, জোনাব! সব কার্য্যই করিয়াছেন, আরো নূতন সার্কিউলার আছে—"বোর্ড অব রেবেনিউ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে আদেশ করিতেছেন, যে ইংরেজী চর্ম্মে নির্ম্মিত পাদুকা ভিন্ন দেশীয় বিনামা দরবারস্থ বা এজলাসস্থ হইবে না।"

জজ। এভি পুরাণা সার্কিউলার হ্যায় লেকেন্ ফের জারী উহা, অচ্ছা হুয়া।

দেও। ইংরেজ মুচিদের খুব মুনফা হবে—

জজ। তোমাদের পায়ে কি জুতা আছে? এই কথা উক্ত হইবামাত্র যাহাদের পায়ে দেশী জুতা ছিল, সকলে এজলাস কামরা হইতে বহির্দ্দেশে আসিতে বাধ্য হইলেন।

জজ সাহেব ইংরেজী জুতার কোমলতা ও আরাম সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন ও কহিলেন, "আমাদের সম্মানচিহ্ন মস্তকে অর্থাৎ আমরা টুপি খুলিয়া সম্মান করে—মুলুকী লোকের সম্মান-চিহ্ন ঐ পায়ে, জুতা খুলিলেই—ফেকিলে না—সম্মান করা হইল এমন সামান্য কথাতেও তোমাদের ভুল হয়, কি নিবুদ্ধি!"

দেও। এখনও বোর্ডের হুকুম চলিতেছে "কোন খাজানাখানার কর্মচারির অনবধানতাবশতঃ সরকারের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, প্রায় ৫০ টাকা মূল্যের পোসটেজ্ এসটেম্প আবর্জনীব সাথে ফরাস বাহির করিয়া লইয়া ময়ল ফেলা গাড়িতে উঠাইয়া দেয়—অনেক তল্লাসে খাজাঞ্চির স্বয়ং অনুসন্ধানবশতঃ ঐ টিকিটগুলির অর্দ্ধেকমাত্র উদ্ধার হইয়াছে, ভবিষ্যতে এইরূপ ক্ষতি নিবারণ হেতু আদেশ করা যাইতেছে যে, খাজানাঘর পরিষ্কারের সময় কর্মচারী স্বয়ং চিমটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন, টুকরা কাগজ উঠাইয়া পরীক্ষা করিবেন ও এই নিয়মানুসারে যে কার্য্য হইতেছে তাহার সার্টিফিকিট দৈনিক হিসাব প্রেরণকালে স্বহস্তে লিখিয়া দিবেন।"

জজ সাহেব কহিলেন, এটি নূতন সার্কিউলার। লপলণ্ড সাহেবের সুবুদ্ধি ও দক্ষতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে।

দেওয়ানজী কহিলেন, "নূতন মিউনিসিপাল আইনেও একটি নূতন কথা আছে"—

জজ সাহেব সব্যগ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? আপিল আদালতের সকল কথা জ্ঞাত থাকা উচিত।

দেওয়ানজী কহিলেন, "অদ্য হইতে নগরের সমস্ত শ্বেতখানার স্বত্ব কমিশনরদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।"

স্বত্ব বুঝিতে স্বত্ব-রস বুঝিয়া সাহেব বাহাদুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন, "কমিশনর লোককো হাত বড়া ময়লা হোগা।"

দেওয়ানজী কহিলেন, "স্বত্ব 'হক' কমিশ্যনর লোককা দখলমে আয়া"—

"হাঁ হাঁ হাম সমজা, আজ বহুত কাম হুহা, কাছারি বরখাস্ত করো।"

গাড়িবারান্দায় গাড়ি লাগিল, পাখা থামিল, এজলাস ঘর একপলে লোক-শূন্য হইল।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পাঠ্যদশা

ঘাড়ে যুগল পড়িয়াছে—বিদ্যালয়ে পাঠকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছি—প্রতিযোগিতা উদ্দীপিত হইয়াছে। কেহ মন্দ না বলে, সুনীতি-সুশীলতা-সুশিক্ষায় সুখ্যাতি লাভের ইচ্ছায় সকল প্রবৃত্তি বিদ্যাভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। অধ্যাপকের কএকটি সুমিষ্ট বাক্য আমার অন্তঃকরণে চিরাঙ্কিত হইয়াছে। এক দিন পাঠ দিবার সময়ে আমাদিগকে গল্পে রত দেখিয়া কহিলেন, "অনর্থক কথাতে সময় ব্যয় করিয়া আমাদের আয়ু-পুঁজি ফুরাইয়া যায়, অনর্থক বাক্যব্যয়েই আমাদের বঙ্গজাতির নিতান্ত আমোদ, কিন্তু সেই আমোদেই আমাদের প্রগাঢ় শ্রমলব্ধ জ্ঞানার্জনে অক্ষম করিয়াছে। ঐ বৃহৎ পুস্তকালয় দিকে দৃষ্টি কর, সহস্র সহস্র বলিলেও হয় লক্ষ পুস্তক পুস্তিকা সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু উহা জ্ঞানার্ণবের বেলাভূমির কয়েকটি ঊর্মিমাত্র, ঐ ঊর্মিগুলি পার হইলে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলেও জ্ঞানবারিরাশি অস্পর্শ থাকে, অতএব সেই অম্বুর বিস্তার চিন্তা করিয়া যদি বিদ্বান হইবার ইচ্ছা থাকে তদনুসার সময় ব্যয় করিতে শিখ—আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, বাঙ্গালীর, তোমাদের অপেক্ষা দুর্দশা দেখিয়াছি—বিদ্যামন্দির ভিন্ন আমাদের আশ্রয় আরাম প্রকৃত সুখের আর স্থান নাই; আপাততঃ আর সকল দ্বারই বন্ধ—জ্ঞান-পতাকা ভিন্ন আর কোন পতাকার নিকটস্থ হইবার ক্ষমতা নাই!" এই কথাগুলি আমার মনে জাগরূক চিরকাল ছিল। আলস্য সময়ে সেইগুলি মনে করিলে আমি পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইতাম, স্বশ্রেণীস্থ যে ছাত্র অলসস্বভাব দেখিতাম তাহাকেই মনে করিয়া দিতাম, এমন কি, এই বাক্যে আমাদের সঙ্গী সকল বালকই—নীলমণি পর্যন্ত পরিশ্রমী হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে আমাদের ঘণ্টা, দিন, মাস অতীত হইতে লাগিল, আমাদের পাঠোন্নতি দৃষ্টে সকলে সন্তুষ্ট,—আমাদের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় ঘন ঘন পত্র লিখিতে লাগিলেন ও কর্তৃপক্ষ হইতে ঘন ঘন উৎসাহসূচক উত্তর আসিতে লাগিল, নীলমণির হাতে অনেক টাকা আসিতে লাগিল, কারণ গজানন তাঁহার বিদ্যানুরক্তি শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রায় বৎসরাধিক এইমত গত হইল। নীলমণি আমায় মধ্যে মধ্যে কহিতেন "যাদের এত টাকা তাদের বেশী লিখাপড়া শিখা কি আবশ্যক, এত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'বিদ্যারূপ মহাধন'—যাদের অনেক ধন নাই

তাহাদেরই বিদ্যাধন আবশ্যক, আমার কি? বাবার এক ঘর টাকা আছে।"

তাহার যেরূপ মনোনিবেশ কিঞ্চিৎ সময় দেখিয়াছিলাম তাহা শিথিল হইতে লাগিল—কিন্তু বাহ্যিক শোভাপারিপাট্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার কেশবিন্যাসের লালিত্য, সুগন্ধ ছড়াছড়ি, চেলির কাপ্তেনি কোট,—ঘাড়ের স্থূল স্বর্ণচেন, হীরক অঙ্গুরীয়, বিলাতি কারিকর-বিনির্মিত চকচকে বুট, রেশমী মোজা, ফুলদার লেবেণ্ডর ভরভরিত রুমাল, হস্তিদন্তনির্মিত যষ্ঠি, নীলরঙ্গের ডবল চশমা দৃষ্টে, তাহার পিতার ধনশালীত্বের সকলে বিলক্ষণ পরিচয় পাইত। অনেক ইয়ার জুটিল, এক্ষণ একটি ক্ষুদ্র ফুলবাবু হইয়া উপস্থিত। আমার নিকটে তিনি মনোগত মিষ্ট কথা শুনিতে পাইতেন না, সাতেও হাঁ, পাঁচেও হাঁ দিতাম না, এজন্য আমা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে থাকিতেন, সকল কথা আর আমায় বলিতেন না—লুকচুরি খেলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার অপর মন্ত্রী জুটিয়াছে, একটি লম্বাকৃতি সুন্দর যুবাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছেন—সম্ভোগপ্রিয়তা বশতঃ বাটী যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, বিবাহের দিনস্থির হইতেছে শুনিতেছেন: ইতিমধ্যে একটি সুন্দর বিপদ ঘটাইলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে নগরের ময়দানে বায়ুসেবনে বাহির হইয়া কোন কাপ্তেন সাহেবের কুমারী কন্যা সন্দর্শনে তাহার মন বিচলিত হইয়াছে, আমাকে ইঙ্গিতে কহিতেছেন, "দেখ মেম বিবাহ করা ভাল নয়?" মনে মনে করিলাম, গজাননের পিণ্ডির উত্তম উদ্যোগ হইতেছে। আমি কহিলাম,—"করিবে ত ভাল, কর্তাকে পত্র লিখি"। আমাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, কহিলেন, "বড় হইলে এক তোড়া টাকা দিবেন"—তাহার পর দিন আবার সেই সময়ে সেই কুমারী দর্শনাশয়ে সেই ময়দানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দেখিবামাত্র আইয়া সাহেবের হস্তে একটি মোহর ও আর একটি স্বর্ণমুদ্রা কাপ্তেন কুমারীর হস্তে সম্প্রদান করিলেন—কিঞ্চিৎকাল মধ্যে এই কথাটি কাপ্তেন সাহেবের কর্ণগোচর হইলে একটি পুষ্ট যষ্টিহস্তে তিনি নীলমণির সন্ধানে বাহির হইয়াছেন—ভাগ্যক্রমে নীলু সত্বর ময়দান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কালা বালক "নিগর-বয়" গোরা-কন্যা হরণ করিতে শুনিলে যেরূপ ক্রোধোদয় হইতে পারে, তাহা কাপ্তেন সাহেবের হৃদয়ে উদিত হইয়াছে: তিনি দ্বারে দ্বারে এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সাহেব মহলে হুলস্থূল বাগ্‌বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কেহ উকিলের কাছে কেহ ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেবের নিকট দৌড়িয়াছেন, কেহ নীলমণির ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিতেছেন।

পরোক্ষে এই কথা আমাদের কর্ণগোচর হইল—কারণ উকিল মহাশয় আমাদেরও পরমাত্মীয়। ভৈরব সর্দার রাত্রে রাত্রে চলিল, নীলমণির পীড়া হইয়াছে লিখিত হইল, দুই দিবস মধ্যে গজানন স্বয়ং আমাদের আবাসে উপস্থিত হইলেন। নিগূঢ় কথা শুনিয়া কহিয়া উঠিলেন, "কথাও ভারী, এই? আমার ছেলের কথা হইলেই হোঃ হোঃ শব্দ! ছেলেমানষী কেহ কখন করে না? বেশ ত ও সাহেবের সেই মাথায়;—রাঙ্গা ফুলওয়ালা পেরু-

গুলির জন্য মোহর দিয়েছে, তা কি মন্দ করেছে, আয়: মাগী টাকা নিয়ে উল্টে গায়—আমি চল্লাম ডাক্তার ইটাওয়াল সাহেবের কাছে।”

এদিকে নীলমণি নগরে থাকিলে বিদূষক লোকে অমূলক নিন্দাবাদ করিয়া তাহার কোন দিন কোন বিপদ ঘটাইতে পারে এই আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে শ্রীনগরে পাঠাইলেন—গজানন কহিলেন, “যতদূর বিদ্যা হইয়াছে, নীলমণিবাবু আপনার বিষয় বুঝিয়া চালাইতে পারিবেন তাহা হইলেই হইল; ঈশ্বরস্বেচ্ছায় উহার অভাব কি? বুদ্ধিও আছে, লেখাপড়ার বিষয়? কলেজ পর্যন্ত পড়িল, আমার আশার অতিরিক্ত হইয়াছে, জমিদারের কার্য্য কিছু শিখিলেই উহার অর্থ কে, আর উহার বিভব কে ভোগ করে?”

নীলমণি বাটী গমন করিলেন, গজানন তাহার মোকদ্দমা ও আশুতোষবাবুর আদেশানুসারে বাবু শিবসহায় সিংহের মোকদ্দমা তদ্বির করিবার জন্য নগরে আপাততঃ অবস্থিতি করিলেন, শুনা গেল আশুতোষবাবুর নিকট তিনি বিশেষ তিরস্কৃত হইয়াছেন। গজাননের কুচক্রেই যে সরল শিবসহায় সিংহ বিপদে পতিত, তিনি এতদিনে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়াছেন। শিবসহায়ের বিপদোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত গজাননের গৃহগমনও নিষেধ হইয়াছে, ডাক্তর ইটাওয়াল সাহেবের নিকটও আশুতোষবাবুর পত্র আসিয়াছে ও শিবসহায়ের পক্ষ সাক্ষ্যশ্রেণীতে পোস্টমাস্টার পূর্ণবাবুও নগরে আসিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা গজাননকে লইয়া কতক দিন বিলক্ষণ আমোদে দিনযাপন করিলাম। তিনি নিজেই কহিতেন যে, “আমি কারবারী লোক, দরবারী নহি” আমরাও জানিতাম, যে তিনি মফঃস্বলের বাগ, মনে মনে দোষী, হাকিমের সম্মুখে বা বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে সতত অনিচ্ছুক, এজন্য মধ্যে মধ্যে তাহার নামে সমন, ওয়ারেণ্ট আসিত—আমরাই লিখিতাম ও আমরাই বেগুণ কাটিয়া কালীতে ডুবাইয়া মোহর ছাপিয়া দিতাম; সমনে রূপস লিখিবার জন্য জন্ম-কৃপণ গজাননের মধ্যে মধ্যে অর্থ খসিত ও তাহার হাজিরই মকুফ হইল সংবাদ আসিলে মিষ্টান্নও আদায় করা যাইত।

আবার তাহার বিড়াল দেখিলে ভয় হইত, এজন্য নিদ্রাকালে মধ্যে মধ্যে গজাননের মশারীর নিকট মার্জার রাখিয়া আসা যাইত। একদিন “মেও” শব্দ শুনিবামাত্র চারিদিক আঁধার দেখিয়া—মশারি ছিঁড়িয়া কপাট খুলিয়া উঠানে পড়িয়া একটি পদ আহত করেন। তাহার বিপদে আমরা হাসিখুসি করি।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

গজানন মার্জার-ভীত

অতি প্রত্যূষে গজানন "কালী, তারা, মহাবিদ্যা" উচ্চারণ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। দ্বাদশবার "সুপ্রভাত" "সুপ্রভাত" ঘন ঘন উচ্চারণ করিলেন, "রঘুবীর" "রঘুবীর" শব্দে গৃহের চতুষ্কোণ ধ্বনিত হইল ও কহিলেন, "ওহে দাদা গঙ্গাধর! আজ একটি বড় কর্ম আছে, ইটুয়াল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবেক। সে সাহেব নয় ত একটি বাগ—"

আমি কহিলাম, "বাগ হয় ত আমি কি করিব?"

গজা। আমি ত সর্বদাই কহিয়া থাকি—আমি কারবারী—দরবারী নহি—তোমরা ইংরেজী জান, বলি ভাই তোমরা ইংরেজী জান—

আমি কহিলাম, "জানি ত কি করিব মহাশয়?"

গজা। সঙ্গে গেলে—বলি সঙ্গে থাকিলে তবু দুই একটি কথা—বলি দুই একটা কথা ইংরেজী করে বলিলে সাহেব ভাল বুঝবেন—

আমি কহিলাম, "আমার কি তদ্রূপ ক্ষমতা আছে?"

গজা। ভাই তুমি একটি গ্রামের অলঙ্কার, তুমি সঙ্গে চল, চল রে ভাই চল।

আমি মনে মনে ভাবিলাম, গজানন কোন কথা ভুলেও সত্য বলে না, মিথ্যা কথার অনুবাদ করিতে যাইব না, তাহার নিয়ত ফিকির জুকিরে আমি বিরক্ত হইতাম, তাহা তিনি জানিতেন—কহিলেন, "ভায়া আমি জানি, সব জানি, কিন্তু বড় হও, তুমিও জানিবে মিথ্যা ভিন্ন, ফিকির ভিন্ন সংসারের কার্যসাধন হবার নয় সুতরাং"—

আমি কহিলাম, "সুতরাং বলিয়াই যে স্তব্ধ হইলেন, মিথ্যা বলিতে হবে? সত্যের সদ্গতি নাই? যে মিথ্যা বলে তাকে ভালবাসি না, তাহার সাহায্য করি না।"

গজানন কহিলেন,—"জ্বালালে, আশুতোষ রায় ইংরেজী আনিয়া গ্রামে নালা কেটে জল ঢুকালে আর এক পুরুষেই সব বিষয়বুদ্ধি শেষ হবে, ইদানীন্তন বালকেরা একটা ফিকির জুকির শিখলে না, একটা কথা উল্টিয়ে বলিতে পারে না, এরা আবার বিষয়ী হবে—এদের কথাবার্তা শুনে আমি হতাশ হই, এদের না প্রাজ্ঞতা না মুন্সীগিরি হল, কেবল কতকগুল কেতাব পড়ে ভট্টাচার্য্য হলে বিষয়বুদ্ধি হয় না।"

আমি কহিলাম, "আপনার কি করিতে হইবেক? সঙ্গে যাওয়া আবশ্যক? ইটওয়াল সাহেব কি বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন না?"

গজা। তবু তোমরা ইংরেজীওয়ালা, ভায়া সঙ্গে থাকলে ভাল।

আমি অগত্যা স্বীকার পাইলাম, আবার মনে করিলাম, কতগুলি মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ হয় গুণিব।

অর্ধঘণ্টা মধ্যে গজানন প্রস্তুত। একটি পঞ্চগজ বস্ত্রের পায়জামা পরিলেন, চাপকানটিও তদুপযুক্ত ঘের, মলমলের থানের একটি দক্ষিণ পার্শ্ব হেলান বৃহৎ প্যাগড়ি বাঁধিলেন, বিনা মোজাতে পাদুকা পরিলেন—সকল বস্ত্র পরিধান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হল! আজ সাড়ে পাঁচ বৎসরের পর সেই অষ্টমের নিলামের দিন হইতে কাটা পোষাক পরিলাম।"

আমি কহিলাম, "আপনার গৌরবর্ণ দীর্ঘকায়ে উত্তম সাজিয়াছে; কিন্তু পায়জামা অত ঢিলে না হইলে ভাল হইত—ইটওয়াল সাহেবের একটি পারসী দেশের বৃহৎ বিড়াল আছে—ভদ্রলোক দেখা করিতে গেলে পদতলে আসিয়া বসে—ইজার খড়্ খড়্ করিলে বস্ত্রমধ্যে লম্ফ দিতে পারে।"

গজানন ঘর্মাসিক্ত হইলেন, কহিলেন, "কেদারায় পদ তুলিয়া বসিব।"

আমি কহিলাম, "তাই করা যাইবে, আর কুঠিতে যাইয়াই সাহেবের সর্দারকে উপদিষ্ট করিব যে, বিড়ালটি বাঁধিয়া রাখে, কিঞ্চিৎ বকসিসে আশ্বাস দিলেই হইবেক।"

গজা। "দুর্গা শ্রীহরি—রঘুবীর রঘুবীর"—উত্তম পরামর্শ ভাই, চল, দেখ দেখি—তাই বলিতেছিলে, "আমি সঙ্গে গমন করিলে কি হবে?" এসকল বুদ্ধি ফিকির বড় মানুষ হতে হয়।

"এই যে আপনি কহিতেছিলেন, আমি ফিকির জানি না?"

গজা। আমার শত অপরাধ। ভাই ইংরেজি পড়িলে বুদ্ধির এক তীক্ষ্ণতা হয় তা কি আমার জানতে বাকি আছে।

গজানন শিবিকাতে বসিলেন, একটি হুকা সঙ্গে লইয়া একটি ভৃত্য চলিল, আমি একটি ক্ষুদ্র ঘোড়ায় চড়িলাম, পুরাতন সেগুন বৃক্ষসজ্জিত রাঙ্গা সুরকিময় রাস্তা দিয়া সাহেবের কুঠিতে চলিলাম। কুঠিটি নদীতীরে এক প্রশস্ত ময়দানমধ্যে স্থিত শুনা যায়, এটি পূর্বে কোম্পানির রেশমের কুঠি ছিল, ইটওয়াল সাহেব স্বয়ং খরিদ করিয়া স্বেচ্ছামত সজ্জিত করিয়াছেন। গাড়িবারান্দায় পঁহুছিলাম সকল নিস্তব্ধ, পরিষ্কার; শব্দের মধ্যে কেবল ঝাওপত্রের স্বন্ স্বন্ শব্দ বা নিকটস্থ নদীর বক্ষে—নৌকা-শিরে বৃহৎ বৃহৎ পালে বা পটে বায়ুপ্রতিরোধধ্বনি ও পটদণ্ডে বা মাস্তুলে কট্ কট্ শব্দ শুনা যাইতেছে। এস্থান আলস্যপ্রিয় বা কর্মণ্য ব্যক্তি উভয়েরই সমান সুখদায়ক।

গজানন কহিলেন, "এখানে কি সুখে নিদ্রা হয়, মশার নাম প্রসঙ্গই নাই।"

পাল্কিবাহকগণ কহিতেছে, "এমন আশ্রয়ে পেলে দুপ্রহরের রাস্তা প্রহরে পার করা যাইতে পারে।"

আমরা অবতরণ করিবামাত্র দুইটি আরদলী আসিয়া উপস্থিত। দুইটি বৃহৎ মোড়া আসিল, সাহেবের নিকট আমাদের আগমনসংবাদ একজন আরদলী লইয়া গেল। গজানন কাণে কাণে কহিলেন, "বিড়ালটার কথা বলে দাও।" আমার বিস্মৃতকথা স্মরণে আসিল, দূরে লইয়া জমাদারকে কহিলাম, "আমাদের

বিদায় হইবার সময় দুটি বিড়াল সাহেবের কামরায় লইয়া যাইবে, দেওয়ানজী বড় ভালবাসেন, ক্রয় করিলে করিতে পারেন।”

পরক্ষণেই অনুমত্যানুসারে আমরা সাহেব বাহাদুরের কামরায় উপস্থিত। আমি সেলাম করিলাম, গজানন প্রায় ভূমিষ্ঠ হইয়া সেলাম করিতে গেলেন, পাগড়ির একটি কি দুইটি পাক খুলিয়া বিক্ষেপিত লাঙ্গলের মত ঝুলিল, ত্রস্ত গুটাইয়া রাখিলেন; কিন্তু আর সেরূপ পরিপাটী হইল না।

সাহেব একহস্তে সেলাম করিয়া কহিলেন “বস হুয়া, বৈঠ”—

গজানন করযোড়ে কহিলেন, “গোস্তাকি মাপ কিয়া যায়”—

সাহেব আবার কহিলেন, “হাঁ হাঁ বৈঠ!” গজানন বসিলেন, সেলাম করিলেন। আবার দাঁড়াইয়া সেলাম করিলেন; এবার বাবু আশুতোষ রায়ের সেলাম ও তবিয়তের সংবাদ পঁহুছাইলেন ও করযোড় হইয়া কহিলেন, “মেজাজ হুজুরালিকা?”

ই। আচ্ছা হ্যায়—হামারা তবিয়ত কভি খারাব হনে কো শুনা।

গজা। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ত নয়।

ই। এ দেখ, ও সেরেফ এই কুটিমে রহনেকো লিয়ে, এ ক্যাসা কুঠি?

গজা। ইন্দ্রালয় হ্যায় হুজুর।

ই। তোমরা শুনিয়াছ আমি এক মাস মধ্যে বিলাট যাইব আর এ ঘর বিক্রয় হইবেক?

গজা। সকল শুনিয়াছি। গজানন মিথ্যা বাক্য আরম্ভ করিলেন—সেই কথা শুনিয়া হুজুরের সাক্ষাতে আসিয়াছি—ঘর দ্রব্য সকলেরই ত বন্দোবস্ত করতে হবে, এখন আমাদের একটি প্রার্থনা আছে।

ই। কি?

গজা। “হুজুরালির সাক্ষাতে আমাদের গোপন কি; সব সঠিক করিয়াই বলিতেছি। একটি সামান্য মারপিটের মোকদ্দমায় একটি ভদ্রকন্যাকে ডেপুটী সাহেব তলব করেন, ত হুজুর সম্ভ্রমের ভয় সকলেই রাখে, হাজির করব কি না করব, এইরূপে সকলে সাত পাঁচ ভাবিতেছে, এমন সময় বিসূচীকার পীড়ায় গ্রাম হুলস্থূল, কন্যাটিও মরণাবস্থা। কেহ কেহ বলিল, মরেছে ত তাহার মৃত্যুসংবাদ সমনে লিখিয়া দেওয়া হয়, পরে আশ্চর্যের বিষয় ঈশ্বর-কৃপায় কন্যাটি আরোগ্যলাভ করে।

“সেই কথাটি শুনে হাকিম ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহপ্রবেশপূর্বক কন্যাটিকে ধৃত করিয়া আদালতে আনিতে হুকুম দেন, কিছুই তলিয়ে দেখিলেন না—কন্যাটি যে মরেই ছিল সেদিকে প্রণিধান না করে মনে করিলেন, হাজির করিতে পারিলেই ত তণ্ডক সূর্য্যালোকের ন্যায় দীপ্তিমান হবে। নাজির পাঠালেন, পরে স্বয়ং সরেজমিনে উপস্থিত হলেন। ত্বরাতে বুদ্ধিহারা হইয়া শিবসহায় সিংহ কন্যাটিকে হাজির করিতে অগত্যা বাধ্য হন, আমি নিকটে থাকিলেও বা একটা সৎপরামর্শ দিতাম—শিবসহায়ের উপকারার্থে অপর একটি নাজির

হাজির করিয়া দেয়। আদালতের আমলা হুজুর কি জানেন না—হয় ত লোভে পড়ে একজনকে হাজির করতে আর একজনকে করে দেয়। হাকিম মহাসন্তুষ্ট, শিবসহায় সিংহকে আনিলেন—তিনি সত্যবাদী, শপথ করিয়া কহিলেন, হাজিরা কন্যা তাহার কন্যা নহে—বিচারপতি সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না, মনে করিলেন, শিবসহায় হলফ করিয়া মিথ্যা কথা কহিয়াছে, এজন্য তাহাকে জজ সাহেবের নিকট বিচার জন্য অর্পণ করিয়াছেন। শিবসহায়-বাবু ত মিথ্যা বলেন নাই, আমিই বা কেন তার জন্যে মিথ্যা বলব, যে কন্যা আদালতে আসিয়াছিল সে ত প্রকৃতার্থে শিবসহায়ের কন্যা নহে, নাজির বাহাদুরি করিতে গেলেন, তাহার ফিকিরে একজন নির্দোষী ব্যক্তি ফাঁসি যায়। এখন হুজুর উদ্ধারের কর্তা। আশুতোষবাবু আপনার শরণাগত হইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন।"

ডাক্তার সাহেব নিস্তব্ধে বাক্যগুলি শুনিলেন। সত্যবাদী সরল লোক সকলকেই সমসরল জ্ঞান করেন, বিচারালয়ের ক্ষুদ্র কর্মচারীগণ লোভী তাহা তাঁহার ধারণা ছিল—গজানন ভদ্র, এজন্য সত্যবাদী; নাজিরের দুর্বুদ্ধিতেই শিবসহায় বিপদে পতিত, ইহা বৃদ্ধ ডাক্তার সাহেবের বিলক্ষণ বিশ্বাস হইল। কিসে সত্য প্রকাশ পায়, শিবসহায় মিথ্যা চক্র হইতে উদ্ধার হয়। নিজ সম্ভ্রমের ভয় ভিন্ন আর তাহার কি অপরাধ? কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "বিচার জজ সাহেব করিবেন? আমার মনে হইতেছে এইরূপ এক ঘটনার বিষয় শান্তিপুর সড়কের পোস্টমাস্টার আমায় কহিয়াছিল, তুমি তাহার পরামর্শে লিপ্ত ছিলে না?"

"রাম কহ—গঙ্গা দোহায়—ভগবান উপরে—হুজুর নীচে—একথা আপনি মনে করেন,—তা হলে আবার শিবসহায়ের উদ্ধারের জন্য আমি এতদূর পর্যন্ত আসি? ইহার মধ্যে আবার আর একটি গোলযোগ হইয়া গিয়াছে, শিবসহায় এদিকে কারাবাসী বলিলেও হয়, ওদিকে তাহার সর্বস্ব ডাকাইতে লুঠ করিয়াছে। যে ডাকাইত ধরিতে আসিল, যে জখম হল আবার দায়রা সুপর্দ হল, হুজুর দেশ ডুবল, দারোগার কথা কি বলব, বলিলে সরকারী কর্মচারীর সেকাইত করা হয়। এখন ধর্মাবতার হুজুর সকলের আশ্রয়। আমরা আর কাহাকে চিনি, জানি হুজুরই দেশের কর্তা, রাখতে হয় চরণে রাখুন, না হয় হুকুম দেন সকলে ঘরদ্বার ত্যাগ করে দেশান্তরে যাই, কাশীবাস করি!"

কথা কহিতে কহিতে গজাননের চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল ভগবান ইহারঁ চক্ষে জল এরূপ সস্তা কেন করিয়াছেন তিনিই বুঝেন, দয়ার্দ্র ডাক্তার সাহেব তাহাতেই গলিয়া গিয়াছেন।

ই। স্থির হও বুড্ডা, রোয় মৎ—ইস্‌কা খবর পিছে জানগে, আজ জজ সাহেবকো খানা আমরা কুঠিমে হ্যায়, হাম্ কৈ বাতকা সুপারিস করণেওয়ালা

নাহি, লেকেন আসল বাত সাহেবকো কহনা চাহিয়ে, তোম্ জানতা হ্যায় হাম বিলাইত যানেওয়ালা হ্যায়।

গজা। কুচ রূপিয়াকা দরকার হোগা—

ই। কুচ নাহি—সেরেফ হামারা কুঠি আওর আসবাব আশুতোষবাবুকো লেনা চাহিয়ে।

গজা। বাবু মহাশয়ই ত ও কথা আমাকে কহিয়া দিয়াছেন, হুজুরে এত্তেলা দিতে কহিয়াছেন, যেন তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও এ কুঠি না দেন। মূল্য কহিলেই পাঠাইয়া দিই, আর নীলের কারবারের দরুন যে হাজার দশ টাকা প্রাপ্য আছে তার হিসাব এখন হবে?

ই। তাহাও আমি দিয়া যাইব, এই কুটি আর দ্রব্যাদির বিংশতি সহস্র মুদ্রামাত্র মূল্য ধার্য্য হইয়া আমার দেনা দশ হাজার বাদ আর দশ হাজার পাঠাইলেই লিখাপড়া করিয়া যাত্রা হইবে—

গজানন দশ হাজার টাকার কথা শুনিয়া নিস্তব্ধ, আবার ভাবিতেছেন, এত টাকার সম্মতি দেওয়া কি ভাল, তর্ক করিবেন, কিছু কম করাইবার চেষ্টা করা উচিত—কি বলিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় কামরার দুই দ্বার হইতে দুইটি পারস্যদেশীয়, পীতল প্রস্তরখচিত অক্ষধারী শুভ্র বিড়ালদ্বয় মেও মেও করিতে করিতে কামরায় আগত। গজানন ঘর্মাসিক্ত, আসন হইতে লম্ফত্যাগ করিযা সেলাম বাজাইয়া "শীঘ্র দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিতেছি" কহিয়া সেলাম বাজাইলেন ও এক পলের মধ্যেই ত্বরিত কামরা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন—

আমি গজাননের ভীরুতার কথা সাহেবের কর্ণগোচর করিলাম ও আমার পরামর্শেই সাহেবের কুঠির মূল্য এত শীঘ্র নিষ্পত্তি হইল শুনিয়া সাহেব নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন—হাসিতে লাগিলেন ও কহিলেন, "ইয়ং গঙ্গাধর আমি নিটান্ত খুসি হইলাম।"

ষট্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

ব্যূহভেদ

পরীক্ষার দিন আগত। আমরা পাঠে ব্যস্ত; দিবসে পাঠ, রাত্রে চিন্তা করিতে করিতে সময় গত। তনু ক্ষীণ, সুখের বিষয় এই যে, পরীক্ষা হইলেই বিদ্যালয়সমূহে পাঠ বন্ধ হইবে, ছয় সপ্তাহের জন্য বিদায় পাওয়া যাইবে। প্রবাসী বালকগণ গৃহযাত্রা করিবেন, কারণ এত দিনের পর কর্তৃপক্ষ সরকার বাহাদুর বুঝিয়াছেন, যে গ্রীষ্মের সময় পাঠ বন্ধ ও আরাম করা উপকার-জনক; আরও জানিয়াছেন, যে গ্রীষ্মের অবস্থিতি এদেশে ছয় সপ্তাহ মাত্র অধিক নহে। আবার শুনিতে পাইতেছি, যে আগামী বৎসর হইতে শীত-

কালেও কলেজ বন্ধ হইবে, তাহা হইলেই শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ঋতুত্রয়ে আরাম মিলিবে; কেবল বর্ষাকালে বন্ধ হইবে না, কারণ বর্ষাগমে ছাত্রদের স্বাস্থ্য উত্তম থাকে, বিদ্যালয় গমনের পথঘাটের সুবিধা সংবর্ধন হয়। অতএব বিদায়ের প্রথা কর্তৃপক্ষদের বিচক্ষণতারই পরিচয়স্থান। একজন বালক আমায় জিজ্ঞাসিল, "বর্ষাকালে বন্ধ হইলে ভাল হয় না?" নিকটস্থ ঘরে কাছারি যাইবার সজ্জা করিতেছিলেন, গজানন কহিয়া উঠিলেন, "ইংরেজি পোড়রা যে জ্বালান জ্বালাইতে আরম্ভ করিয়াছে, বর্ষা কেন, চিরকালের জন্য তোমাদের বিদ্যালয় বন্ধ হইলেই ভাল হয়। তোমাদের দৌরাত্ম্যে দেশ সমাজ উচ্ছন্ন হইবে, জাতীয় গৌরব নষ্ট হইবে, তোমরা সাহেবদের গোয়েন্দা, সাহেব তোমাদের আচ্ছা তৈয়ার করিয়াছে, খুব নাচাইয়াছে, তোমাদের কথায় সকল বুদ্ধি পণ্ড, ঐ পূর্ণ গাঙ্গুলীকে দেখ, কটমট, ইংরেজী শিখিয়াই সব উচ্ছন্ন দিয়াছে, দেশে গ্রামে যে কথাটির সম্পর্ক নাই, আগেই সাহেবদের কর্ণগোচর হয়।"

কথাশেষান্তে আমি তাহার গৃহের দ্বারটি হটাৎ খুলিয়া দিলাম। এই দ্বারটি দিবারাত্র বন্ধই থাকিত, অথচ গৃহ কখনই জনশূন্য দেখা যাইত না। কখন উকীল, কখন মোক্তার, মন্ত্রী, পরামর্শক, গোয়েন্দা, সাক্ষী সূক্ষ্মস্বরে সতত বাক্যস্ফুট করিতেন, ঘন ঘন কলিকাপূর্ণ তামাকাগ্নি গৃহে যাইত ও ক্ষারসার হইয়া প্রত্যানীত হইত। আমি দ্বারটি খুলিবামাত্র অভ্যন্তরস্থিত সকলে চমকিত, গৃহটি ধূমপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া ধূমচক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহিরে বাতাসে মিশিতেছে, অভ্যন্তর যেন কুজ্ঝটিকাবৃত, গৃহাকাশ যেন বাস্পময়, তদন্তরস্থ লোকেদের হৃদয়াকাশও সেইরূপ মিথ্যাময় কুচক্র-ধূমে আবৃত। পাঁচ সাতটি সাক্ষী গজাননের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাদের হস্তে এক একখানি কাগজ। সাক্ষ্যতা দিবার সময় যাহাকে যে কথা কহিতে হইবেক, সকলই ঐ কাগজে লিখিত হইয়াছে, সকলে তাহাই জপমালা করিয়াছে, যে ব্যক্তি পড়িতে না জানে সে অপরের কাছে শুনিয়া মুখস্থ করিতেছে। ঐ গৃহদ্বার প্রায় সর্বক্ষণ বন্ধ থাকিত, নিম্নস্বরে কথা হইত. আমি কখন কখন মনে করিতাম, গজানন অবসরমতে মহাভারত পাঠ করেন এখন বুঝিলাম. তাহার নিজরচিত ব্যূহভেদের মন্ত্রমাত্র উচ্চারিত হয়। যে কথা কহিলে শিবসহায় নিষ্কৃতি পান তাহাই কণ্ঠস্থ করাইয়া থাকেন। তাহার গৃহের দ্বারটি মুক্ত করিবারমাত্র সকলে কাগজগুলি লুক্কায়িত করিলেন, এখন কাছারি যাইবার সময় উপস্থিত, প্রস্তুত হইয়া দলেবলে যাত্রা করিলেন, যাত্রাকালীন গজানন এইমাত্র কহিলেন, "আজ পঞ্চ দিবস জজ সাহেব মোকদ্দমা শুনিতেছেন, একা পূর্ণ গাঙ্গুলির সাক্ষ্য লিখিতে এক দিন সমস্ত যাপিত হইয়াছে। শীতুক্ষেপাও আসিয়াছে। এখন বিলক্ষণ শান্ত হইয়াছে, মনের মত কথা বলিলে তাহার জায়গির ফিরিয়া পাইবে ও সুন্দরীর সহিত বিবাহের প্রলোভন দেখান হইয়াছে। সুন্দরী গোপিনীর উপরেও গজাননের বিলক্ষণ বিশ্বাস—

তাহার কথাতেই মোকদ্দমা ফাঁক হইবে, কারণ নিম্ন আদালত তাহার বিষয়ে একটি গুরুতর ভুল করিয়াছেন, তাহার জবানবন্দি আদৌ কলমবন্দি হয় নাই। সুন্দরীর বাক্যে সরল ভাবভঙ্গি, সরল বাক্যে জজ সাহেবের অবশ্যই প্রতীতি হইবেক।”—সাক্ষিদলের মধ্যে কহিলেন, “আমাদের বাক্যে সেইরূপ হইলে নিষ্কৃতি।”

গজানন কহিলেন, “রঘুবীর তাহাই করিবেন, বুড় শিবসহায়কে সঙ্গে লইয়া আবাসে প্রত্যাগমন করিব।” আমাদিগকে কহিলেন, “তোমরা কেহ বিচার দেখিতে যাইবে না?”

আমরা কহিলাম, “আমরা যে বিচারে পড়িয়াছি তাহাতেই উদ্ধার হই। আমাদেরও পরীক্ষা অদ্য শেষ হইলে অপর চিন্তা।”

কলেজের ছাত্রগণ কলেজ-মন্দিরে চলিল। গজানন নিজ শিষ্য সাক্ষীগণ সহিত বিচারালয়মুখে চলিলেন, ও প্রথমতঃ পীরসাহেবকে সেলাম করিয়া কাছারিতে প্রবেশ করিবার জন্য সাক্ষিগণকে শিখাইয়া দিলেন।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ
বিচার

জজ সাহেবের কাছারি আজ লোকাকুলিত। বিস্তার কক্ষে স্থানাভাব, দুপাশে বারাণ্ডাদ্বয়ে স্থানাভাব—বৃহৎ সোপানশ্রেণীতে স্থানাভাব, সকল স্থানে লোক কিলকিল করিতেছে, তিল ধারণের স্থান নাই—বাহিরে, বৃক্ষতলে সকল উপবেশনের আসনই খালি পড়িয়া রহিয়াছে—বিচারাসনের নিকটবর্তী স্থানই লোক পরিপূর্ণ—পদাতিক ক্রমাগত চুপ চুপ করিতেছে, পাগড়িতে ঠেকাঠেকি হইয়া ভূতলে পড়িতেছে, বিলাতি চর্মনির্মিত বুটতলে চাষী লোকের পদাঙ্গুলি মর্দিত হইতেছে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুচিকণ মস্তক কখন কখন গৃহপ্রাচীরে আবেগে ঠক্‌ করিয়া আঘাতিত হইতেছে, কাহারও কান্দিবার হুকুম নাই—হাসি আরো নিষিদ্ধ—চারিদিকে আরদালি ফিরিতেছে বা নিষিদ্ধাচার বেয়াদপি দেখিলে অংস মর্দন করিয়া গৃহের শত পদের বাহিরে রাখিয়া যাইতেছে; এই গোলযোগের মধ্যেও ব্যতিব্যস্ততার অন্তরেও নিদ্রা-দেবী সুরাজ্য বিস্তৃত করিয়াছেন, জজ সাহেবের পশ্চাদ্ভাগে পাখাওয়ালার অংস বক্র হইয়া পড়িয়াছে সুপক্ব-শ্মশ্রু জমাদার সাহেব ঢুলিয়া বিম্বোষ্ঠ উল্টাইয়া দিয়াছেন, লছমন চাপরাসীর পাগড়ি পতিতপ্রায়। জুরিগণের অধ্যক্ষ স্বপ্ন দেখিতেছেন, আমরা দুই চারিটি সঙ্গী সঙ্গে উপস্থিত। সোজা পথে পাড়ি জমিবার নহে—কোন দিকে গমন করিলে বিচারস্থান অবাধে দেখিতে পাইব? চারিজন চারিদিক পর্য্যবেক্ষণে চলিলাম। একটি জানালার উপর উঠিয়া দেখিলাম, গবাক্ষের কিয়দংশ রাঙ্গা পরদাতে আবৃত, পরদার কোণ

উত্তোলন করিয়া দেখিলাম কামরা মধ্যে কেহই নাই; অথচ সুসজ্জিত। সঙ্গিত্রয়কে আহ্বান করিলাম, সুলম্ফে জানালা হইয়া কামরায় প্রবেশ করিলাম, এটি বিচারকের খাশ-কামরা; কিন্তু প্রবেশমাত্র আমাদের কারাকামরা বোধ হইল। এটি পরগৃহ, এই সাহেব আসিল, এই পিয়াদা আসিয়া ধরিল—এই আশঙ্কা সম্পর্কে আমাদের মনই ভগবান হইলেন, ভাবনা উদয় না হইতেই বসন্ত চিহ্নাঙ্কিতমুখ অল্পবয়স্ক মহাদেব চাপরাসী সম্মুখের দ্বারের সুরঞ্জিত পরদা উত্তোলন করিয়া যেমন কামরায় প্রবেশ করিল ওমনি আমার দুইটি সঙ্গী চকিৎ লম্ফে জানালার পথে বহির্গত—আমি কহিলাম, "মহাদেব তোমাকেই আমি অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এখানে কেহ নাই কথাটি তবে বলে ফেলি?"

মহাদেব ব্যগ্রচিত্তে কহিলেন, "তুমি কে বাবু?"

আমি কহিলাম, "যে হই—শ্রীনগরের দেওয়ানজী গজানন চৌধুরী তোমাদের জন্য রাঙ্গা বনাত কিনিয়া রাখিয়াছেন, যদি এই মোকদ্দমা জিত হয় তোমরা পাইবে"—এমন সময় বিচারাসন হইতে "মহাদেব" "মহাদেব" শব্দ হইল, মহাদেব অন্যমনস্ক, পরদা উঠাইয়া বাহির হইল, আমি তাহার সহিত এজলাসকক্ষে উচ্চ স্থানে উপনীত হইলাম। এই বিস্তার কক্ষে আজ পরম শোভা উদয় হইয়াছে—যৌবনপ্রভা, সৌন্দর্য্যের শোভা, পোশাকের পারিপাট্য, তর্কজ্ঞানপরিপূর্ণ আইনজ্ঞ সুজনশ্রেণী, সভ্যতার সমস্ত সুলক্ষণই এই কক্ষে লক্ষিত হইতেছে—কিন্তু উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা দুইটি বলবৎ—সদ্বিচার ও স্বার্থলাভ। এই শোভা একটি সাক্ষিতেই আজ আলো করিয়াছে। সাক্ষির আসনের চতুস্পার্শ্বে হরিত রঙ্গরঞ্জিত কাষ্ঠবিনির্মিত এক একটি রেল প্রায় হস্তত্রয় উচ্চ; এই রেলের মধ্যে বিশেষ লাবণ্যময়ী যুবতী সুরূপা সুন্দরী গোপিনী বিদ্যমানা। তাহার শরীরের নিম্নভাগ রেলবেষ্টিত, উরসাংশ পর্যন্ত সকলে দেখিতে পাইতেছে। অলঙ্কারবাহিনী শুভ্র বস্ত্রমাত্রপরিধায়িনী যেন একটি প্রস্তর প্রতিমাস্বরূপ দণ্ডায়মানা। হাত দুইখানি যোড় করিয়া সম্মুখে রেলের উপর রাখিয়াছে, দুইটি বহুমূল্যের রত্নখচিত স্বর্ণবালা যারপর নাই শোভা বিস্তার করিয়াছে। যাহারা তাহাকে চিনিত, ভাবিতেছে এ বালা এ কোথায় পাইল—অপর সকলেই মনে করিতেছে—কি আক্ষেপ! এ সুকুমারীর কেন এত লাঞ্ছনা, এ প্রকাশ্য স্থানে কেন আনীত হইয়াছে? আবার দেখিলাম, যে নিরাশের প্রতিরূপস্বরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বৃদ্ধ শিবসহায় সিংহ বিদ্যমান, নিরাশ ও লজ্জায় তাহার মুখশ্রীকে ভাগাভাগি করিয়া কলঙ্কিত করিয়াছে—রঙ্গ মলিন হইয়াছে, বৃহৎ আঁখি নয়নগহ্বরে বসিয়া গিয়াছে, শিরোদেশের মধ্যভাগ কেশশূন্য হইয়াছে, গোঁফরেখা বিলোপিত, অঙ্গ সমুদয়ই লাবণ্যবিরহিত তথাপি মুখায়তন দৃষ্টে পূর্বভাব অবলোকন করিলে করা যায়; শীর্ণ বৃদ্ধ ব্যঘ্র তীক্ষ্ন শরাঘাতে লালায়িত হইয়াছে—বাহ্যিক আঘাতে যত না ব্যথিত, কলঙ্ক-আশঙ্কায় আরো গুরুতর কাতর হইয়াছেন।

প্রকৃতার্থে এই কুলকামিনী কাদম্বিনী নহেন—সেই ভ্রম ক্রমে দূরীকৃত হইল। জজ সাহেব বাহাদুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম ?"

কামিনী উত্তর দিল, "সুন্দরী গোপিনী"—

জজ। তোমার পিতা ?

সুন্দ। আপনিই আমার মা-বাপ।

জজ। তোমার নাম কাদম্বিনী ?

সুন্দ। কাদম্বিনীর চরণের দাসী হইবার যোগ্য নহি।

জজ। নিম্ন-আদালতে কাদম্বিনী সাজিয়া উপস্থিত হইয়াছিলে ?

সুন্দ। কখনই না—কেবল নাজির সাহেব আসিয়া কহিলেন হাকিমের তলব—আমি তজ্জন্যই সাহেবের সামনে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

জজ। উপস্থিত হইয়া কি বলিয়াছিলে ?

সুন্দ। কোন কথাই বলি নাই—কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসাও হয় না।

জজ। কোন কথা—লিখা হয় নাই ?

সুন্দ। মনে নাই।

বিচারক বাহাদুর নথী হইতে কাদম্বিনীর জবানবন্দি বাহির করিতে আদেশ করিলেন। তাহা ফিরিস্তি মধ্যে উল্লেখ নাই, নথী মধ্যে গাঁথা নাই। গজাননের কলে নথী হইতে উড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ডাক-মুন্সি মহাশয়কে এমন সময় তলব হইল। তিনি শপথ করিয়া কহিলেন, "উপস্থিতা কামিনীকে তিনি আজন্ম চিনেন, শৈশবকালে বিবস্ত্রা বাল্যখেলা খেলিতে দেখিয়াছেন, কিশোর বয়সে দেখিয়াছেন আবার এখন পূর্ণ যৌবনে উপনীতা দেখিতেছেন—কামিনী 'শকুনের মেয়ে' বলিয়া খ্যাতা, সাহেবানী গোপিনীর গর্ব্ভজাত কন্যা—কুলবালা কাদম্বিনী নহেন—এ কন্যা যে কেহ কাদম্বিনী কহে সে মিথ্যা বলে —মিথ্যা সাজায়। তিনি আরো কহিলেন, যে আজ দেওয়ান গজানন চৌধুরীও আদালতে উপস্থিত আছেন, তাহাকেই বা জিজ্ঞাসা কেন না হয় ?"

শেষ কথা বিচারক মহোদয়ের কর্ণগোচর হইতে না হইতে দর্শকদল মধ্যে একটি লম্বাকৃতি স্থূলকলেবর গৌরাঙ্গ পুরুষকে বিচারাসনের প্রতি পশ্চাদ্ভাগ ফিরাইতে দেখিলাম, এক পল সময়ে তাহার শিরোভূষণের শেষভাগ লোক-দলের মধ্যে অন্তর্ধান হইল। কোন্ গজানন ও তাহার সাক্ষ্যতা সম্বন্ধে অভিযুক্ত জনের কোন আপত্তি আছে কি না, এই বিষয় তদন্ত হইল ও গজাননকে উপস্থিত করিতে আদেশ হইল। গজাননের নাম ধরিয়া ডাক হইল, তাহার নির্দিষ্ট আসনে, দর্শক জন মধ্যে, বারান্দায় বারান্দায় কক্ষে কক্ষে তাহার পাল্কি মধ্যে অনুসন্ধান হইল, গজানন কোথাও নাই। অবশেষে উভয় পক্ষের পরামর্শকগণ আবেদন করিলেন যে, গজাননের সাক্ষ্যতা বিশেষ আবশ্যক নাই, উপস্থিত প্রমাণেই মোকদ্দমার সুবিচার হইতে পারে; প্রার্থনা গ্রাহ্য

হইল। বিচারক বাহাদুর উকিলগণকে আপন আপন পক্ষসমর্থন করিতে আদেশ প্রচার করিলেন।

আদেশ হইবামাত্র কয়েকটি সুসজ্জিত সুজন পরস্পর মুখের প্রতি দেখা-দেখি করিতে লাগিলেন, নিম্নস্বরে কথা কহিলেন ও কণ্ঠ হইতে শ্লেষ্মা উদ্গার করিয়া সুকণ্ঠ হইলেন। ইহাদের মুখপাতস্বরূপ ইংরাজীভাষাবিৎ একটি উকিলবাবু দণ্ডায়মান হইলেন, তাহার পশ্চাতে আর একজন সহকারী নোটবুক হস্তে, তাহার পশ্চাতে কেরামত আলি মোক্তার ও তাহার পাশে তাহার মহরর চোঁথা জবানবন্দির নকল হস্তে দণ্ডায়মান। প্রধান উকিল মহাশয় যেমন একটি ইংরাজীবাক্য আদালতের প্রতি চাহিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, অমনি বিপরীত পক্ষ হইতে পঞ্চস্বর একত্রীভূত হইয়া পঞ্চস্বরে কহিয়া উঠিল, "হুজুরালি, এ বড় বেজায়—আমরা ইংরেজী বুঝি নাই—হিন্দিতে বা বাঙ্গালাতে বক্তৃতা হওয়া উচিত।" বিচারক মনে মনে জানিতেছেন, কতকগুলি আরব্য, পারস্য বাক্যসম্বলিত হিন্দিভাষাতে বক্তৃতা করিলে কিছু মোকদ্দমার তাৎপর্য্য গ্রহণে সুবিধা হয় এমত নহে। তর্কের, ন্যায় দর্শনের, সুলভ হয় এমত নহে। কৃতবিদ্য উকিলবাবু দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতেছেন, যে আমার বিদ্যা ইংরাজীভাষা শিক্ষাতেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে—বাঙ্গলাভাষা—অহোঃ মাতৃভাষাপ্রিয়তা!—তাদৃশ আলোচনা নাই—হিন্দি? যদি কৃতবিদ্য জনের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য নিতান্তই আবশ্যক তথাপি সে শিক্ষা আমার ভাগ্যে আলব্ধ নহে, হিন্দি ত বাঘ। জজ সাহেবের মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া নূতন উকিল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন। তখন বস্তাপুরাণ ক্রিমখোরদ সেকেলে লাট্টুদার শিরোভূষণ ও বৃহৎ ঘের জামাসজ্জিত রাধাকিশোর মল্লিক উকিল সরকার মহাশয় দাঁড়াইলেন, ও কহিলেন,—"হুজুরালি গৌর কিয়া যায়—প্রথম অভিযোগ মারপিট, বাদী রঘুবীর যে একান্ত আহত হয় তাহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণ হইয়াছে—প্রতিবাদীর পক্ষে বলা হইতে পারে বাদী অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল।" বলিয়াই স্বর উচ্চতর করিলেন। "মগর কোন্ আইনের কোন্ ধারার কোন্ প্রকরণে লিখিয়াছে—তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি জলপান করিবে না? বাদির অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না, কেবল জলপান করিতে গিয়াছিল, সে পিপাসা কি কেহ নিবারণ করিতে পারে? বলে হুজুর! 'তৃষ্ণাতুরানাং নচ ভূমিশয্যা' জমী বিছানা পর্য্যন্ত খনন করিয়া জল প্রাপ্ত হইলে পান করিবে, এ ত পুষ্করিণীতে গিয়াছিল, তাহাতে অপরাধ হইতেই পারে না।

"দ্বিতীয়তঃ," পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "দ্বিতীয় অভিযোগটা কি?" মোক্তার নিম্নস্বরে কহিয়া দিল, 'দাঙ্গা', অমনি উকিল মহাশয় কহিলেন, "দাঙ্গার অভিযোগ সম্পর্কে অধিক বলা বাহুল্য, হুজুর নিজেই সব বুঝিতেছেন—আসামীর কন্যাকে ধৃত করিতে দারোগার লোক যায়, তাহাতে ত প্রতিরোধ হওয়াই সম্ভব। আবার তাহাতে ইনি সেই শিবসহায়

সিংহ—যিনি নীলকর ফারগসন সাহেবকে মারেন, ইহার এমন গোস্তাকি, যে সাহেবকে মারিয়াছিলেন—ত থানার চাপরাসি কে কোন্ তুচ্ছানুতুচ্ছ—বিপক্ষে এখন তর্ক হইতে পারে যে. বাবু শিবসহায়ের কন্যা থানায় হাজির হইলে বিশেষ অপমানিত হইত—সে অপমানে দেখুন হুজুরালি বাকি কি রহিল—ডিপুটি সাহেবের, যবন সাক্ষাতে, আজ আবার কেবল আলিসান হুজুরালির সম্মুখে না হইয়া এই প্রকাশ্য আদালতে হাজির করিতে হইয়াছে—একি যথার্থই গোপিনী বালিকা?"

জজ সাহেবের আবার সংস্কৃত মনে পড়িল ও কহিলেন, "জয়দেব হাম ভি পড়া থা 'গোপিনী?' 'গোপি পীন পয়োধর' বাদ ওস্‌কে ক্যা হ্যায়?"

উকিল মহাশয় কহিলেন, "মর্দ্দয়েৎ নচ ভক্ষয়েৎ।"

সাহেব বাহাদুর কহিলেন, "ঠিক ঠিক মরডয়েট নট ভক্ষএট"।

জজ সাহেব কহিলেন, "ও ক্যা সংস্কৃত বচন হ্যায়, বহুত আচ্ছা হ্যায়! হামভি পড়াথা আর হালিভরি কলেজমে হাজারো রুপেয়া টুম লোক্‌কা খাজানাসে বকসিস্ মিলাথা।" ধন্য ছাত্র জজ! ধন্য শিক্ষক বিদ্যাসাগর! স্বার্থ ভারতের ভাণ্ডার!

"তৃতীয়তঃ", বলিয়াই আবার উকিল মহাশয় পশ্চাদ্ভাগে চাহিলেন, একজন কহিল, 'হলফ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্যতার অভিযোগ'। অমনি উকিল মহাশয় কহিলেন, "হলফ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্যতার অভিযোগ সম্পর্কে বন্দা এইমাত্র বলিতে চায়"—আবার উকিল মহাশয় নিস্তব্ধ হইলেন—দীর্ঘ বক্তৃতার পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিতে তালু শুষ্ক হইয়াছে, এজন্য দুই এক টুকরা মিছরি গলদেশে প্রদান করিলেন এবং দন্তপাটি ঘন ঘন হেলাইলেন, আবার কহিলেন —"যদি হুজুরালির এই বিশ্বাস হয় যে, কামিনী অদা আদালতে নীতা হইয়াছিল সে মজকুরা প্রকৃতার্থে কাদম্বিনী না হয়, তথাপি শিবসহায়ের যে নিতান্ত কুমতলব ছিল, তাহা নিম্ন আদালতের রায়েই সূর্য্য-কিরণস্বরূপ দীপ্তিমান।"

জজ সাহেব কহিয়া উঠিলেন, " 'দীপ্তিমান যুগে যুগে যেন প্রভাকর' বিদ্যা-সাগর এভি পড়ায়া থা।"

প্রথম পক্ষের উকিল আসন গ্রহণ করিলেন। প্রতিবাদীর পক্ষে এক্ষণ বক্তৃতা আরম্ভ হইল। প্রতিবাদীর পক্ষেরও উকিল একজন প্রবীণ প্রাজ্ঞ সুজন বাবু মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী—ফারসি বাঙ্গালা ব্যতীত ইদানি ইংরাজী আইনও কিঞ্চিৎ পড়িয়াছেন—তিনি কহিলেন, "হুজুরআলি! যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় গুরুতর অখণ্ড তণ্ডক-ব্যূহ ভেদ হইয়া যায়, তাহার কাছে এ মোকদ্দমা অতি সামান্য তুচ্ছানুতুচ্ছ বোধ হইবেক। অনধিকার প্রবেশকারীকে সর্ব্বদাই তাড়িত করিবার সকলের ক্ষমতা আছে; বিশেষ হিন্দুদিগের খিড়কির পুষ্করিণী পবিত্র স্থান।"

জজ সাহেব কহিলেন, "ক্যা খিড়কি?"

উকিল সাহেব কহিলেন, "খিড়কিদ্বারের নিকট পুষ্করিণী।"

জজ। "খিড়কী" "পুষ্করিণী"? হাম লোককা নাহি হ্যায়?

বৃদ্ধ দেওয়ানজী কহিলেন, "হাম কভি নাহি দেখা, লেকেন্ হুজুর লোককা বড়া তালাব, লালদীঘি, হাম দেখা।"

জজ। "লালদিঘি?" ও কোম্পানিকা মাল হ্যায়; কৈ দাবি করে গা ত ওসি ওক্ত হাম্ ডিস্‌মিস্ করে গা—লিখও রায় "ডিস্‌মিস্"। আওর খিড়কি দ্বার? পহলা এতেলা দেতা ত খিড়কি দ্বারভিবি তলব হোতা।

দেও। ও তলব করনেকো নাহি—যো দরওজাসে জানানা লোক বাহির নিকালতা ওসিকো খিড়কি দ্বার কহতা হ্যায়—

জজ। আচ্ছা হাম সমজা—চল উকিল সাহেব।

উকি। খিড়কির দ্বার অতি পবিত্র স্থান; তন্নিকটস্থ ঘাটে গো-মনুষ্যের চলাচল রহিত, গৃহের গাভী হইলেও সে স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ।

জজ। ফের গাভী ক্যা?

দেও। গৌকা স্ত্রীলিংগ হ্যায়।

জজ। ও ফের ক্যা হ্যায়?

দেও। আপ্‌লোক্ "বুল" জিস্‌কো কহতা হ্যায়, গাভী উসিকা মেম-সাহেব হ্যায়।

জজ। ওঃ হাম খুব সমজা! আচ্ছা উকিল সাহেব চলও—

উকিল মহাশয় কহিলেন, "ঐ পবিত্র গোপনীয় স্থানে সকলকে যাইতে নিষেধ, ওখানে যাওয়া অনধিকার প্রবেশ, তথায় প্রবেশ করিয়া বহির্গত না হইলে অবশ্যই বাদীকে প্রতিবাদীর বহিষ্কৃত করিবার ক্ষমতা ছিল; সে ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য হইয়াছে কি না তাহাই অদ্য হুজুরের বিচার্য্য।

"দ্বিতীয়তঃ, কাদম্বিনী সম্ভ্রান্তশালিনী—অন্তঃপুরবাসিনী ভদ্রকন্যা, কোন আইনানুসারে তাহাকে থানায় হাজির করিবার দারোগা সাহেবের ক্ষমতা ছিল না—মফঃস্বলে যে শত সহস্র বার ক্রোধ-উত্তেজক অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার এই ঘটনাটিই বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল—হুজুরালি—পুলিস কর্মচারী বা ইহার পর শান্তিরক্ষক নিয়মপ্রবর্ধক না নিয়মবর্জিত শান্তিহন্তারক বলিয়া খ্যাত হইবেক? পুলিসের কর্মচারিগণ তাহার কন্যার সাক্ষ্যতা লইবার জন্য অনর্থক তাহাকে ধৃত করিতে যায় এতদ্রূপ অবস্থায় তাহারা যদি তাড়িত হইয়া থাকে, উচিত কর্মই হইয়াছে। তাহাকে দাঙ্গা বলে না—

"তৃতীয়তঃ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধ বাবু শিবসহায় সিংহের প্রতি কোন মতেই সপ্রমাণ নহে, তিনি একটি সম্ভ্রান্ত শান্ত ভদ্রলোক দেশসমাজের প্রিয় ও পূজ্য—মহত্ত্বে উচ্চতর শিখরোপরে সংস্থাপিত; অবশেষে অতি সরল নিরীহ ব্যক্তি তাহা তাহার শ্রী দেখিলেই হুজুরের তীক্ষ্ন কটাক্ষ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিবে—নিম্ন আদালতে তাহাকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা হয় যে, এই কামিনী তাহার কন্যা কি না—তিনি কহেন এই কামিনী তাহার কন্যা নহে—

যদি আদালতের এখনো বিশ্বাস হয় যে, সুন্দরী গোপিনী সুন্দরী গোপিনী নহে, তবে আমার মক্কেল শিবসহায় সিংহ অবশ্যই দণ্ডনীয়—যদি আদালতের বিশ্বাস হয় যে নিম্নস্থ বিচারালয়ের চঞ্চলবুদ্ধি ও আগ্রতাবশতঃ একটি প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, সেই আগ্রতা সন্তুষ্টি হেতু তাহার অধীনস্থ কর্মচারী, যে কোন ব্যক্তি হক, সুন্দরী গোপিনীকে—কাদম্বিনীর বিনিময়ে উপস্থিত করিয়া দেয়, যদি সেই উপস্থিতা কামিনীকে বাবু শিবসহায় সিংহ আপন কন্যা কহিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তিনি প্রকৃত ভদ্রের কাজ করিয়াছেন, সত্য কথাই কহিয়াছেন ও তজ্জন্য তাহার দণ্ড হওয়া দূরে থাকুক, হুজুরের সূক্ষ্ম সদ্বিচার জল-দুদ-প্রভেদকারী বিচারে ক্ষণকাল মধ্যেই নির্দোষী হইয়া শিবসহায় পরিত্রাণ পাইবেন, ভদ্রলোকের মানসম্ভ্রম রক্ষা পাইবে, বিচারালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হইবেক।"

বক্তৃতা শেষে চারিদিকে "বাহবা বাহবা" বোল উঠিল—অনেকে কহিল, মৃত্যুঞ্জয়বাবু যথার্থই মৃত্যুঞ্জয়-নাম লাভ করিবেন—শিবসহায়ের আঁখি হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল।

আসেসরগণের মত লইলেন—কিঞ্চিৎকাল সকলে নিস্তব্ধ, ঘণ্টার্দ্ধ মধ্যে জজ সাহেব কহিয়া উঠিলেন, "আসামী শিবসহায় সিংহ! আসেসরগণের বিচারে তুমি নির্দোষী, আমি সাধারণতঃ সেই বিচারে ঐক্য হইয়া তোমাকে খালাস দিবার আজ্ঞা প্রচার করিতেছি—তুমি এই দণ্ডেই মুক্তিলাভ করিলে।"

চারিদিকে "জয় জয়" শব্দ, শিবসহায় পুলিসের হাত হইতে নিষ্কৃতি, কিন্তু পীরের হাত হইতে নহেন, গাজিসাহেবের একজন ফকির তাহার হাত ধরিল—তিনি আবার ভয় পাইলেন, ক্ষণকাল পরে আবার বুঝিলেন—এ যমের নয় পীরের দূত!

এজলাস কক্ষের বাহিরে রামা খানসামা দরিদ্র জনমধ্যে পয়সা ছড়াইতে লাগিল—শীতু ক্ষেপা সুন্দরীর হাত ধরিয়া গান ধরিল—

গীত

ধন্য রসুল অবতার
তার বিচার ন'য়ত, ক্ষুরের ধার
সাহেব চৌকি বসে, ঘুমায় যদি
জোগে জাগে চলে যায়
জজ ঘুমায় ঘুমুক ধন্য দেওয়ান
বিচার তাঁর পঁহুছে পার॥
জজের বিচার ন'য়ত
দুদে জলে মিশিয়ে দিয়ে দেখ ভাই
ঐ দুদ এক দিকে, জল এক দিকে
দেখতে দেখতে ভেসে যায়
গুলিয়ে দিলে মিশে নাই॥

তার বিচার ন'য়ত স্বপ্ন যেন
ঘুমিয়ে নথি বুঝে যায়
কিবা ঘুমিয়ে জেগে সমান বিচার
নাক ডাকিলে হাহাকার!

জজ সাহেব শীতু ক্ষেপার গান শুনিয়া তলব করিলেন. তাহার সুন্দরীর প্রণয়ের ও ব্রহ্মত্বের পুরান দাবীর এক দরখাস্ত পড়িল, তাহার আবেদন শ্রীনগরে মীমাংসা জন্য পঞ্চের নিকট অর্পণ হইল।

কাছারির বহির্দ্দেশে আবার দেখিলাম, একটি সুসজ্জিত শিবিকাতে সুন্দরী গোপিনী উন্বিতা হইল, সঙ্গে পুটে বাগদী দ্বারবান লাল পাগড়ি বান্ধিয়াছে, ক্ষুদ্র ঢাল পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে. রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিয়াছে. তরয়াল ঝুলাইয়াছে, একটি ক্ষুদ্র পালওয়ান ও পদাতিকের বেশ; উভয় হস্তে মোটা মোটা সোণার বালা: আমাকে দেখিবামাত্র লুকাইল পরে পাল্কির সঙ্গে দৌড়িল, আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, মনে ভাবিতে লাগিলাম এ সব সজ্জা কার?

অষ্টত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সম্বন্ধ

ডাক্তার ইটওয়াল সাহেব গত মেল-জাহাজে গৃহে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অট্টালিকা সসাজ আশুতোষ রায় মহাশয়কেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সেই কুঠি আজ দখল হইল, বাবু শিবসহায় সিংহ, গজানন ও শ্রীনগরের সমস্ত লোক আজ আনন্দে সেই গৃহে মিলিত, সেই গৃহে একটি হোম হইল, বন্ধু-বান্ধব, কাঙ্গাল, দরিদ্র, আদালতের আরদালি প্রভৃতিকে মিষ্টান্ন বিতরণ হইল, শিবসহায়ের নিষ্কৃতিতে অনেকেই আনন্দিত, কিন্তু তাঁহার নিজমুখে এখনও লজ্জাকলঙ্ক প্রলেপিত, দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, নির্দোষী বলিয়া সকলের হৃদয়ংগম হইয়াছে, তাঁহার উপর অন্যায় অত্যাচারবার্তা দেশবিদেশে প্রচার হইয়াছে সকলই জানিতেছেন; কিন্তু তাঁহার অপমান কলঙ্ক আজও হৃদয়ে প্রলেপিত রহিয়াছে—মনে করিতেছেন, তাহা এজন্মে আর উঠিবার নহে। গজানন সেদিন বিচারালয় হইতে প্রস্থান করিয়া পথ ত্যাগ করিয়া নদীর কূলে কূলে কাদা কাঁটা ভাঙ্গিয়া অঙ্গে কর্দম লেপন করিয়া, বস্ত্র ছিন্ন করিয়া পাদুকা ফেলিয়া কোন গুপ্ত গলি হইয়া আবাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিলাতী বিড়াল অপেক্ষা জজ সাহেব আরো ভয়ানক! শিবসহায়ের সহিত আবার সাক্ষাৎক্ষণ পর্যন্ত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, সান্ত্বনা দিতেছেন—সকল ঘটনা গ্রহের বৈলক্ষণ্যমাত্র কহিতেছেন, গত কথা অনুশোচনা অনাবশ্যক প্রভৃতি নানাপ্রকার বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছেন। নিরীহ শিব-

সহায় কেবল ঈশ্বরের বিচার প্রতীক্ষা করিতেছেন, সকলে তাঁহার নিকট হইতে অবসর হইলে, তাঁহার পুরাতন ভৃত্য ও মন্ত্রী রামভদ্র খানসামা নিকটে আসিল, দেখিবামাত্র কহিলেন, "আমার কাদম্বিনী কোথায়? একবার শেষ দেখা দেখিব, গৃহে যাইব না, তাহাকে দেখিয়াই তীর্থবাসী হইব।" আবার রামের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, "তোমার কপালে এ কি ভয়ানক আঘাতের চিহ্ন?"

রাম কহিলেন, "সেই ডাকাইতির রাত্রে কাহারও পরিত্রাণ ছিল না, ভগবানের ক্রোধ একবারে সকলের উপরই পতিত হয়! পূজার দালানের বড় সিঁড়ির নীচে ত্বরা করিয়া প্রবেশকালে খিলান মাথায় লাগিয়া মস্তক ফাটিয়া যায়।"

শিবসহায় কহিলেন, "তবে আমার বিপদেই তোমার? হায়! হায়! আমার কাদম্বিনীর ত কোন বিপদ হয় নাই?"

রাম কহিলেন, "একটি অদ্ভুত ঘটনা বলিব, মা কালীর বিশেষ অনুগ্রহ-বশতই তিনি উদ্ধার হইয়াছিলেন—নচেৎ প্রাসাদ হইতে পতিত হইয়া তাহার নিশ্চয় প্রাণান্ত হইত।"

শিবসহায় আগ্রহাতিশয় বচনে কহিলেন—"কি বলিলে প্রাসাদ হইতে পতিত হইত—হায় কপাল! সে দিন আমাকে দেখিতে হইত?"

রাম। তাই হইত, কিন্তু কি কহিব যখন দেশ সমস্ত নিস্তব্ধ, সকলে ভীত, সকলে লুক্কায়িত, সেই ঘোর রজনী ভেদ করিয়া ঘোর বিপদ, নৃশংস লোকের আক্রমণভয় অবহেলা করিয়া বীরপুরুষ অমরেন্দ্রনাথ রণ-সজ্জায় আমাদের গৃহে আসেন, যে যত বীরত্বের বাহাদুরী লউন, ঐ রঘু সর্দার তাঁরই আঘাতে পতিত হয়, কাদম্বিনী দিদিকে আশু মৃত্যু হইতে, রঘুর মশাল-বহ্নিজ্বালা হইতে অথবা প্রাসাদ হইতে পতনে অপঘাত মৃত্যু হইতে অমরেন্দ্র-বাবুই রক্ষা করেন, ক্রোড়ে লইয়া পলায়ন করেন, আমিই সে সোপানতল হইতে তাহা দেখিয়াছি, আবার শুনিয়াছি, অশ্বারোহণে কাদম্বিনীকে অশ্বে লইয়া নদী পার হইয়া গুরুদেবের আশ্রমে নিরাপদে রাখিয়া যান, আমিই জানি আর কেহ জানে না।

আচম্বিতে শিবসহায় নিস্তব্ধ হইলেন, আবার তাঁহার চক্ষের ধারা দরদর করিয়া পতিত হইল। ভাবিলেন, আশুতোষবাবু পূর্বশত্রুতা ভুলিয়া নিজ মহত্ত্বে তাঁহাকে কারামোচনের উপায় করিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র আরো উপকারী, তাঁহার একমাত্র অবলম্বন স্নেহাস্পদ প্রিয়তমা কন্যাকে দস্যু-অস্ত্র ও মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, ইহাদের ঋণ কি প্রকারে পরিশোধ করিবেন, বিশেষ তিনি ত আর সংসারে দেশেও থাকিবেন না।

রাম আবার কহিল, "আপনার আরো ঋণ আছে, ডাকাইতির পূর্বাহ্নে দেড় হাজার টাকা রাঙ্গাঠাকুরাণী কর্জ দেন, তাহাও দস্যুগণ অপহরণ করিয়াছে।

রাঙ্গাঠাকুরাণী তাহা শুনিয়াছেন, টাকার জন্য তাঁহার অত আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহার একমাত্র অনুরোধ আছে, অনুমতি করেন ত নিবেদন করি।"

শিবসহায় কহিলেন, তিনিও আমার একটি কন্যাস্বরূপা, চিরকাল স্নেহের আস্পদ, তাঁর অনুরোধ নহে, আবদার—তিনি কি বলিয়াছেন?"

রাম একবারেই কহিল, "কাদম্বিনীর সহিত অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ দেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। উভয়েই উভয়কে দেখিয়াছেন, ভালও বাসিয়াছেন।"

শিবসহায় হাসিয়া কহিলেন, "আমার এমন দিন হবে! অমরেন্দ্রনাথের মত জামাতা পাইব, আমি অনেক কাল জানি, আমাদের অঞ্চলে এরূপ সুযোগ্য পাত্র আর নাই, জাতিপ্রভেদ তত আপত্তি নহে, উভয় বংশই ক্ষত্রিয়, আমি একবার আশুতোষবাবুর শত্রুতা সাধন করিয়াছি তাহাতে হীনাবস্থার লোক, যদি প্রস্তাব করিলে অগ্রাহ্য করেন সে অবমাননার আশংকাতেই নীরব ছিলাম, অপর চেষ্টা করিতেছিলাম; যদি এখন স্বয়ং একথা উল্লেখ করেন, আমার তাহাতে সর্বতোভাবে সম্মতি।"

এই সংবাদ ত্বরিত রাঙ্গাঠাকুরাণীর নিকট বাহিত হইল। আশুতোষবাবুর কর্ণগোচর হইল, তিনি অপর কোন দ্রব্যের প্রয়াসী ছিলেন না—সুন্দরী গুণ-সম্পন্না হইলেই তাঁহার পুত্রবধূ হইবে, সে কুসুম সরোবরে, বনে বা উদ্যানে বিকশিত হউক, লালিত্যসম্পন্না হইলেই তাঁহার অন্তঃপুরাঙ্গণে রোপিত হইয়া শোভা সংবর্ধন করিবে। তাহার আপত্তি কি, কারণ রাঙ্গাঠাকুরাণী স্বয়ং দেখিয়া কহিয়াছেন, কাদম্বিনী সুনির্মলা সুন্দরী কন্যা, বড়ঘরের গৃহিণী হইবার জন্যই বিধি তাহার সৃজন করিয়াছেন। অপর পক্ষে, কন্যা-সম্প্রদান পরে তাঁহার সাংসারিক কার্য্য আর কিছু করিবার নাই—শুভবিবাহ সম্পন্ন হইলেই শিবসহায় কাশীধামে যাত্রা করিবেন।

ঊনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ
নীলমণির লীলাখেলা

গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হইয়াছে। আমরা গৃহে আসিয়াছি, বহুদিনান্তর প্রবাসী গঙ্গাধর স্বগ্রামে স্বগৃহে আসিয়া স্বর্গের আনন্দ ভোগ করিতেছেন। পাঠক! যদি তুমি প্রবাসী হও আমি আশীর্বাদ করি যেন মধ্যে মধ্যে গৃহে আসিয়া আমার মত সুহৃজ্জনসম্মিলনসুখ সম্ভোগ কর। প্রবাসে তুমি যে বীর হও, রাজপুরুষ হও, উকিল হও, মেজেস্টর হও, বারিক মাস্টার বা কনেস্টেবল হও, গৃহে আসিয়া চূড়ধড়া ছাড়িয়া পাগড়ি পোষাক ত্যজিয়া, রাজদণ্ড রাখিয়া রাখালে লাঠিহস্তে ভ্রমণ করিতে সুখানুভব কর নাই? যদি করিয়া থাক তবে গঙ্গাধরের সঙ্গী হও, না হও রাখালবেশ তুচ্ছ করিয়া রাজবেশেই বেশধারী হইয়া সং সেজে থাক। অদ্য গঙ্গাধর ঘরে

ঘরে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেছেন—সঙ্গে কনিষ্ঠা প্রফুল্ল ভগ্নী ও প্রিয় হরিণটি চলিতেছে, সকলকে প্রণাম করিতেছেন সকলের কাছে আদৃত হইতে-ছেন। প্রথমতই আশুতোষবাবুর বৈঠকখানায় যাইয়া দেখিলাম অমরেন্দ্রনাথের বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে, হীরার পুতুল, সোণার ঠাকুর, জরির কাপড়, কাশীর খেলনা, সোণার গোলাপ, কাটাকাঠি, কত কত সোণারূপোর থাল মিষ্টান্নে সজ্জিত হইয়া কন্যা দেখিতে যাইতেছে। তথা হইতে গজাননের বাটীর দিকে চলিলাম, দুটি বাজার পার হইলাম, দেখি, সাহেবানী গোয়ালিনীর কুড়ে ভেঙ্গে কোঠা হইয়াছে—খড়খড়ি নীলরঙ্গে রঞ্জিত, দ্বিতলে একটি কামরা সুসজ্জিত, ঝাড় ঝুলিতেছে, জানালায় লাল রঙ্গের পরদা, একটি পরদা পাশে ও কে উঁকি দিয়া পলাইল? যেমন নীলমণির মত মুখ দেখিলাম। দরজাতে দ্বারবান, একটি কুহকরচনা বোধ হইল—ভাবিতে ভাবিতে গজাননের ইমারতে পঁহুছিলাম—এ ঘরে আজ সকলই চুপচাপ—গজানন বিমর্ষ—তিনি জানিয়া-ছেন, হাজারে তোড়ার মধ্যে ১৭টি নাই—তাহার ধনাগার হইতে অপসৃত হইয়াছে, আরও গিয়াছে কি না, তাহাও জানিতে অশক্ত, কারণ সেই অন্ধগৃহে নীলমণি একটি বিড়াল ছাড়িয়া রাখিয়াছে—আমি গজাননের গৃহে পঁহুছিবার কিঞ্চিৎকাল গতেই সুবসন সুশ্রী নীলমণিবাবু সমাগত, এখন তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ নটবরবেশ ধারণ করিয়াছেন, তাহার আগমনে স্টমবটল্টর আতরগন্ধ চারিদিক আমোদিত হইল, অতি নম্রভাবে আমায় প্রণাম করিলেন। তাহার ভক্তিভাবে অনেকেই বলেন এমন সুসন্তান আর হতে নাই —কিন্তু এই অতিভক্তি চোরের লক্ষণ, বদমাইসের গোড়ার চ্ছেদ, তাহা বৃদ্ধা ঠাকুরাণীরা বুঝিতেন না। যাহা হউক, আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে গজানন তাহাকে ডাকিলেন।

গজা। দেখ বাবা নীলমণি! আমার সেই শয়নঘরের পার্শ্বে ১৭টা তোড়া নাই।

নীল। নাই ত কি করব—আমার কাছে কিছু চাবি রেখে গেছলে।

গজা। তা নয় বাবা—বলি ঘরের লোক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

নীল। ঘরের লোক হলেই বুঝি চোর হয়, আপনি ত বড় বলতে আরম্ভ করিলেন।

গজা। আমি কি তোমায় চোর বলতে পারি বাবা, তবে ঘরের ছেলে যদি আবদার করে কিছু লয়ে থাক।

নীল। প্রকারে চোর বলা হল, আপনি জানেন চোর বললে ইন্ডাইট করতে পারি?

গজানন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তোকে মারবার এক্তার আছে জানিস?"

নীল। "প্রাপ্তেচ ষোড়শ বরষ পুত্র মিত্র বটআচরেৎ।" আমি ষোল বৎসরের হয়েছি জানেন?

গজানন গলিয়া গেলেন—"বাবা, তোমার এত বুদ্ধি—তবে কেন এমন ক্ষেপাগিরি করিস?"

নীল। আমি ক্ষেপাগিরি করি না, তুমি আমায় ক্ষেপাও।

গজা। হে বাবা, টাকাগুল হল কি?

নীল। বাবা তোমার কেবল টাকা টাকার কথা—কি হল আমি কি জানি?

গজা। দেখ এরূপ অন্যায় হলে তোমার উপর ত আমার বিশ্বাস থাকবে না—তোমাকে নিগূঢ় কথা বলিতেই হবে—না হয় এই বেত দেখিতেছ, মারিব।

নীল। আমার হাট নাই?

গজা। কি বল্লি বেটা—এত আস্পর্দ্ধা, বেটাকে বেতে সোজা করব, কহিয়াই গজানন নীলমণির পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিলেন, ও কহিলেন, "এত কষ্টের টাকা খৈছড়া করেছে?"

বেত্রাঘাত শুনিয়া আমি দৌড়িয়া যাইয়া উভয়ের মধ্যস্থ হইলাম ও বিভাগ করিয়া দিলাম। নীলমণি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ও কহিলেন—"না হয় মদ আফিং গাঞ্জা টানিয়া খাইয়া মরিব আত্মহত্যা করিব—না হয় দেশত্যাগী হইয়া প্রস্থান করিব।"

গজানন নীলমণির অভিসন্ধি শুনিয়া আবার অস্থির—"রাগ চণ্ডাল, বাবা গৃহত্যাগের কথা কিরে বাবা, কারে লয়ে থাকব।" নীলমণির আঁখি মুছিয়া দিলেন, আপনিও কাঁদিলেন আবার কহিলেন, "অবোধ ছেলে শিক্ষা দিবার জন্যই এসব কথা বলি, আবার কি খাবে বল্লে, অমন কথা মুখে আনিতে নাই, পিণ্ডিতে দোষ পড়ে।"

নীলমণির সম্মুখে গজানন আমায় আবার করিলেন, "গঙ্গাধর" তুমি নীলমণিকে বুঝাও, তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিবার আমার এক্তার আছে—নিতান্ত মন্দ চালচলন দেখি সমুদয় বিষয় দেবসেবায় অর্পণ করিব—না হয়, অন্য কাহাকেও দান করিয়া যাইব, সৎকার্য্যে অর্পণ করিব—ও মনে করে কি" এই কথাগুলি কহিয়াই গজানন চলিলেন।

নীলমণি কহিলেন, "বুড়র বড় ক্ষমতা, এক বড়ি আফিঙ্গের ওয়াস্তা, বেটা কবে চেয়ে থাকবেন। দাদা ওঁর দানের কি ক্ষমতা আছে? মনে নাই যখন পোষ্যপুত্রে করেন সকল বিষয় লিখাপড়া করিয়া আমাকে অর্পণ করিয়াছে—বুড় ত আমার হাততোলা খাবে—পোষ্য পেনসনর, আমি বুঝি নাই। দলিলটি হাতে ধরে রেখেছি।"

গজানন নীলমণিগতপ্রাণ, তাহার মায়াতে আবদ্ধ, সকল দিকেই দূরদৃষ্টি, কেবল নীলমণির স্নেহে অন্ধ, নীলমণি কি কখনই তাহার অবাধ্য হইবে? স্বপ্নেও একথা দেখেন নাই এই ভ্রমেই তাহাকে সকল বিষয় অর্পণনামা লিখিয়া সম্প্রদান করিয়াছিলেন; সেই বিষয় কত অসৎ কার্য্য করিয়া, কতবার বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া, চাতুর্য্য চৌর্য্যবৃত্তির উপদেশ দিয়া, না পরিয়া না খাইয়া, সম্ভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া অস্মরণীয় কৃপণনাম সংসারে রাষ্ট্র করিয়া সংগ্রহ

করিয়াছিলেন, সেই অর্থ তাহার সম্মুখে জলের মত নীলমণির হস্ত হইতে অজস্র অসৎ পথে ঝরিয়া চলিতেছে: লাম্পট্য, মদ্যপানের উপযোগীমাত্র হইতেছে,—কবে নিজেই বিষপানে প্রাণাবশেষ হইবে, এই আশংকায় এ মনঃকষ্টে গজানন এখন দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। এই নীলমণির লীলা-খেলা—এই ত মর্ত্ত্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। গঙ্গাধর কহেন, "এই প্রকারেই গজাননের পিণ্ড ছর্দ্দন হইতেছে বা পিণ্ডপ্রদান-মন্ত্র ছন্দকৃত হইতেছে।"

চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ
রঘুবীরের কারাবাস

আজ আবার তেমিনি ভিড়। প্রসিদ্ধ ডাকাইত দলের সর্দার রঘুবীর বিচারালয়ে আনীত। তাহার মস্তকে আঘাত বহুদিন হইল আরাম হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে যেন বাঘে ছুঁইয়াছিল, বিষ অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত শরীরে ব্যাপ্ত ছিল, ঐ কাল সমস্ত সে ক্ষিপ্তপ্রায় ছিল। কি বলিত, কি ভাবিত, কোন বিষয়েরই স্থির ছিল না। এত দিনে নিজ নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করিতে সক্ষম হইয়াছে কারণ একজন ইংরেজ চিকিৎসক সাহেব স্বয়ং হস্তে লিখিয়া দিয়াছেন যে, রঘুবীর সুবোধ হইয়াছে। জজ সাহেব বাহাদুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কহিল, "বন্দে-গান হুজুর আমার বাপ দাদা কখন চোর ছিল না, ভাত খাইতে কখন কাহার পাতটি কাটিয়া লই নাই: দোহায় বড় সাহেবের, এসব দরোগার ফেরেপ, দারোগা আমাকে ঘরে থামতে দেয় নাই, আজ ঘরতল্লাস, কাল নজরবন্দি, পরশ্ব হাতকড়ি, হুজুরালি বলিব কি। আমার ঘুমাইবার যো নাই, রাত্রে দারোগার লোক তিনবার যাইয়া নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দেয়, আবার ঘরের লোকের উত্তর মঞ্জুর করে না, নিজে উত্তর না দিলে বলে রাত্রে ঘরে ছিল না, কোথায় ডাকাইত ধরতে গেলাম, দলবল একত্র হয়ে মেলে, আবার আমাকেই ডাকাইত বলিয়া ধরে দিলে।"

জজ। মাল কোথায় পেলে ?

রঘু। ধরেও ক্ষান্ত নাই, হুজুর গোপাল চৌকিদার সব মাল লয়ে এল, আমার গাঁঠে বান্ধিয়া দিল, আবার বললে একবার করিতে হইবে। আমি বলিলাম, "কেন করিব ? অমনি একরার পড়ে রয়েছে ?" অমনি দারোগা ক্রুদ্ধাক্ষি, আমার মাথায় এক চোট মারিল আমার সাজা হয়ে গেছে হুজুর, আজ দেড় বৎসর কাল শয্যাগত, দারোগার মনে এত কথা ছিল।—বলিয়াই কান্দিতে আরম্ভ করিল।

জজ। দারোগার রাগের কারণ ?

রঘু। মনোবাদ হুজুর, একটি মোকদ্দমা তদারক জন্য আমাদের গ্রামে যান, আমার বাপের খাঁসি লয়ে কাটেন, দোষের মধ্যে বাবা মূল্য চান,

তাহাতে দারোগা কহেন, "তোমার বংশোচ্ছেদ করিব"—সেই শাপে পড়েছি হুজুর—

জজ। সে কত দিনের কথা?

রঘু। দশ বৎসরের।

জজ। তোমার বাপ কত দিন হইল মরিয়াছে?

রঘু। চৌদ্দ বৎসর।

জজ। তবে দশ বৎসর পূর্বে তোমার বাপের সঙ্গে দারোগার কেমন করে বিবাদ হইল?

রঘু। আমি ত ছেলেমানুষ। মথ লোক অন্ধ-বলদ।

জজ। কত বয়স?

রঘু। পাঁচিশ, পঞ্চাশ হইবে।

জজ। তুই দোষী না নির্দোষী?

রঘু। আমার চৌদ্দপুরুষ নির্দোষী—

জজ সাহেব দেওয়ানজীর প্রতি চাহিলেন, কহিলেন—"ইহার খালাসের রায় লিখ।"

সুসময় বুঝিয়া রঘু চীৎকার করিয়া কহিল, "উহু উহু! মাথা কন্ কন্ করিয়া উঠিল—হুজুরআলি আমার সব কথা শেষ হয় নাই।"

জজ। আর কি কথা আছে?

রঘু। একরারের জন্য আমাকে বন্ধ করিয়া দারোগা সাহেব ও নাজির সাহেব যে মাথা ভাঙ্গিয়া দিল, তাহার বিচার চায়—

জজ। আলবাৎ হোগা। গোপাল চৌকিদার তোমাকে ধরিতে আঘাত করে না।

রঘু। দোহায় বড় সাহেব উপরে ভগবান নীচে হুজুরালি, সে রাত্রে গোপালের মুখ পর্যন্ত আমি দেখি নাই। আমার একই কথা, হুজুর, এক-দিকের সূর্য্য আর একদিকে উঠিলেও মিথ্যা কহিব না।

উকিল সরকার কহিয়া উঠিল, "দেশের অবস্থা হুজুর বিলক্ষণ জ্ঞাত, দেশীলোকে যা না জানে হুজরগণ তাও জানেন, আপনার বুদ্ধি বিশ্বব্যাপী, দেশীলোকে যে কার্য না করিতে পারে, আপনারা তা পারেন।_ দেওয়ানজী মহাশয়! দেশ পয়মাল হল—এ ব্যক্তি খালাস পাইলে ইহার পর নরহত্যা হবে —কবে শিবসহায়ের লাস এসে পঁহুছিবে।"

দেওয়ানজী সাহেবের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "কি রায় লিখিব—নিজামতে যাইলে জুতা খাইতে হইবে, এ সঙ্গীন ডাকাইত, হুজুরালির ওয়ালেদে লাট বুসুলের বিচারে ইহারই বাপের ডাকাতি-অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।"

জজ। ইয়ে কোন হ্যায়?

দেও। পঞ্চম সর্দারের পুত্র।

জজ। ঠিক্ ঠিক—দেখ রঘুবীর যব বিলাইতসে হাম আইয়া, হাম শুনাথা, তোমরা বাপ জেঠা বড়া ডাকু থা—তোম বড়া হারামজাদা, দেখ রঘুবীর, চোদা বরস বা মিহনত তোম কয়েদ রহগে, কালাপাণি ভেজা যাগা। আর ম্যাজিস্টর সাহেব-কো পাস হাম হুকুম ভেজতা হ্যায় বাদ তহ্‌কিকাৎ নাজির ও দারোগাকো হামারা আদালতমে সাজা দেনেকো ওয়াস্তে সুপর্দ করে। এ রঘু য্যাসা হারামজাদ, ওন্‌লোক এইসা সংগাদিল হ্যায়।

একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

পরিণয়োৎসব

শ্রীনগর আজ পরমশ্রী ধারণ করিয়াছে। গৃহে গৃহে, হর্ম্যে হর্ম্যে, প্রাসাদে প্রাসাদে নবনব আম্র-শাখা নবীনপল্লবগাথ সুরঞ্জিত, কুসুমমালা থরে থরে দুলিতেছে, উচ্চ উচ্চ প্রাসাদচূড়ে রোহিতরঙ্গরঞ্জিত পতাকাশ্রেণী উড্ডীয়মান, স্থানে স্থানে চৌ-মাথা মিলিত পথে সুন্দর তোরণে তূর্য্যকদল বাদ্য-বিনোদনে মত্ত, গৃহদ্বারে শুক্ল ধান্যাসনে পূর্ণ ঘট সংস্থাপিত তাহার পশ্চাতে বিস্তারপত্রশালী কদলীবৃক্ষদল সুরোপিত হইয়াছে, নব ফুল্ল পুষ্পদল পরিমল বিস্তার করিতেছে, আনন্দলহরী আজ শ্রবণ জুড়াইতেছে। উৎসব-সংগীত-তরঙ্গ নগরে উথলিত হইয়াছে। সকল গৃহ-প্রাঙ্গণই ধৌত ও পরিস্কৃত, নগরের সমস্ত গৃহ-প্রাচীরে যুবতীগণের কোমল হস্তে কত কত লতা, পাতা, পুষ্প, তরু, শতদল অঙ্কিত হইয়াছে। কত কত কলিঙ্গা, মন্দির-তারা গবাক্ষ-মুখ, বাতায়ন, কারনিস, প্রাসাদ, বারান্দা, প্রাচীর-চূড় প্রভৃতির অনুরূপ প্রদেশী মালাকারগণের নৈপুণ্য-পরিচয় শোলানির্মিত সুন্দর রঙ্গরঞ্জিত ফুলঝারা, ঝালর, শতদল, কদলিগুচ্ছ, মৎস্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্ব, গজ, সৈন্য-শ্রেণীতে শোভমান। আশুতোষবাবুর বৃহৎ অট্টালিকার দিকে দেখ, যেন তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যপ্রভা দিঙ্মণ্ডলে আলোককণা বিকীর্ণ করিয়াছে; সূর্য্য অস্তমিত হইবামাত্র সোপানশ্রেণী, স্তম্ভ, বাতায়ন, কারনিস, আলিসা, মন্দিরচূড়ে লক্ষ লক্ষ দীপমালা চঞ্চলশিখাতে জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত হর্ম্য যেন আলোকসলিলে ভাসমান, অট্টালিকার সুবিস্তার প্রাঙ্গণে রজতস্তম্ভ শ্রেণী-শিরে একটি বৃহৎ চন্দ্রাতপ আবৃত, চতুষ্পার্শ্বে মুক্তার ঝালর ঝলমল করিতেছে, চন্দ্রাতপের ছাদে রাঙ্গা ও নীল চাদরোপরি শুভ্র রেশমী ডোরে নানাপ্রকার পদ্ম, নানাপ্রকার পুষ্প অঙ্কিত, কোথাও অশ্ব গজ মৎস্য লিখিত দেখিতেছি, সেই চন্দ্রাতপ হইতে দীপাসয় স্ফটিক-গঠিত ঝাড়, লণ্ঠন, ডোম লেম্প, চীনের ফানস স্থানে স্থানে ঝুলিতেছে, স্তম্ভশ্রেণী পাশে সুসজ্জিত ভীষণ প্রহরীগণ রৌপ্যনির্মিত দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান, তলদেশে সুসজ্জিত কারুকার্য পরিচয় সুবর্ণ, রজত, ও রেশমী সূত-বিনির্মিত প্রশস্ত আসন

বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যদেশে সমুচিত শয্যোপরি প্রাতঃকালের প্রসন্ন-রবিচ্ছবিসদৃশ সুকুমার অমরেন্দ্রনাথ বরের বেশে উপবেশিত, তাহার দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি সজ্জিত সুশ্রী বালক সুবর্ণ হাতল হস্তে চামর ব্যজন করিতেছে, বাহিরে তোরণে তূর্য্যকদল বাদ্য বাজাইতেছে, অনতিদূরে কালিন্দী-সরোবরকূলে হাহুইগুচ্ছ আকাশ ভেদ করিয়া শতমুখী অগ্নিস্রোতে লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্তার করিতেছে; আবার নীলগগনে তারকারাজির সহিত মিলিয়া যাইতেছে; মধ্যে মধ্যে একটি তুপড়ি, চরকি খর খর ঘুরিতেছে থেকে থেকে এক একটি বম্বের শব্দ কর্ণভেদ করিতেছে। সভামধ্যে নর্ত্তকীগণ স্বর্গের অপ্সরাবৎ পেশওয়াজ-সাজ পরিয়াছে কিম্বা সুললিত অঙ্গ দর্শাই-বার আশয়ে বস্ত্র ত্যাগ করিতেছে, ভেড়ুয়াদল সুপক্ক শ্মশ্রুদল সুবিলাসিত করিয়া এক একখানি লম্বা চাদরে তবলা রাখিয়া দিয়াছে, আদেশ হইবামাত্র কোমরে বান্ধিবে; সারঙ্গীগণ যন্ত্রের কাণে মোচড় দিতেছে, সমস্ত দিন তাম্বূল চর্বণে, হুঁকার টানে ব্যস্ত ছিল, যন্ত্র সিজিল করিতে এইমাত্র সাবকাশ পাইয়াছে। আপাততঃ দর্শকদল কুস্তিখেলা দেখিতেই ব্যস্ত, চারিদিক হইতে মল্লযুদ্ধ-নিপুণ ভীষণ মল্লগণ আসিয়া জুটিয়াছে। কেহ পঞ্চ পঞ্চ মণ গুড়ি কড়ি উত্তোলনে বাহু বিস্তার করিয়া প্রত্যেক হস্তভার আকাশে ধরিয়াছে, কেহ বহুভার ঢেঁকির অঙ্কশূল দন্তে ধরিয়া ঢেঁকি সহিত উঠাইয়া আপন মস্তক পার করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। দুইজন ভীম পুরুষ কান্ধে কান্ধে দাঁড়াইতেছে, একজন "উড়ও পাক" দিয়া উপরস্থিত পালওয়ানের মস্তকে ক্ষুদ্র অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইতেছে—দুই দুই জন বাহুযুদ্ধে মত্ত—কেহ উরসোপরে উপলখণ্ড রাখিয়াছে, সেই সেই প্রস্তর গুরুতর পরশু বা কুড়ালের হাতল ধরিয়া উল্টা আঘাতে চূর্ণ করি-তেছে—এমন সময় অপরিচিত গোয়ালিয়র দেশস্থ এক মীরমল্ল আসিয়া উপস্থিত হইল, সে তাহার বৃহৎ গোঁফদাড়ি ও জুলফির প্রচুর অর্ধপক্ক কেশদল উল্টাইয়া মুণ্ডোপরি বান্ধিয়াছে, মস্ত শরীরে পাটল মৃত্তিকা চূর্ণ প্রলেপ, বক্ষবিস্তার যেন কোন দুর্গের লৌহনির্মিত কপাটপাট, বাহুযুগল দুইটি মুদ্গর বিশেষ—নিবেদন করিবামাত্র মীরসাহেব পেঁচ খেলিতে অনুমতি পাইল, আশুতোষবাবুর পালওয়ানের মধ্যে যে ব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ তাহার সহিত মীরসাহেব প্রথমতঃ খেলিতে আরম্ভ করিলেন—কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার দক্ষিণহস্তে পেঁচ মারিয়া দ্বাদশ হস্ত দূরে উর্বীতলে সজোরে প্রপাত করিলেন, যেন ভূকম্পে পর্বতকোলে একটি মহীরুহ পতিত হইল। মীরসাহেব এখন একটি লম্ফে উপরতলে দ্বাদশ হস্ত উচ্চে একটি বাতায়নের রেল স্পর্শ করিল ও মুহূর্ত্ত মধ্যে আকাশে পাক দিয়া ভূমে দণ্ডায়মান হইল, পালওয়ানকে নিক্ষেপের সঙ্গে এই খেলাটি এত চকিৎ ও ত্বরস্থ খেলা হইল যে, সকলে চমকিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে এ কি মানুষ না অদ্ভুত মন্ত্র সাধনে শারীরিক নিয়মাবলী হইতে মুক্ত পাইয়াছে। মীরসাহেব বিজয়লাভ করিয়া

বাহুতে তাল ঠুকিতে ঠুকিতে অমরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। আশুতোষবাবু সন্নিকটস্থ দ্বিতীয় হর্ম্য হইতে মল্লযুদ্ধ দেখিতেছিলেন, মীরসাহেবের বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ব্যাঘ্রশিকারের পুরস্কারস্বরূপ রঘুবীরের জন্য উষ্ণীষ ও রজত আলবালদ্বয় প্রস্তুত ছিল, তাহা এই সময়েই এই মীরসাহেবকেই দান করিতে অমরেন্দ্রনাথকে অনুরোধবাক্য প্রেরণ করিলেন। মীরসাহেব আসর মধ্যে প্রবেশ করিল, করযোড়ে গরুড়ধ্বজ সম্মুখে গরুড়সম বিনীতভাবে অমরেন্দ্রনাথের আসনের কিঞ্চিৎ দূরে বসিলেন। অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং উষ্ণীষ ও বালা মীরকে প্রদান করিলেন, মীর অমরেন্দ্রনাথের পদকমল ধরিয়া অবনত হইয়া সেলাম করিবার সময় পরকেশ-বিনির্মিত শ্মশ্রুরাশি ফেলিয়া দিল, অমরেন্দ্রনাথের প্রতি দেখিয়া কহিল, "বীর ত হুজুর—দেড় বৎসর পাগল হয়েছিলাম, এখনও মস্তকে এই চিহ্ন ধারণ করিতেছি।" কহিয়াই নিজ পুরস্কার হস্তে করিয়া পলকে অন্তরিত হইল—অমরেন্দ্রনাথ চমকে কহিয়া উঠিলেন, "এ যে রঘুবীর এ না দ্বীপান্তরে প্রেরিত হয়েছিল?" উহার নিজবাক্য প্রয়োগ করিয়া অনেকে আচম্বিতে কহিয়া উঠিল, "কারাগৃহের প্রাচীর উহার এক লাফের ওয়াস্তা, কালাপাণি উহার এক ডুব এক সাঁতার এক শূন্য কলসি পারাবারের পথ।" সকলে জানিল, রঘুবীর আবার দেশে আসিয়াছে। গজানন মনে করিলেন, আবার কারবার চলিবে।

এখন গজাননের আর এক ভাবনা—নীলমণির লাঠির চোটে তাহার বামপদ ফুলিয়া গিয়াছে, তবু মনে করিতেছেন—তাঁহার এই সভায় উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। শিষ্ট, শান্ত, জ্ঞাতি, আত্মীয়কুটম্ব, বন্ধু, পণ্ডিত সভ্য সজ্জন সকলেই উপস্থিত, এইখানেই ত ভবিষ্যতের আশাভরসা গুরুজনের নিকট যুবাগণের পরিচিত হওয়া উচিত। নীলমণিকে সভায় আনিতে দুইটি লোক প্রেরিত হইল—সন্ধানে তাহাকে সুন্দরী গোপিনীর গৃহে পাওয়া গেল। দুলিতে হেলিতে আসিয়া মধুমত্ততা প্রযুক্ত আরক্ত-বর্ণ লোচন ঘুরাইতে ঘুরাইতে সভা আলো করিয়া দাঁড়াইলেন ও কহিলেন, আমায় আবার এত রাত্রে কেন বিরক্ত করিতে পাঠায়েছিলেন?" সভ্যসমাজে তাহার পরিচয়ের পর্য্যাপ্ত হইল, গজানন ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে কহিলেন, সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল, সন্তান হলেই হয় না, এই এক পুত্র অমরেন্দ্রনাথ আর এই এক পুত্র! পিতৃপুণ্য আবশ্যক!

এদিকে আশুতোষবাবু আজ অসীম আনন্দে ভাসিতেছেন, প্রচুর ধনশালিত্বের গৌরব আজ বৃদ্ধি করিতেছেন, আপনার মর্ম্মান্তিক উদারপ্রবৃত্তি যথেষ্টমত পরিতৃপ্ত করিতেছেন। দরিদ্রদল, পথিক জন, গ্রামের মালাকার, কর্ম্মকার, নাপিত, রজত, ঘাটের পাটনি, বাদ্যকর, সঙ্গীতকর, প্রহরীদল, ভৃত্য, অনুগত, সামাজিক শুভকার্য্য-সম্পাদক সমস্ত লোকেরই তাঁহার প্রসাদেই আজ উৎসব। তর্কালঙ্কার মহাশয় অমরেন্দ্রনাথের নিজ বাস-ভূমে প্রবেশ-পাপ-প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দ্বিগুণ পরিমাণ ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। শীতু ক্ষেপার

চিরন্তন দাবীকৃত জমি অপর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়া আশুতোষ বাবু স্বয়ং দ্বাদশ বিঘা জমি দান করিলেন ও তাহার উদ্বাহসম্পন্ন হেতু বয়োধিকা কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যানুসন্ধানের আদেশ করিলেন। বৈবাহিক বাবু শিবসহায় প্রিয়মতা কন্যার বিদায়ে যেন গৃহলক্ষ্মী বিসর্জনের পরেই শয্যাশায়ী হইয়াছেন, তাঁহার বহুদিন আর জীবিত থাকিবার আশা নাই; যদি আরোগ্য হন, তাঁহার কাশীবাসের সমস্ত উপায় নির্ধার্য্য করিয়াছিলেন। আজ মর্ত্ত্যে আশুতোষবাবুই কল্পতরুস্বরূপ বিদ্যমান। এই কল্পতরুচ্ছায়া বঙ্গে দিনে দিনে ক্ষীণাকার হইতেছে, কারণ আমরা সভ্য হইতেছি বাহ্যিক পারিপাট্যের অসার কার্য্যের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে ও সভ্যতার সহিত উদার নয়ন মুদিতেছি, দারিদ্রতা কৃপণতা ঘেরিতেছে, বা স্বার্থপরতা দেশসমাজে দিনে দিনে উৎসাহ-সলিলে বর্ধিত হইতেছে।

দ্বি চ ত্বা রিং শ ৎ প রি চ্ছে দ

গজাননের অপঘাত মৃত্যু

এদিকে উৎসবকাণ্ড শেষ না হইতেই বিবাহলগ্ন উপস্থিত। কক্ষে কক্ষে মঙ্গলধ্বনি শংখনিনাদ হইল—সেই মঙ্গলরব মধ্যে গুরুজনের অনুমতি লাভ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ সহস্র দীপিকাশ্রেণীমধ্য হইয়া বালসূর্য্যকিরণস্বরূপ উদ্বাহমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এখন বাহিরের সভা কিঞ্চিৎ শোভাহীন হইল, অনেক সভ্য সভা ত্যাগ করিলেন। গজানন নিঃশব্দে বসিয়া কি ভাবিতেছেন, ভাবিয়া বসিয়া আছেন, বাহ্যিক ঘটনার প্রতি তাঁহার তাদৃশ লক্ষ্য নাই, পোষ্য-পুত্র নিযুক্তি অযুক্তি—বৃদ্ধবয়সে তরুণ-ভার্য্যা গ্রহণাপেক্ষা লাঞ্ছনা এই ভাবিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে কিয়দ্দূরে দেখিলেন, নিবিড় শ্মশ্রুধারী রক্তরঞ্জিত উষ্ণীষমস্তক দুই জন মহাবীর দণ্ডধারী পদাতিক দণ্ডায়মান, তাহারা একখানি সুগোল মোহরমুদ্রিত ওয়ারেণ্টনামা আদেশপত্র বিস্তার করিয়া কহিতেছেন, "দোহায় মহারাণী আমরা গজাননকে এই আদেশবলে ধৃত করিব।" গজাননের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিবামাত্র তাহার ঘোরনিদ্রা কুস্বপ্নে ভঙ্গ হইল, "আমায় গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে" এই কথা উচ্চারণ করিয়াই সভা ত্যাগ করিয়া দ্রুতগতি আশুতোষবাবুর সম্মুখবর্তী অট্টালিকার দ্বিতলে আরোহণ করিলেন। সকলে তামাসার ছলে চীৎকার করিয়া উঠিল—"লুকাও দেওয়ানজী লুকাও, এই ধরিল।" কেহ পদাতিকগণকে উপরতলে যাইতে ইঙ্গিত করিল—তাহারাও পশ্চাতে ধাবমান হইল, তাহারা ঘরের সিপাহী জটাধারীর পরামর্শে পুলিশের সিপাহী সাজিয়া আসিয়াছে—সকলেই মনে মনে গজাননের উপর ক্রুদ্ধ, সকলে তাহার দুর্দশা দেখিতে সন্তুষ্ট। গজানন উপরে যাইয়া একটি কোণের কামরাতে লুকাইলেন, ঐ কামরার পশ্চাদ্ভাগে

একটি দ্বার আছে, ও সেই দ্বার হইতে নিম্নগামী একটি পাতিল কাষ্ঠপত্রের সোপান নির্মিত ছিল—এইটি গোপন পথ, নিম্নতলে স্নানগৃহে যাইবার দ্বার। তাহা জানিয়াই গজানন সেই ঘরে লুকাইয়াছেন—ফলতঃ সেই দ্বার গজাননের প্রস্থানের দ্বার না হইয়া যমদ্বার হইয়া উঠিল। সম্মুখে পদাতিক ঘরে আসিয়া উপস্থিত, সকলের উৎসাহে তাহারা উৎসাহিত, কহিতেছে "দ্বার খোল নচেৎ কপাট ভগ্ন করিয়া ধরি।" কথা হইতে কার্য আরম্ভ হইল, কপাটে ধাক্কা পড়িল, গজানন গোপন দ্বার খুলিয়া এক পদ কাষ্ঠ সোপানে স্থাপিত করিলে, সে সোপান পাতিল পত্র তথাপি অগত্যা গজানন ভাবিলেন, সেই পথেই অবরোহণ করিয়া প্রস্থান করিবেন, স্থিরচক্ষে তিনি সিপাহীগণের প্রবেশদ্বারের প্রতি দৃষ্ট করিতেছেন, সেই দ্বার চিরমাত্র খুলিতে দেখিয়াই ত্রস্ত নিম্নগামী হইলেন, দুই একটি সোপান না নামিতেই উচ্চ স্থল হইতে "ধরিলাম" শব্দ, নিম্নতলেও কেহ কেহ কহিতেছে, "সাবধান সাবধান দেখবেন পাড়বেন না।" সিঁড়ি ভগ্নপ্রায় আবার সেই সময় নিম্নতল হইতে সেই সিঁড়ি হইয়া গজাননের চিরভয় দুটি সদ্য প্রসূত বিড়াল আপন শাবকের আপদ আশঙ্কায় "খিল খিল" করিতে করিতে গজাননের পদতলে উপস্থিত, গজানন ভয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মস্তক ঘূর্ণায়মান, পদে পদ ঠেকিয়া উচ্চ সোপান হইতে দ্বাদশ হস্ত লম্বতলে একটি স্নানোপযোগী প্রস্তরফলকে পতিত ও মূর্চ্ছিত। তামসা করিতে করিতে তত্ত্ব, গজাননের গজস্কন্ধের প্রধান অস্থি ভগ্ন হইয়াছে, স্পন্দ রহিত, নাড়িচালনা বন্ধ, এক পলে মৃত্যু, প্রাণবায়ু পলায়ন করিয়াছে। কুলোকের মাথায় বজ্রাঘাত, কেবা কান্দে? নীলমণির চক্ষে অশ্রু গলিয়াছে; কিন্তু মনে মনে ভাবিতেছেন অদ্য হইতে গজাননের সমস্ত ধনাগারের আমিই সর্বময় কর্তা। সকলে কহিল, "এই প্রস্তর গজাননের বিপদ ভঞ্জন।"

ত্রি চ ত্বা রিং শ ৎ প রি চ্ছে দ

পরিশিষ্ট

কেনারাম বাঁড়ুয্যা মহাশয়ের লিখিত মাণিকপীর সাহেবের নামিত পত্র

প্রিয় মাণিকপীর! বড়লোক হইয়াছ, তবু শৈশবকালে, তোমার যে নামটি দিয়াছিলাম, তাহাই প্রিয় বোধ হইতেছে। তোমাকে কেহ পীর, কেহ রাজা-উপাধি প্রদান করে—হলেই বা তুমি রায় বাহাদুর, হলেই বা তুমি জমীদার, হলেই বা তুমি হাকিম, তুমি তবু আমার সেই মাণকে! আবার যেমন আপনি গঙ্গাপারের নবাব, আমি তেমনই রাঢ়প্রদেশের রাজা। আপনার পূর্বপুরুষগণ বৃহৎ বৃহৎ বিস্তার বিষয়, পরগণা পরগণা জমিদারী আপনার ভোগের জন্য অর্জিত করিয়া গিয়াছেন, আমার পূর্বপুরুষ সকলেও তেমনি নবগুণে বিদ্যা-

বুদ্ধিতে মানসম্ভ্রম সংগ্রহ করিয়া আবার লোকবল জ্ঞাতিমিত্র বহুজন আস্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। প্রীতি ও বন্ধুবলও কম বল নহে, তার সরঞ্জাম-খরচ অল্প, ষষ্ঠমাহির হিসাবের "সূর্য্যাস্তের" ভয় নাই, তার উপর সমাজসম্ভ্রমে যেমন তুমি রাজা, যেমন পীর, তেমনি আমি কুলীন মহারাজ চক্রবর্তী। তবে তুমি বনের রাজা, আমি কুল-মানে রাজা। ভাই, রাজায় রাজায় মনে মনে ভাব থাকুক না থাকুক, সম্বোধনে "বন্ধু" হইয়া থাকেন, তা বলে বলিতেছি না, আমাদের ভাবও সেইরূপ, বরং আপনার আমার কথা "ঘরকা বাত" বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তারপর আমরা কেবল কাজের গোলাম নহি, তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, অনেক দিবস পর্যন্ত আপনার পত্র না পাইবার কারণ কি? দরকার ছিল না? কাজও ছিল না? আপনি কি কাজের গোলাম? তাও ত নন্, তবু নবাবি মেজাজ, বড়লোকের বিস্মৃতি! যাহা হউক, অনেক কালের পর আমায় স্মরণ করিয়াছেন ও কয়েকটি সংবাদ চাহিয়াছেন, তাহার মধ্যে, জটাধারীর রোজনামচার পরিশিষ্ট কি? তাহাও একটি প্রশ্ন আছে. জটাধারীর সমকালিক লোক এদেশে এখন অল্প সংখ্যা বর্তমান, পীর ভায়া আছেন, ডাক্তারবাবু আছেন, রায়বাহাদুর আছেন, আমি আছি, তদ্ব্যতীত আর শত শত ব্যক্তি যাহারা এক সময়ে নানা দেশ হইতে একত্রীভূত হইয়া এক বিদ্যার্থিমন্দিরের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া একই মাতা সরস্বতীর সেবা করিয়া সোদরসদৃশ স্নেহে পরিবর্ধিত হইয়াছিলাম, তাদের মধ্যে আজকাল অনেকেই নাই; ক্ষণপ্রভা, উল্কা তারার ন্যায় অনেকে বিলোপিত। যে কয়েকজন আছি, তাহার মধ্যে কেহ জীর্ণদন্ত, কেহ ক্ষীণদৃষ্টি, কেহ সুপক্ক-কেশ, কেহ জরা, কেহ শোকচিন্তায় কাতর, দুই চারি জন যাঁহারা কিছু বলিষ্ঠ আছেন, বিদেশে রাজকার্যে ব্যস্ত, ফলতঃ সকলেরই হাস্যমুখ শুষ্ক হইয়াছে, প্রমোদ-সুখ ফুরাইয়াছে—

"পরিশ্রম পর-সেবা
মর্ম্মচিন্তা রাত্রদিবা।"

আর লাভে সকলের জীবন বিড়ম্বনামাত্র অনুভব করিতেছেন—স্বাধীনতা নাই, স্ফূর্তি ও উৎসাহ নাই—এই সকল বন্ধুগণের নিকট গঙ্গাধর শর্মার নিজ-হস্তলিখিত জটাধারীর রোজনামচার পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না—সকলেই শেষ দশাই লিখাপড়ার চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছেন, কেহ বলেন, গঙ্গাধর যখন বর্ধমানাধিপতি ধীরাজ বাহাদুরের অনুরোধে পড়িয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান তাঁহার নৌকাটি বাত্যায় পতিত হইয়া পুস্তক-খানি অম্বিকার নিকট জাহ্নবীজলে সমর্পিত হয়, যেমন সকলেই শেষে জলে যায়, সেটিও জলে গিয়াছে. তবু কয়েকটি সহৃদয় ভক্তের যত্নে গুণিলোকের রচনার একটি অনুলিপি বর্তমান আছে। যাহা হউক জনপ্রবাদ ও তৎকালিক একখানি "ভাস্কর" সংবাদপত্রে পুস্তক সম্বন্ধে যা কিছু বিবরণ পাইলাম, নিম্নে লিখিত হইল; আশা করি, ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন।

ডাক্তার ইটওয়াল সাহেব বিলাতগমনের পূর্বে আশুতোষ রায় মহাশয়কে রাজা-উপাধি গ্রহণের পরামর্শ দেন ও রুসিয়ার যুদ্ধে আহত ইংরাজ সৈনিক পুরুষদের সাহায্যার্থ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রামাত্র দান করিতে অনুরোধ করেন—সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করেন; কিন্তু রাজ-উপাধি গ্রহণে রায় মহাশয় অস্বীকার হন, কহিয়াছিলেন, "বুড় বয়সে আর সঙ্ সাজিতে লজ্জা করে।" এই ঘটনার কিছুকাল পরে আবার লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া একটি দেবালয় নির্মাণ, জলাশয় খনন ও অতিথিসংকারার্থ একটি ধর্মশালা সংস্থাপিত করেন। তৎপরেই একটি দারুণ শোকে অভিভূত হইয়া তাবৎ সম্পত্তি এক সন্তানকে অর্পণ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করেন। মাণিকপীর! এমন ধার্মিক সুশীল লোকের কি শোক জিজ্ঞাসা করিতে পার? সংসারে শোক ছাড়া কে আছে?

চল্‌তি চাক্কি দেখ্‌কর,
দোয়া কবিরা রোই,
দো চাক্কিকা বিচ আ-কর,
সাবুদ না গেয়া কোই।

যেমন সংসারের চিরগতিক, যেমন সকলের ভাগ্য, আশুবাবুরও তাই ঘটিয়াছিল—তাহার প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্র বিবাহের প্রাক্কালে লোকান্তর গত হন, সেই শোকে সংসারচিন্তায় বিসর্জন দিয়া কাশীধামে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন ও শিবদাস নাম গ্রহণ করিয়া কয়েক মাসমাত্র মহাতীর্থে অবস্থিতি করেন, অবিলম্বে তাপিত হৃদয়ের চিরবন্ধু মৃত্যুর সাহায্যে শিবদাস দশাশ্বমেধের ঘাটে জাহ্নবীতটে দেহত্যাগ করিয়া, সদাত্মার সমোচিত বাসস্থান স্বর্গে বাহিত হন! সংবাদপত্রের সম্পাদক গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য মহাশয় আশুতোষবাবুর আদ্যশ্রাদ্ধে একটি রৌপ্যনির্মিত বৃহৎ কলসী দান পাইয়া আপন পত্রমধ্যে মহাত্মার গুণবাদ ও কিঞ্চিৎ জীবনচরিত লিখেন, তাহাতেই উক্ত সংবাদটি পাইলাম।

গজাননের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর নীলমণি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া স্বল্পকাল মধ্যে মুদ্রাসমূহ খুলাংকুচির ন্যায় অজস্র অন্যায়-জলে নিক্ষেপ করেন, দেনী হন, বিষয় বিক্রয় হয়, অবশেষে মহাজনের ডিক্রীজারির প্রতি বঞ্চক হইয়া একটি বৃহৎ দাঙ্গায় আহত হন ও পরে কারাবাসে অল্প বয়সে ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

শীতুক্ষেপা এখনও জীর্ণাবস্থায় জীবিত, অভাগা লোককে মৃত্যুও স্পর্শ করে না। মোকদ্দমার কাগজাতের তাড়ামাত্র তাঁহার এখন সম্বল! ভিক্ষা উপজীবিকা!

কিন্তু রাঙ্গা ঠাকুরুণের কথা? সাধারণ কথা প্রচার আছে, "ধর্ম্মের মার নাই।" তাঁহার রূপলাবণ্য, যশঃকীর্ত্তি, দানধ্যানের, রোগগ্রস্ত দারিদ্র্যের প্রতি দয়ার, অনাথের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহের নির্ম্মল যশ এ অঞ্চলে জাগ্রত। কল্পনা

প্রতিষ্ঠিতা একটি স্বর্গীয় দেবকন্যাবৎ রাঙ্গা ঠাকুরাণী প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। যত দিন মর্ত্ত্যে ধর্ম্মের আদর থাকিবে, রাঙ্গা ঠাকুরাণীও একটি গ্রাম্য-দেবীবৎ এদেশে পূজিতা হইবেন, কিন্তু তাঁহার বৈধব্যদশা মানবসুখের অসম্পূর্ণতার চিরপরিচয় থাকিবে। রাঙ্গা ঠাকুরুণের প্রকৃত নাম অন্নপূর্ণা অতএব বহু ব্যয়ে অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির স্থাপন করিয়া মানবপ্রকৃতির আর একটি ভ্রম, চিরস্মরণীয় হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

এখন পীরুদাদা? যে হস্তের যষ্টি ও প্রহার শত্রুপক্ষের ভয় ছিল, যাহাতে ভারি ভারি মগুর হেলাইতে, লেজিম ভাঙ্গিতে, তাহা কি এখন দুর্ব্বল হইয়া কলম ধরিতেও অক্ষম, আপনার হস্তলিপি দেখিয়া অনুভব হইতেছে শীরা অকর্ম্মণ্য, হাত কাঁপিয়াছে, বাস্তুস্বত্ব ত্যাগ করিতে চিত্রগুপ্ত বিজ্ঞাপনী জারী করিয়াছে, বা করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে। আপনিও সংসার-আশ্রম এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়া যে সুরম্য বিস্তার উদ্যান মধ্যে জটাময় পুরাতন বটচ্ছায়া মধ্যে পুরাতন গৃহে বাস করিতেছিলেন,—শুনিতে পাই তাহাও আর অধিক দিন দাঁড়াইতে অক্ষম, তাহার পার্শ্বে শুনিতে পাই জীর্ণ দরগার মৃত্তিকানির্ম্মিত হস্তীসকল কড় পাতিয়াছে, ঘোটকগুলি ভগ্নপদ হইয়া মাটিতে মিশিতেছে, অশ্বথের মূলে সেই গম্বুজ-চূড়া ভগ্নপ্রায়; আবার ক্ষোভিতহৃদয়ে শুনি তন্নিকটে বৈষ্ণবপ্রধান পুরুষোত্তম আপনিও একটি সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। চিড়িয়াখানার সকল পক্ষী রাজহংস, কবুতর, ময়ূরগীগুলি ও প্রিয় পেরু দুইটি হনুমানপ্রসাদকে দান করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দান না করে সে কি নিজদ্রব্যগুলি সঙ্গে লইয়া যায়, না অপরে কেড়ে লয়, তার গালে ছড় পড়ে? অতএব বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন, গাল বাঁচাইবার পন্থা করিয়াছেন। পুরাতন যষ্টিটি আমার জন্য রাখিয়াছেন, লেখনীটি কে পাইবে? তদপযুক্ত ব্যক্তি কি বঙ্গে জন্মিয়াছে?

আমিও প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বিস্তার অজয়নদতটে সেই খয়েরমল্লের ভগ্ন দুর্গশিরে বসিয়া সুদূরে রামধনুরঙ্গরঞ্জিত সুগোল প্রকাণ্ড পর্ব্বতশিখরতলে জলপুঞ্জ মধ্যে সূর্য্যদেবের কর-বিবর্জ্জিত রক্তমণ্ডল ধীরে ধীরে জলশায়ী হইতে দেখি, আর মনে করি আমারও জীবনদীপ ঐরূপ অনন্তবারিতে সত্বর নিমগ্ন হইবে। সেই স্থির নিভৃত নিঃস্বর সন্ধ্যার গগনে কি সুন্দর গভীরভাবে পুলকিত অন্তঃকরণে অনন্ত, অসীমকাল, প্রকৃতি, জীবন, মৃত্যু একস্থানে মিলিত একই পদার্থ বলিয়া অনুভব করি, মৃত্যুর পরেও যেন জীবন দেখিতে পাই ও সকলে এক স্থানে মিলিত দেখিয়া মহানন্দে প্রমত্ত হই, তথাপি আবার এই স্বল্প জীবন মর্ত্ত্যে বৃথা শেষ হইল এক মর্ম্মভেদী আক্ষেপ উপস্থিত হয় ও মনোভাব সঙ্গীতে সমাপন করি—

গেল গেল গেল দিন ঐ ত ডুবিল,
জীবনের শেষদশা না বলে আসিল,

অনন্ত কিরণ শেষে প্রলেপিত কালি?
উজ্জ্বল জীবন-জল লুপ্ত করে বালি।
সন্ধ্যাজলে লুপ্ত জ্যোতিঃ কি কালপ্রদেশে
কবির সুস্বপ্ন ভঙ্গ বিষাদ বিশেষে।
প্রভা গেল, তেজ গেল, হক্‌ অন্ধকার,
তবুও অনন্ত আশা ঝকে অনিবার।

আমার সঙ্গীত শুনিয়া সেই অজয়-তটে কোন মহাপুরুষের সমাধি-বন হইতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একতারা-হস্তে আবার গাইয়া উঠেন—

"কপাল সকল, ন' করম্‌-ফল
হাত কারও কুছু নাহি,
ইন্দ্র আদি যত, করিল সংযত
সাগর-রতনে ভাই।
যম, রবি, শশী, ভেল লছ্‌মি দাসী,
স্বর্ণলঙ্কা অম্বু শোভে,
সগার ললাটে, সঙ্গীত সুনাটে
ইন্দ্রপুরী কালা লাজে।—
সহি লঙ্কেশ্বর, রতন-মুকুট-পর
বিপদ সময়ে যবে ভেল।
কালামুখ কালাকর, বনচর বানর,
চরণাঘাত কত দেল।
ললাটলিখন বল, সে বল কে বল—
হেলাইতে পারে কি গোসাঞি,
হরি হরি, সুখ সম্পদ যত, দৈব-নিয়োজিত
আপ হাত কুছু নাহি।"

সমাপ্ত